ডিটেকটিভ

লেখকের অন্যান্য পুস্তক :—

রাজ্যশ্রী (ঐতিহাসিক নাটক)	...	১॥০
নকল সাধু (সামাজিক নাটক)	...	॥০
সুধা (পৌরাণিক নাটক)	...	১৲
Professional Crime	...	২॥০

প্রাপ্তিস্থান : "বুক হাউস্", ২৯ রসা রোড, কলিকাতা

ডিটেকটিভ

শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., বি. এল.

আই. পি. (রিটায়ার্ড)

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

ভাদ্র ১৩৫৭

মূল্য তিন টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা
হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১১—২০. ৯. ৫০

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিস বিভাগের উচ্চ পদে আসীন থাকিয়াও আজীবন সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী আছেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া আবার নবীন উদ্যমে সাহিত্যচর্চা করিতেছেন দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। সম্প্রতি তিনি তাঁহার কর্মজীবনের অভিজ্ঞতাকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া 'ডিটেকটিভ' নামে একটি ছোটগল্প-সংগ্রহ রচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে ডিটেকটিভ ছোটগল্প ও উপন্যাস যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে। বহু যশস্বী সাহিত্যিক এই জাতীয় গল্প রচনায় নিজেদের সাহিত্যিক শক্তির প্রশংসনীয় পরিচয় দিয়াছেন ও তাঁহাদের রচনাবলী চিরন্তন সাহিত্যিক সম্পদরূপে গৃহীত হইয়াছে। এমন কি ডিকেন্স, স্টিভেনসন প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকেরাও অপরাধমূলক উপন্যাসরচনা নিজেদের প্রতিভার অযোগ্য বিষয় বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। পাঠকের চমকপ্রদ ঘটনার প্রতি অনুরাগের তৃপ্তি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সাহিত্যিক উৎকর্ষের মানরক্ষায় যত্নবান ছিলেন ও এই উভয় উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে তাঁহারা যথেষ্ট সাফল্য লাভও করিয়াছেন।

বাংলা সাহিত্যেও পাশ্চাত্যের অনুকরণ ও প্রেরণায় ধীরে ধীরে একটি ডিটেকটিভ শাখা গড়িয়া উঠিতেছে, তবে এখানে কোন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক এই বিষয়ে এখনও আত্মনিয়োগ করেন নাই। কাজেই দুই একটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডিটেকটিভ উপন্যাস উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হইয়া উঠে নাই। সুলভ রোমান্স সৃষ্টি করিতে গিয়া লেখকেরা প্রায়ই জীবনের স্বাভাবিক ছন্দকে

অস্বীকার করিয়াছেন, ও এমন সমস্ত অবাস্তব, আজগুবি ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন যাহারা বাঙালীর সহজ জীবনক্রমে স্থানলাভ করে না। ইহাদের মধ্যে বৈদেশিক প্রভাব অতিমাত্রায় প্রকট। এই জাতীয় গল্প পড়িতে পড়িতে একটা সাময়িক উৎকট কৌতূহল অনুভব করা যায় বটে, কিন্তু প্রথম উত্তেজনা প্রশমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের শূন্যগর্ভ অসম্ভাব্যতা, স্বাভাবিক জীবনের সহিত অসঙ্গতিই আমাদের মনে প্রবল হইয়া উঠে। এই সমস্ত রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিক ঘটনা, অপরাধপ্রবণতার এরূপ জটিল ও বিসর্পিল প্রবাহ যে বাঙালী জীবনের সহজ-সরল, কয়েকটি নির্দিষ্ট রেখায় সীমায়িত সংস্থিতির মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না—এইরূপ অবিশ্বাসই আমাদের স্থায়ী রসোপভোগের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

ভোলানাথবাবুর গল্পগুলি এইরূপ অবাস্তবতা-দুষ্ট নহে; এগুলি তাঁহার কর্মজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। ইহাদের মধ্যে কোন উৎকট কাল্পনিকতা বা উগ্র বৈদেশিক গন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহারা আমাদের পঞ্চাশ বৎসর পূর্বকার স্বাভাবিক বাঙালী জীবনযাত্রা হইতে উদ্ভূত, তাহারই দুর্বলতা ও বিকৃতির ভূস্তরে যে অপরাধের বীজ উপ্ত থাকিত তাহারই অঙ্কুরিত অভিব্যক্তি। প্রত্যেক দেশের অপরাধতত্ত্ব তাহার সুস্থ জীবনধারার সহিত এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট। বাংলা দেশে সমাজবিরোধী পাপের প্রেরণা ও পরিকল্পনা বাংলা দেশের মাটিতে উদ্ভূত আগাছার মত, তাহার ভূগর্ভস্থ স্তর দিয়া প্রবাহিত দূষিত জলধারার মত, দেশেরই নিজস্ব আবহাওয়ার সৃষ্টি। বাংলার চোর ডাকাত খুনে ইউরোপীয় অপরাধীর সগোত্র নহে; দেশেরই সামাজিক বিকৃতি ও আদর্শ-বিপর্যয়ের অস্থিমজ্জাগত সংস্কার সূত্রের উল্টা-টানের অনিবার্য পরিণতি। ভোলানাথবাবুর গল্পগুলিতে

তাই আমরা বাঙালী জীবনেরই তির্যক, বাঁকাচোরা প্রাণশক্তির অনিয়ন্ত্রিত আতিশয্যে উচ্ছৃঙ্খল একটা প্রতিকৃতি দেখিতে পাই।

বাংলার মত ধর্মপ্রধান দেশে দস্যুতার মধ্যেও একটা বিকৃত আদর্শবাদ প্রচ্ছন্ন থাকে। মনুষ্যত্বের দিক দিয়া তাহারা মোটেই হীন নয়। দলের প্রতি আনুগত্য, দলপতির প্রতি ভক্তি ও মমত্ববোধ, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, কর্মপদ্ধতির মধ্যে একটা নির্ধারিত নীতির অস্খলিত অনুসরণ, প্রতিশ্রুতিরক্ষা, দৃপ্ত তেজস্বিতা ও আত্মমর্যাদাবোধ, সর্বোপরি আস্তিক্যবুদ্ধি—এই সমস্ত দুর্লভ গুণ ডাকাতের দলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মিলিত। সেই জন্য দেখা যায় তাহাদের নৃশংসতার মধ্যে নারী-নির্যাতনের স্থান নাই। যাহার অঙ্গ হইতে অলঙ্কার ছিনাইয়া লওয়া হইত, যাহার স্বামীপুত্রকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইত, তাহার নারী-মর্যাদার অবমাননা কঠোর হস্তে দণ্ডিত হইত। তাহার প্রতি মাতৃত্ববোধ অটুট থাকিত। এমন কি পুলিসের সঙ্গে ব্যবহারেও ইহাদের ন্যায়নিষ্ঠা ও ধর্মনীতির কোন ব্যতিক্রম হইত না,—প্রাণরক্ষার নির্মম প্রয়োজনেও ইহারা কথার খেলাপ করিত না। মনে হয় বাংলা দেশের দুর্দম প্রাণশক্তি ও অস্থিমজ্জাগত ধর্মসাধনা সমাজের বাঁধাধরা নিরাপদ রাস্তায় আত্মপ্রতিষ্ঠার যথেষ্ট অবসর না পাইয়া, এই কুটিল-পিচ্ছিল, অসমসাহসিকতার কণ্টকাকীর্ণ পথেই আত্ম-নিষ্ক্রমণের একটা অবৈধ উপায় অনুসন্ধান করিত। দস্যুর উল্টাপিঠে দিগ্বিজয়ী বীর এই সত্য ইংরেজশাসন-প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বকালের বাংলায় একটা মহনীয় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল।

ভোলানাথবাবুর গল্পগুলি গল্প হিসাবে সুখপাঠ্য, কৌতূহলোদ্দীপক ও সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ। কোন কোন গল্পে রোমান্সের আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তাহার কারণ বাংলার সাধারণ জীবনেই রোমান্সধর্মিতার

প্রাচুর্য। তাঁহার মন্তব্য ও বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে সূক্ষ্মদর্শিতা ও রসিকতার ছাপ আছে। বিশেষত যে সমস্ত ঘটনা তাঁহার গল্পের উপজীব্য তাহা আমাদের চিরপরিচিত সমাজজীবনেব অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইহাদের মধ্যে লণ্ডন ও প্যারিসের অতি জটিল, বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত, অন্ধকার দুর্ভেদ্য সুড়ঙ্গপথের অসংখ্য অলিগলিতে বিসর্পিত, অদ্ভুত কর্মদক্ষতা, উদ্ভাবনী শক্তি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগে দৃঢ়ীভূত অপরাধী মনোবৃত্তির কৃত্রিম অনুকরণ নাই। আছে বাঙালী জীবনের ঘবোয়া, সাদামাঠা, সহজ ধর্মসংস্কারের সহিত সম্পৃক্ত পাপেব একটানা উচ্ছ্বাস। আশা করি, এই গল্পগুলি পাঠক সমাজে আদরণীয় হইবে।

শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিটেকটিভ

ফরিদপুর জেলার কাশিয়ানি থানার "ছোটবাবু" দীনেশ গুপ্ত অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে চাকরিটা ছেড়ে দিলেন।

সংসারের মধ্যে নিজে ও পত্নী। কাজেই পাড়াগাঁয়ের বাঁশবন, পচা পুকুর, কচুরিপানা ও ম্যালেরিয়ার সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করবার কি দরকার ?

কলকাতায় এসে দীনেশবাবু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বেড়াবেষ্টিত টিন-আচ্ছাদিত কোয়ার্টার্সের পরিবর্তে দোতলা বাড়ি, থানাঘরের ধূলি-ধূসরিত ভগ্নদণ্ড কচিচ্চালিত টানা-পাখার পরিবর্তে চিরচঞ্চল ইলেকট্রিক ফ্যান, অস্থিপঞ্জরঘাতী মন্থরগতি মহিষযানের পরিবর্তে ট্রাম বাস ট্যাক্সি, সুদূর মফস্বলে নীরস অপঘাত-তদন্তের পরিবর্তে কলকাতার বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে গল্প আর মাঝে মাঝে সিনেমা,—সময়মত আহার, রাত্রে সুনিদ্রা ইত্যাদি প্রথম প্রথম খুবই ভাল লাগল। লাগবারই তো কথা। ও-রকম অগম্য পাড়াগাঁয়ে কি মানুষ থাকতে পারে ?

কিন্তু কাজ না থাকলে কতদিন আর এসব ভাল লাগে ? ক্রমশ বড়ই একঘেয়ে মনে হতে লাগল,—নূতনত্বের নামগন্ধও নেই। তাঁর অনন্ত উদ্যম, অগাধ উৎসাহ, অসাধারণ বুদ্ধি যেন ক্রমে শিথিল হয়ে আসতে লাগল। যৌবনেই বার্ধক্য আসবে নাকি ? সেটা তো ভাল নয়।

কাজ কিছু চাই। পুলিসের চাকরিই না হয় ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু অভিজ্ঞতাটা তো আছে,—বিশেষ ডিটেক্‌টিভ-স্কুলের বিদ্যাটা, সেটা কাজে লাগালে কেমন হয় ? বিলেতে তো অনেক প্রাইভেট

ডিটেক্‌টিভ আছে,—এখানে কি সেটা চলে না? টাকা পয়সার তাঁর বিশেষ অভাব নেই, কিন্তু একটা কাজ নিয়ে তো থাকতে পারবেন। তা ছাড়া, কাজটার মধ্যেও তো একটা বৈচিত্র্য আছে, উদ্দীপনা আছে।

তিনি তো পুলিসে ঢোকবার আগেই কত ডিটেক্‌টিভ গল্পেব বঙ্গানুবাদ প'ড়ে, অদ্ভুত উপন্যাসের আবছায়া ধ'রে, অনর্গল মিথ্যাকে প্রাণপণে সত্য ভেবে মনে মনে একটা ডিটেক্‌টিভ-জগৎ সৃষ্টি ক'বে রেখেছিলেন। সে জগতে অলিতে গলিতে শয়তান ঘোরে, অসাধাবণ উপায়ে খুন-জখম হয়, বাষ্পের মত মানুষ উড়ে যায়, যুবতীর কোমল করে শাণিত ছোরা চক্‌চক ক'রে ওঠে, কথায় কথায় পিস্তল ছোটে ; সেখানে কত রোমাঞ্চকর ঘটনা, জটিল রহস্য, পদে পদে বিপদ, অভাবনীয় উদ্ধার ইত্যাদি। হাঁ, যদি কিছু করতে হয় তো এই কাজ, পুরুষ-মানুষের উপযুক্ত কাজ বটে, বাকি সব তো আজকাল মেয়েবাও পারে।

গৃহিণীর সঙ্গে পরামশ করলেন। তিনিও তো অনেক ডিটেক্‌টিভ গল্প পড়েছেন,—তাই বিশেষ কিছু আপত্তি হ'ল না। স্বামীব নাম শার্লক হোম্‌স্‌ ও মিস্টার ব্লেকের ন্যায় দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে যাবে, এব চেয়ে আর গৌরবের কথা কি হতে পারে?

বেঙ্গল পুলিসের ডিটেক্‌টিভ যোগেশবাবু সেই পাড়াতেই থাকেন। দীনেশবাবু তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর উপদেশ চাইলেন। যোগেশ-বাবু বললেন, "বেশ তো, ভাল কথা। কিন্তু ভাল ক'বে কাজ না শিখে এসব ব্যাপারে নামাটা কি ঠিক হবে?"

"কাজ তো কিছু কিছু শিখেছি,—এতদিন পুলিসে চাকবি ক'বে এলুম। তা ছাড়া ডিটেক্‌টিভ ট্রেনিং স্কুল থেকে পাসও করেছি।"

"তা তো করেছেন, কিন্তু শুধু পুঁথিগত বিদ্যে হ'লে তো হবে না।

এসব বিষয়ে কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার দরকার, রিস্ক্‌ও আছে,—বিশেষ কলকাতার মত জায়গায়।"

কথাগুলো দীনেশবাবুর বড় ভাল লাগল না। ভাবলেন, ওসব মুরুব্বিয়ানা কথা তো চিরদিনই শুনে আসছি, ওতে আর নূতনত্ব কি আছে? বললেন, "হাঁ, আপনি যা বলছেন তা খুবই ঠিক, কিন্তু আমার এ দিকে ছেলেবেলা থেকেই ঝোঁক আছে। সেই জন্যই তো পুলিসে ঢুকেছিলাম। আমার তো মনে হয় Detectives are born, not made—আপনি কি বলেন?"

যোগেশবাবু একটু হেসে বললেন, "হ্যাঁ, কতকটা তাই বটে, কিন্তু—। যাক, এখন আমি এ সম্বন্ধে আপনার জন্যে কি করতে পারি বলুন?"

"আপনি প্রবীণ ডিটেক্‌টিভ,—ইচ্ছে করলে আমার জন্যে অনেক কিছু করতে পাবেন। আমি মাঝে মাঝে এসে আপনার কাছে উপদেশ নেব।"

"বেশ, আসবেন।"

"আর, কলকাতা পুলিসের অফিসারদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে হবে। যদি হঠাৎ তাঁদের কাছ থেকে কোনও সাহায্যের দরকার হয়—"

"বেশ, দেব।"

"তা ছাড়া, আপনার দু-একটা গোয়েন্দা আমাকে দিতে হবে। তা না হ'লে খবর পাব কেমন ক'রে?"

এবার যোগেশবাবু একটু গম্ভীর হলেন। বললেন, "দেখুন, গোয়েন্দা তো দেওয়া যায় না। সেটা প্রথা নয়। আপনাকেই সেটা ঠিক ক'রে নিতে হবে।"

"আচ্ছা, আপনার লোক বাদ দিয়েও আপনি দু-একটা গোয়েন্দা ক'রে দিতে পারবেন না?"

যোগেশবাবু এবার একটু হেসে বললেন, "দেখুন, Goendas are born, not made,—কাজেই ক'রে দেওয়া শক্ত। চিনে নিতে হয়। ঐখানে ভুল হ'লেই সর্বনাশ। যা হোক, আমি আপনাকে তার পথ দেখিয়ে দেব।"

২

দীনেশবাবুর উৎসাহের আর অন্ত নেই। নিজেই একজন গোয়েন্দা ঠিক করেছেন, সে মাঝে মাঝে দু-একটা খবরও দিচ্ছে। সেই সব সংবাদের সূত্র ধ'রে তিনি কলকাতার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করেন, নানারূপ বেশ ধ'রে নানা জায়গায় নজর রাখেন, কখনও কারুর পেছনে পেছনে 'ফলো' করেন; কিন্তু সূত্রপাত করবার কোথাও সুবিধা পান না। ভাবেন, এ অঞ্চলের বদমায়েশগুলো সব রাতারাতি সাধু হয়ে গেল নাকি? অন্তত একটা জাল-জুয়াচুরিও তো চোখে পড়ে না! কি জ্বালা! আর বুঝি মান থাকে না! যা হোক একটা পেলে যে হয়!

এরূপ অবস্থায় একদিন তিনি ডাকে একখানা চিঠি পেলেন। কে একজন রামশরণ তাঁকে লিখছে, "বাবু, আজ সন্ধ্যার পর আপনি একবার আহিরীটোলার ঘাটে আসবেন,—একটা জরুরী খবর আছে।"

চিঠিখানা প'ড়েই দীনেশবাবুর মুখে একটা আনন্দের তরঙ্গ খেলে গেল। ভাবলেন, এই তো ঠিক। ডিটেক্‌টিভরা এই রকম চিঠিপত্রই তো পেয়ে থাকে। এতদিনে বোধ হয়—

কিন্তু একটু চিন্তার কথাও তো আছে! তিনি যেন কোন্ একটা ডিটেক্‌টিভের গল্পে, কি আর কোথাও, পড়েছেন যে, ওদিকের গঙ্গার ধারটা বড় ভাল জায়গা নয়। লোকটার সঙ্গেও তো জানাশুনো নেই! কি করা যায়!

যেতে তো হবেই, কারণ তিনি অনেক গল্পে পড়েছেন যে ডিটেক্‌টিভরা এই সব সুযোগ ছাড়ে না। একবার মনে করলেন, যোগেশবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করা যাক; কিন্তু ভাবলেন, সে বুড়োকে আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই;—নানারকম বাধা-বিঘ্নের কথা তুলে সব পণ্ড ক'রে দেবে। সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী পবামর্শদাতা হিসাবে একবার গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, "যাবে বইকি, নিশ্চয়ই যাবে। বল তো আমিও তোমার সঙ্গে যাই,—অবশ্য পুরুষেব বেশে। কিছু দূরে থাকব। বেশ একটা থ্রিল হবে।"

"না না, তুমি কোথা যাবে? সে সব গুণ্ডার জায়গা।"

"অ্যাঁ, তাই নাকি? তবে তুমিই বা যাবে কেমন ক'রে? ভয় করবে না?"

"ডিটেক্‌টিভদের তো কিছুতেই ভয় কবতে নেই, সেই সেদিন বায়স্কোপে দেখলে তো—"

"না না, সে সব পরের বেলায় বেশ ভাল লাগে, কিন্তু এ যে—"

"কিছু ভেবো না তুমি, আমি পিস্তল নিয়ে যাব।"

"আর তোমাদের বাঁশী-(whistle)-টাও নিয়ে যেও, যদি তেমন-তেমন দেখ, তা হ'লে সেটা বাজালেই তো পুলিস এসে পড়বে।"

৩

সন্ধ্যার পর দীনেশবাবু আহিরীটোলার ঘাটে উপস্থিত হলেন, সাধারণ বাঙালীর বেশে। কত নরনারী গঙ্গাব ঘাটে যাওয়া-আসা করছে, গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছে,—তাদের মধ্যে 'বামশবণ'টিকে চিনে নেওয়াও তো শক্ত! তার নাম পর্যন্ত এব আগে কখনও শোনেন নি। তার সম্বন্ধে মনে মনে একটা কল্পনা ক'রে নিলেন—অর্থাৎ বেশ জোয়ান-সোয়ান কাট-খোট্টা গোছের একটা হিন্দুস্থানী, বড় বড় গোঁফ, গায়ে কুর্তা, মাথায় চার পয়সা দামের টুপি, পায়ে নাগরা জুতো, ইত্যাদি। কিন্তু তেমন লোক তো কেউ নজরে পডল না, আব কতই বা ঘোবা যায়? আরে ধ্যেৎ, সবটাই ধাপ্পাবাজি নয় তো?

আর কিছুক্ষণ ঘোরাফেবা ক'বে দীনেশবাবু বাড়ি ফেরবার উপক্রম করলেন। চিৎপুরে ট্রাম ধরতে হবে। স্ট্রাণ্ড রোড দিয়ে অল্প কিছু দূর এসে চিৎপুর যাবার উদ্দেশ্যে একটা গলিতে ঢোকবার জন্যে যেমন মোড় ফিরবেন, অমনই পেছন থেকে একটা লোক খুব চাপা গলায় ডাকলে, "বাবু!"

দীনেশবাবু পেছন ফিবেই দেখলেন, একটা খর্বাকৃতি শীর্ণকায় লোক—হিন্দুস্থানী ব'লে মনে হয। লোকটা আরও একটু কাছে এসে বললে, "বাবু, আপনি কি—"

তার কথা শেষ হবার আগেই দীনেশবাবু সোৎসাহে বললেন, "হ্যাঁ, আমিই দীনেশবাবু। তুমি কি রামশরণ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি ঘাটে আসতেই আপনাকে দেখলুম, কিন্তু ওখানে আপনার সঙ্গে কথা বলাব সুবিধা নেই দেখে অপেক্ষা করছিলাম, একটু এদিকে আসুন।" ব'লে তাঁকে নিয়ে স্ট্রাণ্ড বোডের

রেল-লাইনের সংলগ্ন একটা নির্জন জায়গায় গিয়ে বললে, "বাবু, একটা খুব ভাল খবর আছে। আপনি আমার সঙ্গে কখনও কাজ করেন নি, কিন্তু—"

"না না, তাতে কি হয়েছে! যদি ভাল খবর দাও, তা হ'লে দেখবে আমিও কেমন—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই আশা করি।"

"যাক, সে সব ঠিক হবে, এখন খবরটা কি বল?"

বামশরণ দুই-একবাব এদিকে ওদিকে চেয়ে, চুপি চুপি বললে, "বাবু, দরমাহাটায় একটা বাড়িতে টাকা তৈরি হচ্ছে, আপনি যদি আমাব সঙ্গে আসেন তো এখুনি দেখিযে দিতে পারি।"

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত দীনেশবাবু বললেন, "ঠিক খবর তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক,—একেবারে পাকা খবর। আমি নিজে দেখেছি, তাবা বোজ সন্ধ্যার পব সেখানে টাকা তৈরি কবে।"

"সেখানে ঢুকতে পাবা যাবে?"

"হ্যাঁ, খুব পারা যাবে। সে বাড়িটাব উপরতলায় দুটো ভাগ আছে। একটা ভাগে তাবা ঐ কাজ করে, আব একটা ভাগ এখন খালি আছে, সে ঘরগুলো ভাড়া নেব ব'লে আমি বাড়িওয়ালার দরোয়ানের কাছ থেকে আজ চাবি নিয়ে এসেছি। তাকে বলেছি যে, আমাদের বাবু সন্ধ্যাবেলায় ঘরগুলো দেখতে আসবেন। যেখানে টাকা তৈরি হচ্ছে, তার পাশের ঘর পর্যন্ত যেতে পারব মনে হয়। তারপর দেখা যাবে, কতদূর কি করা যেতে পারে! তা হ'লে, এখুনি যেতে পারবেন কি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারব। এসব কাজে কি দেরি করলে চলে? একবার গিয়ে দেখা তো যাক, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেই হবে।"

৪

ছোট বড় নানা রকম গলি-রাস্তা দিয়ে দুজনে দরমাহাটার দিকে চলতে লাগলেন। দীনেশবাবুর মনটা একবার ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল; লোকটার সঙ্গে জানাশুনা নেই,—কোনও কিছু বদ মতলব নেই তো? কিন্তু সাময়িক উত্তেজনায় সে সব চিন্তা মনে বড় একটা স্থান পেলে না। এসব তো ডিটেক্‌টিভের জীবনে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, এইটাই তো থ্রিল!

তবুও রামশরণকে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, তিনি সশস্ত্র; বললেন, "রামশরণ, তারা সেখানে কোনও অস্ত্রশস্ত্র রাখে না তো? অবিশ্যি, আমার কাছেও পিস্তল আছে।"

"আজ্ঞে না, সে সব কিছু ভয় নেই বোধ হয়, আর আপনি তো একা কিছু করতে যাবেন না, পুলিসে খবর দিতে হবে তো।"

একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে একটু গিয়েই রামশরণ একটা বহুপুরাতন দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়াল, তারপর দীনেশবাবুর হাতে একটা চাবি দিয়ে বললে, "আপনি রাস্তার ধারের দরজাগুলো দেখুন, কোন্‌টায় তালা লাগানো আছে, এই চাবি দিয়ে তালা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ুন। আমি গলির মোড়ে গিয়ে, একটু নজর রাখি।"

দীনেশবাবু একটা তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন, অন্ধকারে কিছু ঠিক করতে পারলেন না; তবে বুঝলেন সেটা একটা ঘর—স্যাঁৎসেতে, দুর্গন্ধ। ভাবলেন, একটা টর্চ সঙ্গে আনা উচিত ছিল,—বড় ভুল হয়ে গেছে, অন্ধকারের মধ্যে কি আছে কে জানে!

যা হোক, রামশরণ তখুনি এসে পড়াতে মনটা আবার সজীব হয়ে

উঠল। সে চুপি চুপি বললে, "বাবু, আমার হাত ধরুন,—ওপরে যেতে হবে, জুতোটা খুলে ফেলুন।"

উপরের একটা ঘরে গিয়ে রামশরণ দীনেশবাবুকে সেখানে দাঁড়াতে ব'লে পাশের ঘরে ঢুকল। উপরের ঘরটাও প্রায় নিচের ঘরেরই মত, তবে গলির দিকে একটা জানলা থাকায়, সামান্য কিছু আলো ঢুকছে। আবার দীনেশবাবুর গাটা একটু ছমছম ক'রে উঠল, কিন্তু তিনি তখুনি নিজেকে সংযত ক'রে নিলেন। সঙ্গে পিস্তল আছে তো,—ভয় কি ?

অল্পক্ষণ পরেই রামশরণ এসে বললে, "বাবু, আসুন।"

দুজনে পাশের একটা ঘর পার হয়ে আর একটা ঘরে ঢুকলেন, সে ঘরেও একটা জানলা দিয়ে সামান্য কিছু আলো আসছে। দুজনে নিঃশব্দে গিয়ে একটা দরজার কাছে দাঁড়ালেন। বহুকালের পুরানো দরজা,—এক জায়গায় কাঠ একটু ফাঁক হয়ে গেছে। রামশরণের নির্দেশমত সেই ফাঁকের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে দীনেশবাবু যা দেখলেন, তাতে তাঁর প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল। বেশ বড় একখানা ঘর, আলো জ্বলছে, আর সেই ঘরের মধ্যে চার-পাঁচ জন লোক বেশ নিবিষ্ট মনে একটা প্রেসের ভিতর এক-একখানা ক'রে সাদা ধাতুর চাকৃতি ঢুকিয়ে দিয়ে সেগুলোতে ছাপ দিচ্ছে। টাকাগুলো প্রেস থেকে বার ক'রে ঝুড়িতে ফেলছে,—ঠিক আসল টাকার মতই আওয়াজ।

দীনেশবাবুর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দন আরম্ভ হ'ল, শরীরের সমস্ত শক্তি যেন চক্ষুতে গিয়ে পড়ল। ওঃ! এ যে একেবারে খাঁটি জাল টাকা!—অর্থাৎ struck coin! মুচিতে ধাতু গলিয়ে ছাঁচের মধ্যে ফেলে, সেই মান্ধাতার আমলের পাড়াগেঁয়ে জাল নয়। কলকাতা শহর,—সবই আধুনিক, আপ-টু-ডেট। কি আনন্দ! এতদিনের আশা সফল হ'ল, পরিশ্রম সার্থক হ'ল!

দুজনে আবার প্রথম ঘরে আসতেই দীনেশবাবু চুপি চুপি বললেন, "রামশরণ, বহুৎ আচ্ছা! গ্র্যাণ্ড ডিটেক্‌শন! তুমি এখানে থাক, আমি চট ক'রে গিয়ে থানায় খবর দিই।"

"না বাবু, আপনি যাবেন না। আশেপাশে নিশ্চয়ই ওদের লোক আছে। আপনি এ রকম বাঙালী ভদ্রলোকের বেশে যাওয়া-আসা করলে কারুর চোখে প'ড়ে যেতে পারেন। তার চেয়ে, আপনিই এখানে থাকুন; আমি গিয়ে থানায় খবর দিচ্ছি। আমার সঙ্গে ইন্সপেক্টরবাবুর জানাশোনা আছে। তাঁকেও মাঝে মাঝে দু-একটা খবর দিয়ে থাকি।"

"আচ্ছা, তবে যাও, দেখো, দেরি ক'রো না।"

রামশরণ নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে ব'সে থেকে দীনেশবাবু হাঁপিয়ে উঠলেন, সর্বাঙ্গে ঘাম ছুটল, মশায় কামড়ে অতিষ্ঠ ক'রে দিলে। কিন্তু সাফল্যের আনন্দে তাঁর আর সে সব জ্ঞান নেই। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর মধুর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে। এতদিন ধ'রে তিনি মনে মনে যে সব কল্পনা ক'রে এসেছেন, যে সব চিন্তায় আনন্দ পেয়েছেন, এখুনি তারা মূর্ত হয়ে উঠবে। পুলিস এসে পড়লে কেমন ক'রে বাড়িটা নিঃশব্দে ঘেরাও ক'রে ফেলতে হবে, কোন্ পথে ঘরটায় ঢুকতে হবে, কেমন ক'রে একসঙ্গে সব কটা লোককে আক্রমণ করতে হবে, মনে মনে সেই সবের একটা আলোচনা ক'রে নিলেন। কোন গোলযোগের তো সম্ভাবনা দেখা যায় না,—ঠিক কাজ হাসিল হবে। তারপর আজ রাত্রেই থানা থেকে খবরের কাগজের কোন রিপোর্টারকে টেলিফোনে ঘটনাটি জানাতে হবে,—যেন কাল সকালের কাগজেই সংবাদটা বেরিয়ে পড়ে। কাল বেলা আটটার মধ্যেই তাঁর নাম সমস্ত কলকাতায় ছড়িয়ে পড়বে।

প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভের এরূপ কীর্তি এই প্রথম। গৃহিণীকে কিন্তু আজ রাত্রে কিছু বলা হবে না। একেবারে কাল সকালে চা খাবার সময় খবরের কাগজ দেখিয়ে তাঁকে চমকিত ক'রে দেওয়া যাবে।

কিন্তু রামশরণ তো বড় দেরি করছে! প্রায় আধ ঘণ্টা হতে চলল। থানার বাবুরা তার কথা শুনছে না নাকি? ব্যাটা হয়তো থার্ড রেটের গোয়েন্দা,—কেউ বিশ্বাস করে না।

একবার উঠে গিয়ে সেই ভাঙা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলেন যে, লোকগুলো তেমনই নিবিষ্ট মনে কাজ ক'রে যাচ্ছে,—তবে মাঝে মাঝে বিড়ি খাচ্ছে আর নিজেদের মধ্যে দু-একটা কথা বলছে। যদি এখন কাজ বন্ধ ক'রে চ'লে যায়! আর তো দেরি সহ্য হয় না!

অন্য ঘরে ফিরে এসে বসতেই দীনেশবাবু দরজার কাছে পায়ের শব্দ পেলেন। আঃ, এতক্ষণে রামশরণটা এসেছে! আগ্রহাতিশয্যে দরজার কাছে যাবার জন্যে দাঁড়াতেই দেখলেন যে, একজন ঘরের মধ্যে ঢুকছে। "এসেছ?" ব'লে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু তখুনি থমকে দাঁড়ালেন। এ কি! এ তো রামশরণ নয়! এ যে এক অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীমূর্তি!

যেন এক ধাক্কায় দীনেশবাবুর সব ওলটপালট হয়ে গেল। কোথায় সে আগ্রহ, সাহস, উদ্দীপনা? তাঁর মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না। তাঁর চমক ভাঙবার আগেই স্ত্রীলোকটা প্রায় তাঁর গা ঘেঁষেই এসে মাথার কাপড় উঠিয়ে দিয়ে হিন্দুস্থানী ভাষায় বললে, "বাবু, আমাকে বাঁচাও, আমি গঙ্গার ঘাটে এসেছিলুম, গুণ্ডারা আমাকে ধ'রে নিয়ে এসেছে।" ব'লেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবার উপক্রম করলে।

দীনেশবাবু দেখলেন, এ তো বড় মুশকিল, এ যে কাঁদতে আরম্ভ

করে! ভাবলেন, মেয়েমানুষের কান্না একবার শুরু হ'লেই ক্রমশ বেড়ে যাবে। তা হ'লে তো সব ভেস্তে যায়! নিজের মুখে হাত দিয়ে তাকে চুপ করতে ইঙ্গিত ক'রে আস্তে আস্তে বললেন, "বাপু, তুমি কেঁদো না। এখানে গোলমাল করলেই আমার সব কাজ মাটি হয়ে যাবে। চুপ ক'রে ঐখানে ব'স। আমি তোমাকে তোমার বাড়িতে দিয়ে আসব।" ভাবলেন, মন্দ নয়,—এও তো একটা সেন্‌সেশনাল কেস, ভদ্রঘরের মেয়ে ব'লে মনে হচ্ছে।

স্ত্রীলোকটি কিন্তু কিছুতেই থামে না। দীনেশবাবুর হাতে ধরবার উপক্রম ক'রে বললে, "আমাকে এক্ষুনি নিয়ে চলুন, আমি আর এক দণ্ডও এখানে থাকব না।"

কঠিন সমস্যা, কি করা যায়? স্ত্রীলোকের কথা রাখতে গেলে যে, এমন ডিটেক্‌শনটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। বললেন, "তোমার কোন ভয় নেই, এখুনি এখানে পুলিস এসে পড়বে।"

পুলিসের নাম শুনেই স্ত্রীলোকটি যেন শিউরে উঠল, বললে, "না না, তা হ'লে আপনি আমাকে এখুনি নিয়ে চলুন। আমি ভদ্রঘরের মেয়ে,—পুলিস এলে সব জানাজানি হয়ে যাবে। আমাকে সোনাপটিতে আমাদের বাড়ির কাছ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসুন, আপনার পায়ে পড়ি।" ব'লে স্ত্রীলোক দীনেশবাবুর পায়ে ধরবার উপক্রম করতেই তিনি বললেন, "আঃ, কর কি, কর কি? আচ্ছা, আমি একটু পরেই—"

"না, আমাকে এখুনি নিয়ে চলুন, আমার যা কিছু আছে সব আপনাকে দিচ্ছি।" ব'লে মেয়েটি আপনার গহনা এক এক ক'রে খুলে দীনেশবাবুর দিকে ছুঁড়তে আরম্ভ করল।

"আঃ! কর কি! কি বিভ্রাট!" ব'লে দীনেশবাবু বড়ই বিব্রত

হয়ে উঠলেন, মুখে উদ্বেগ ও বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল। কি যে করবেন কিছুই ঠিক করতে পারলেন না।

তাঁকে চিন্তা করতে দেখে স্ত্রীলোকটি আবার কেঁদে ওঠবার উপক্রম ক'রে তাঁর পা জড়িয়ে ধরবার জন্যে হাত বাড়াল। তখন অনন্যোপায় হয়ে দীনেশবাবু বললেন, "আচ্ছা. চল, তোমাকে দিয়েই আসি। তোমার গহনাগুলো তুমি তুলে নাও।"

কিন্তু তখুনি সিঁড়িতে অনেক লোকের পায়ের শব্দ শোনা গেল। দীনেশবাবু যেন অকূল সাগরে কূল পেলেন। ভাবলেন, ভগবান বাঁচিয়েছেন, পুলিস এসে পড়েছে। কিন্তু কলকাতার পুলিস কি বেহুঁশিয়ার! জুতোগুলো খুলে উপরে উঠতে হয়, সে খেয়ালটাও নেই! হয়তো ওরাই সব মাটি ক'রে দেবে!

চার-পাঁচ জন লোক ঘরের ভিতরে হুড়মুড় ক'রে ঢুকল। তাদের মধ্যে বাঙালী-ভদ্রলোকবেশী একজন টর্চ জ্বেলে দীনেশবাবুর মুখের উপর ধরল। দীনেশবাবু দেখলেন, বাকি লোকগুলো হিন্দুস্থানী—পুলিসের কন্‌স্টেব্‌লের মত। কিন্তু কারও পুলিসের পোশাক নেই। ভাবলেন, এ কি! সবাই সাদা পোশাকে কেন? তাদের মধ্যে রামশরণকে দেখতে পেলেন না। স্ত্রীলোকটি তখন ঘরের এক কোণে গিয়ে চুপ ক'রে বসেছে।

বাঙালী বাবু স্ত্রীলোকটির উপর টর্চের আলো ফেলতেই দীনেশবাবু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। একটু এগিয়ে এসে চুপি চুপি তাকে বললেন, "করেন কি মশাই? এ রকম ক'রে চারিদিকে আলো ফেললে আর জুতোর শব্দ করলে আসামীরা পালাবে যে! প্রথমে বাড়িটা ঘেরাও ক'রে ফেলুন।"

স্থিরদৃষ্টিতে দীনেশবাবুর দিকে চেয়ে বাবুটি গম্ভীরভাবে বললেন,

"আসামীরা! আপনি ছাড়া আরও কেউ এর মধ্যে আছে নাকি? কোথায় আছে বলুন?"

দীনেশবাবু অবাক হয়ে গেলেন; ভাবলেন, হয়তো রামশরণ ঠিক ক'রে বোঝাতে পারে নি। বললেন, "কি বলছেন আপনি? আমাকে আসামী মনে করেছেন নাকি? এই বাড়ির একটা ঘবে টাকা জাল হচ্ছে। তাদের ধরাবার জন্যেই তো আমি আপনাদেব ডেকে পাঠিয়েছি।"

"আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন! আপনি কে?"

"আমি ডি-ডি—"

দীনেশবাবু বলতে যাচ্ছিলেন যে, তিনি ডিটেক্‌টিভ; কিন্তু সে অবস্থায় সে কথাটা বলতে যেন তাঁর গলায় বেধে গেল। ব'লে ফেললেন, "আমি ডি. সি. গুপ্ত। আপনি কে?"

যেন দীনেশবাবুর মুখের কথাটাই কেড়ে নিয়ে আগন্তুক বললে, "আমি ডিটেক্‌টিভ। টাকা জালের কথা কিছু জানি না। কিন্তু এ বাড়িতে একটা খুন হচ্ছে খবর পেয়ে আমরা এসেছি। তবে সুখেব বিষয় যে মেয়েটাকে আপনি খুন করেন নি। দেখছি, তার গয়নাগুলো নিয়েই ভাগবার চেষ্টায় ছিলেন।"

দীনেশবাবু থতমত খেয়ে গেলেন। যেন তাঁর সব গুলিযে গেল। এ রকম একটা ভয়ঙ্কর অভিযোগের প্রতিবাদ করবার শক্তিও যেন বিলুপ্ত হয়ে গেল। কোথায় ডিটেক্‌টিভগিরি, জাল টাকা, রামশরণ, থানা-পুলিস! এ কি মুশকিলেব মধ্যে পডলেন তিনি!

তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে বাবুটি ঈষৎ হেসে বললেন, "গুপ্ত মশায়, আর ভাবছেন কি? সব বোঝা গেছে। এখন আব 'গুপ্ত' থাকলে চলবে না, 'ব্যক্ত' হতে হবে। চলুন থানায়।"

দীনেশবাবুর চমক ভাঙল। আত্মরক্ষা করতে হবে তো! এ কি মিথ্যা অপবাদ! তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত ক'রে যথাসম্ভব দৃঢ়স্বরে বললেন, "এসব আপনি কি বলছেন মশাই? সত্যি সত্যিই এখানে কতকগুলো লোক টাকা জাল করছে, আর আমি সেই খবর পেয়ে তাদেব ধরিয়ে দেবার জন্যে এসেছি। বিশ্বাস না হয়, ঐ পাশের ঘরে চলুন—দরজার ফাঁক দিয়ে আপনাকে সব দেখিয়ে দিচ্ছি।"

"কিচ্ছু দেখাতে হবে না মশাই। ও তো চিবদিনই হয়। ওসব ব'লে আমাকে ধাপ্পা দিতে পারবেন না। এখন চলুন,—থানায় চলুন।"

দীনেশবাবু আরও দৃঢ়স্বরে বললেন, "কি করেছি আমি যে থানায় যাব?"

"এই মেয়েটিকে ভয় দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসে—"

"কে বললে আমি ওকে নিয়ে এসেছি! ও এই বাড়িতেই ছিল,—গুণ্ডাবা ওকে ধ'বে নিয়ে এসেছে। এই একটু আগেই ও আমার কাছে এসে ওকে বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্যে কাঁদাকাটা কবছিল। না হয়, ওকে জিজ্ঞাসা করুন। (স্ত্রীলোকের প্রতি) বল না গো, কি হয়েছিল!"

স্ত্রীলোক নিরুত্তর। এই এত কথা বলছিল,—একেবারে চুপ! কি মুশকিল!

বাঙালীবাবু বললেন, "থাক্, আর ওকে নিয়ে টানাটানি কেন? ভদ্রলোকের মেয়ে, ও আর কি বলবে। আপনিই ওকে নিয়ে এসেছেন। যদি সেটা ঠিক না হ'ত, তা হ'লে ও এতক্ষণ তার প্রতিবাদ করত।"

"আমি নিয়ে এসেছি? কলকাতার রাস্তায় একজন আর এক-জনকে এমন ভাবে নিয়ে আসতে পারে? ও তো চেঁচালেই পারত।"

"আপনি পিস্তল দেখিয়ে ওকে নিয়ে এসেছেন। আপনার কাছে পিস্তল নেই? বলুন।"

দীনেশবাবুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল,—বুক দুরদুর ক'রে উঠল। সত্যিই তো, তাঁর কাছে পিস্তল আছে। এরা জানলে কেমন ক'রে?

"মনে করছিলেন, চুপি চুপি কাজ সারবেন; কিন্তু আমাদের গোয়েন্দা সেখানে ঘুরছিল। সে সবই দেখেছে। আপনার হাতে পিস্তল ছিল ব'লে একা এগুতে সাহস করে নি। আপনার পেছনে এই বাড়ি পর্যন্ত এসে তখুনি গিয়ে আমাকে খবর দিয়েছে। এখন তো সব বুঝতে পারলেন। চলুন, আর দেরি করতে পারব না।"

এবার দীনেশবাবুর মুখে ভয়ের রেখা ফুটে উঠল। বাধা দিলে এতগুলো লোকের সঙ্গে পেরে উঠবেন না। শেষে এরা জোর ক'রে তাঁকে থানায় নিয়ে যাবে, সেটা তো আরও খারাপ। থানায় গিয়ে না হয় সব কথা বলতে পারেন, কিন্তু তাঁর কথা তখুনি বিশ্বাস করবে কে? শেষ পর্যন্ত কিছু না হ'লেও তো একটা তদন্ত হবে,—সব জানাজানি হবে, হয়তো খবরের কাগজেই বেরিয়ে পড়বে! কি কেলেঙ্কারি!

তখন আগন্তুকদের মধ্যে একজন দীনেশবাবুকে প্রায় জোর ক'রেই সিঁড়ির ধারের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বললে, "বাবু, আপনাকে তো ভদ্রলোক ব'লেই মনে হচ্ছে। বোধ হয় এ কাজে নতুন নেমেছেন। হয়তো একটা ঝোঁকের মাথায় কাজটা ক'রে ফেলেছেন, তাই আপনাকে নিয়ে আর টানাটানি করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। আমাদের সঙ্গে একটা মিটমাট ক'রে ফেলুন।"

দীনেশবাবু তখনও ঠিক প্রকৃতিস্থ হন নি, বললেন, "সে আবার কি?"

"সেটা আমি আমাদের বাবুকে ব'লে ঠিক ক'রে দিচ্ছি।" ব'লেই লোকটা পাশের ঘরে গিয়ে একটা লোকের সঙ্গে ফিসফাস ক'রে দু-চারটে কথা ব'লে আবার দীনেশবাবুর কাছে এল, বললে, "বাবুকে অনেক ব'লে-ক'য়ে রাজি কবিয়ে এলুম, আমাদের পাঁচ শো টাকা দিয়ে আপনি চ'লে যেতে পারেন।"

টাকার কথা শুনেই দীনেশবাবুর রক্ত গরম হয়ে উঠল। কি জঘন্য! টাকা চায়! এরাই না ডিটেক্‌টিভ পুলিস! ছিঃ!

কিন্তু উপায় কি? যে অবস্থায় তিনি পড়েছেন তাতে যে কোনও রকমে নিষ্কৃতি পেলে বাঁচেন, বললেন, "পাঁচ শো টাকা!"

"হ্যাঁ, পাঁচ শো টাকা। বেশি আর কি?"

"কোথা পাব আমি অত টাকা?"

"হ্যাঁ, অত টাকা সঙ্গে থাকা সম্ভব নয়, তা হ'লে একখানা চেক লিখে দিয়ে যান।"

"চেক-বই তো সঙ্গে নেই।"

লোকটা যেন একটু গম্ভীর হয়ে বললে, "তাই তো, তা হ'লে!" তারপর যেন আরও একটু চিন্তা ক'বে বললে, "আচ্ছা, তা হ'লে সঙ্গে যা আছে তাই দিয়ে যান।"

অল্প একটু ভাববার অবসর পেয়ে দীনেশবাবুর মন আবার বিদ্রোহী হয়ে উঠল, ভাবলেন, কেন তিনি এ অত্যাচারের প্রশ্রয় দেবেন? কি অপরাধ করেছেন তিনি? রামশরণ তো থানায় পুলিস ডাকতে গেছে, আসুক না তারা। তাবপর যা হয় হবে।

লোকটা তাঁকে ভাবতে দেখে বললে, "নিন, আর ভাববার সময় নেই। ঘড়িটা আংটিটা চটপট ক'রে খুলে ফেলুন, আর টাকাকড়ি সঙ্গে যা আছে বার ক'রে দিন, আপনি যদি সত্যি সত্যিই থানা-পুলিস

ডাকবার জন্যে কাউকে পাঠিয়ে থাকেন, তা হ'লে তারা আসবার আগেই আমাদেব যা কিছু করবার শেষ ক'রে নিতে হবে। তারা এসে পড়লে আর আমরা আপনার সঙ্গে মিটমাট করতে পারব না।"

তখন আরও দু-তিন জন লোক সেই ঘরেব মধ্যে এসে ঢুকল। একজন টর্চ জ্বাললে। দীনেশবাবু তাদের দিকে তাকিয়েই যেন একটু আঁতকে উঠলেন। তাঁর মনে হ'ল যেন তাদের তিনি যা ভেবেছিলেন তারা তা নয়। তখন তিনি যন্ত্রচালিতের মত নিজের হাতঘড়ি আর আংটি খুলে নিয়ে ও পকেট থেকে মনিব্যাগ বাব ক'রে লোকটার হাতে দিলেন। এই সব কাজে লোকটা তাঁকে সাহায্য করলে,—অর্থাৎ তাঁর কাছে আর কিছু আছে কি না সেটা প্রকারান্তবে দেখে নিলে। পিস্তলটা নিলে না।

তারপব দীনেশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে নীচে নেমে গিয়ে বললে, "এই নিন আপনার ট্রাম-ভাড়া।" ব'লে একটা সিকি তাঁব হাতে গুঁজে দিয়েই তাঁকে ঠেলে বাস্তায় বাব ক'বে দিলে। তিনি টলতে টলতে চ'লে গেলেন।

৫

দীনেশবাবু পরের দিন সকালবেলায় যোগেশবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর মুখ-চোখের ভাব দেখেই যোগেশবাবু বুঝলেন যে, কিছু একটা হয়েছে। জিজ্ঞাসা কবলেন, "খবর কি? অত শুকনো দেখছি কেন?"

গতরাত্রের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে দীনেশবাবু বললেন, "কলকাতা পুলিসের ডিটেক্‌টিভে ঘেন্না ধ'বে গেছে মশাই। কি অত্যাচারী—কি ডিজ্‌অনেস্ট!"

যোগেশবাবু একটু হেসে বললেন "ভুল বুঝেছেন দীনেশবাবু, তাদের কেউ কোনও পুরুষে ডিটেক্‌টিভ নয়।"

"তবে কি ?"

"আপনি 'নৌশেরা' দলের হাতে পড়েছিলেন।"

"সে আবার কি ?"

"সেটাও জানেন না ? কলকাতায় ও একটা মস্ত দল আছে। তারা নানা ছলে লোককে ফুসলে তাদের সুবিধামত জায়গায় নিয়ে গিয়ে তোলে, তারপর তাদের দলের আর কয়জন লোক এসে ডিটেক্‌টিভ পুলিসের অভিনয় ক'রে ঠিক এই রকম ঠকিয়ে, না হয় কেড়ে-কুড়ে নেয়।"

"ওঃ, ঠিক তো ! ডিটেক্‌টিভ স্কুলে ট্রেনিংয়ের সময় ওদের কথা পড়েছিলাম বটে, এখন মনে হচ্ছে।"

"প'ড়ে তো ছিলেন, কিন্তু কাজে লাগাতে পারলেন কই ? সেই জন্যেই তো অভিজ্ঞতার দরকার। আমি তো আপনাকে বরাবরই ব'লে আসছি যে, এসব বিষয়ে একটু প্রাক্‌টিক্যাল এক্স্‌পিরিয়েন্স না হ'লে কাজে নামা ঠিক নয়।"

"কিন্তু আপনি যাই বলুন, টাকা জাল করাটা আমি ঠিক স্পট করেছিলুম।"

"না, সে বিষয়েও আপনি মস্ত ভুল বুঝেছিলেন।"

"সেটা আমি স্বীকার করতে পারলুম না যোগেশবাবু, মাপ করবেন। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তারা টাকা তৈরি করছিল।"

"হ্যাঁ, তৈরি করছিল তা ঠিক ; কিন্তু জাল করে নি।"

দীনেশবাবু সবিস্ময়ে যোগেশবাবুর মুখের দিকে চাইলেন। বললেন, "সে আবার কি ?"

"এই দেখুন, এটাও আপনি জানেন না। হিন্দুস্থানীরা গলায় রামচন্দ্রী টাকা বা মোহরের মালা পরে, দেখেছেন ?"

"হ্যাঁ, তা তো দেখেছি।"

"আপনার কি মনে হয়, সে টাকাগুলো রঘুপতি রামচন্দ্রের আমলে তৈরি হয়েছে ?"

"অত পুরনো না হোক, হিন্দু রাজাদের আমলের টাকা হতে পারে।"

"কোনও আমলেরই নয়। সেকেলে টাকা এত কখনও পাওয়া যায় ? ঐ রকম টাকা তৈরি করবার জন্য কলকাতায় অনেক কারখানা আছে। আচ্ছা, বলুন দেখি, আপনি তো দরজার ফাঁক দিয়ে দেখেছিলেন, টাকাগুলো ঠিক আধুনিক টাকার মতই বড় ব'লে মনে হয়েছিল কি ?"

"না, তার চেয়ে যেন একটু ছোট ব'লে মনে হ'ল। তবে আমি ভাবলুম যে, খুব পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে না ব'লে বোধ হয়, ও-রকম মনে হচ্ছে।"

"তারা রামচন্দ্রী টাকাই তৈরি করছিল। টাকা জাল করলে কি আপনি অত সহজে তাদের কাজ দেখতে পেতেন ? যারা জাল-জুয়াচুরি করে, তারা আপনার আমার চেয়ে বড় কম বুদ্ধি ধরে না। যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে, নিজেকে ভাল ক'রে তৈরি ক'রে না নিয়ে আর ও-পথে যাবেন না। ডিটেক্‌টিভরা 'বর্ন' হ'লেও তাদের কিঞ্চিৎ 'মেক' করার দরকার হয়, সেটা মনে রাখবেন।"

রাজাবাবু

কালীঘাটের যজ্ঞেশ্বর ডাক্তারের পসার আর কিছুতেই জমল না। অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই,—চক্‌চকে সাইন-বোর্ড, ঝক্‌ঝকে চেয়ার টেবিল, রঙ-বেরঙের শিশি-বোতল-ভরা বড় বড আলমারি, মাসিক ভাড়ায় বন্দোবস্ত করা 'নিজের' মোটর গাড়ি, গম্ভীর মেজাজ, পরিমিত বাক্যালাপ, স্থানবিশেষে ঈষৎ হাসি, রিহার্সেল দেওয়া কাশি ইত্যাদি সবই আছে; কিন্তু অভাব কেবল 'কলে'র। ডাক যে একেবারেই নেই তা নয়, কিন্তু সে যেন চৈত্র মাসের মেঘের ডাকের মত, যত গর্জে তত বর্ষে না। কর্মক্ষেত্র প্রায় পাড়াটির মধ্যেই আবদ্ধ; কাজেই অনেক স্থলে চক্ষুলজ্জার খাতিরে ভিজিটের পরিবর্তে নমস্কারটাই মেলে। তবে নিকটে একটি ছোট বস্তি আছে, সেখানে দু-একটা 'কল' মাঝে মাঝে জুটলে যৎকিঞ্চিৎ পকেটে আসে। ডাক্তার ভাবে, কি কুক্ষণেই কলকাতায় ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের আবির্ভাব হয়েছিল,—এমন সোনার বস্তিগুলোকে একেবারে দেশছাড়া ক'রে দিয়েছে!

বাঁকুড়া জেলার এক অজ পল্লীগ্রামে যজ্ঞেশ্বর ডাক্তারের বাড়ি—অর্থাৎ 'দেশ'। বাপের অবস্থা মোটামুটি রকমে মন্দ ছিল না। নিজে চাষবাস দেখে শুনে ও সেই সঙ্গে কিছু তেজারতি ক'রে সামান্য কিছু সঞ্চয় করেছিলেন; কিন্তু কলকাতায় রেখে ছেলেকে ডাক্তারি পড়াতে পড়াতে পুঁজিপাটা যখন প্রায় শেষ হয়ে এল, তখন পাড়ার পাঁচজনে বললে, "মণ্ডল মশাই, আর পড়িয়ে কি হবে? যা শিখেছে তাতে পাড়াগাঁয়ে স্বচ্ছন্দে ক'রে খেতে পারবে, এখন বাড়িতে এসে প্র্যাক্‌টিস করুক।" কিন্তু যাঁরা বিশেষ আত্মীয় তাঁরা বললেন, "তাও কি

হয়! একটি ছেলে,—আর ছেলে ব'লে ছেলে, যেন হীরের ধার,— তাকে শেষ পর্যন্ত 'ষাঁড়ের গোবর' করবে? এখন আদা খেয়ে আদার গিয়েয় ঠেকেছে, চোখ-কান বুজে পাসটা করিয়ে নাও।" কাজেই মণ্ডল মশাই তাঁদেরই কারুর নিকটে শতকরা বারো টাকা সুদে জমি বন্ধক্ রেখে টাকা ধার ক'রে যগুর খরচপত্র চালিয়ে তাকে যখন কোন রকমে টেনে-টুনে এপারে তোলবার যোগাড় করেছেন, তখন হঠাৎ একদিন হার্টফেল ক'রে নিজেই ওপারে চ'লে গেলেন।

পাস-টাস ক'রে যগু ভাবলে যে, এমন অগম্য পাড়াগাঁয়ে থাকলে জীবনটা একেবারে মাটি হয়ে যাবে। তাই জমি-জায়গাগুলো বিক্রি ক'রে দেনা-টেনা মিটিয়ে বাকি টাকাটা ও গৃহিণীটি নিয়ে অনেক আশা-ভরসা করতে করতে কলকাতায় এসে কুমারটুলিতে প্রাকটিস জুড়ে দিলে।

বরাৎ মন্দ,—প্রায় দু বৎসর ধস্তাধস্তি ক'রেও যখন কিছুই হ'ল না তখন যগু ভাবলে যে, এ পাড়াটায় এসে ভাল করে নি। একে এখানে ডাক্তার অনেক, তার ওপর মা গঙ্গার হাওয়ার কৃপায় ব্যারাম বড়ই কম। এমন একটা জায়গায় বসতে হবে, যেখানে ডাক্তার নেই। কিন্তু কুমারটুলি থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত যেখানেই খোঁজ করে, সেখানেই দেখে যে প্রায় প্রতি লাইট-পোস্টের গায়েই ডাক্তার; তাই আরও দু-এক জায়গায় 'ট্রাই' ক'রে ধাক্কা খেতে খেতে শেষে কালীঘাটে মা কালীর চরণতলে গিয়ে ঠেকল। আশা, যদি আসল ব্যবসাটার সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশে কোথাও একটা ঘর নিয়ে ডালার দোকান কিংবা বাঁকুড়া থেকে পাঁঠার চালান ইত্যাদি কোন রকম কিছু একটা আনুষঙ্গিক চালিয়ে অন্তত বাসা ভাড়াটারও যোগাড় ক'রে নিতে পারে।

এহেন যগু ডাক্তার এক ধীরসমীরসেবিত জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শরতের

শীতল সন্ধ্যায় গৃহিণীর সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত। দাম্পত্য কলহে কোথাও কেমন একটু-আধটু আদিবসেব ছিট থাকে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাব কিছুই নেই। এক দিকে অনর্গল বীবরস ও অপব দিকে (অর্থাৎ ডাক্তাবেব দিকে) মাঝে মাঝে ঈষৎ করুণবস। কাজেই যুদ্ধটা একতরফাই চলছে।

গিন্নী বলছেন, "এত টাকা খবচ ক'বে এমন পড়া পডলে যে বাসা খবচটাও চালাতে পাব না। তাব চেয়ে একটা চাকবিব পডা পডলেই তো হ'ত।"

ডাক্তাব তর্কেব খাতিবে ব'লে ফেললে, "ডাক্তাবি পাস ক'রে কি চাকবি কবা যায না?" যেমন এই স্বীকাবোক্তি অমনি সঙ্গে সঙ্গেই বায পাস হ'যে গেল যে, তা যদি কবা যায, তা হ'লে যেমন ক'বেই হোক একটা চাকবিব যোগাড কব।

হুকুম তো হ'ল, কিন্তু তামিল হয কেমন ক'বে? বালিব চটকলে একজন ডাক্তাবেব দরকাব ছিল, কিন্তু সেখানে চাকবি কবতে ডাক্তাব বাজি নয। কারণ মাথা-ফাটা আব আঙুল-কাটাব ব্যাণ্ডেজ কবতে কবতেই যা কিছু শিখেছে সব ভুলে যাবে। একবাব মনে কবলে, খববেব কাগজে বিজ্ঞাপন দেয; কিন্তু ভাবলে যে, ডাক্তাব-সমাজে তা হ'লে বড খেলো হতে হবে, আব যা একটু-আধটু কল জুটছে তাও বন্ধ হযে যাবে; তাব চেযে গোপনে গোপনে সন্ধানই ভাল। দু-একটা খবব আসে, কিন্তু সে সব সুদূব পল্লীগ্রামে। কাজেই গিন্নীব অমত। কলকাতা ছেড়ে যেতে তিনি বাজি নন কাবণ তাই যদি হ'ল তা হ'লে দেশে বসলেই তো হ'ত! কলকাতাব মধ্যে, কি আশেপাশে কোথাও চাকবি চাই,—তা হ'লে সব দিক বজায থাকে। কিন্তু ডাক্তাব যখন সে রকম কিছুই জোটাতে পাবলে না, তখন অনেক ভেবে-চিন্তে

অগত্যা চোখ-কান বুজে একটা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বসল।

কিছুতেই কিছু হ'ল না,—এ দিকে হাতের পুঁজিপাটা ক্রমশ শেষ হয়ে আসতে লাগল। এ অবস্থায় একদিন বৈকালে ডাক্তার নিজের ডিস্পেন্সারির এক কোণে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ডাক্তারী হাব-ভাবের রিহার্সেল দিচ্ছে, আর ভাবছে, বুঝিবা কলকাতার লীলা সাঙ্গ ক'রে আবার সেই বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলে গিয়েই ঢুকতে হয়। এমন সময় রাস্তার উপর হঠাৎ এক বিকট চিৎকার! বেরিয়ে গিয়ে দেখলে, এক নধরকান্তি চন্দনচর্চিতবপু পট্টবাসপরিহিত তিলকমালাশোভিত বৃদ্ধ পাশের বাড়ির সামনে লাইট-পোস্ট ধ'রে চীৎকাব করছে।

দেখতে দেখতে অনেক লোক জুটে গেল ও বৃদ্ধকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন ক'রে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলল। বৃদ্ধ কিছুই বলে না, কেবল "উঁহু" ক'রে চীৎকার করে। শেষে সকলে ধরাধরি ক'রে ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে। তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধের চৈতন্য লোপ।

ডাক্তার দেখলে, এ গোলমালে সে কিছুই ঠিক করতে পারবে না। তাই সকলকে বললে, "মশাইরা, আপনারা একটু বাইরে যান, আমি দেখি, লোকটির কি হয়েছে!" কথাটা কারও বড় মনঃপূত হ'ল না, কারণ সবেমাত্র উদ্দীপনাটা জ'মে এসেছে, এরই মধ্যে রসভঙ্গ! যা হোক, সকলে মুখ ভারী ক'রে ও ডাক্তারের সম্বন্ধে দু-চারটে শ্রুতিকটু মন্তব্য ঝাড়তে ঝাড়তে ডাক্তারখানা থেকে চ'লে গেল। পাড়ারই একটা ছেলে বলতে বলতে গেল, "ও যখন যণ্ড ডাক্তারের হাতে পড়েছে, তখন আর বেশি দেরি নেই; ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যেই কেওড়াতলায় এগিয়ে দেবে।"

বৃদ্ধের মুখে চোখে জল দিয়ে নাকের কাছে একটা শিশি ধ'রে

কিছুক্ষণ থাকতেই সে আস্তে আস্তে দু-একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে চোখ খুলল। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলে, "এখন কেমন বোধ করছেন?"

"অনেকটা ভাল।"

"আপনার কিসের যন্ত্রণা হচ্ছে?"

"আপনিই কি ডাক্তার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এটি আমারই ডাক্তারখানা।"

"দেখুন, আমার মাঝে মাঝে শূলের ব্যথা ওঠে, আর যখন ব্যথাটা বেশি হয় তখন এই রকম অজ্ঞান হয়ে যাই। কিন্তু আজ দেখছি বড় শিগগিব ব্যথাটা ক'মে গেল,—আপনারই যত্নে।"

"আমি আব কি কবেছি! তবে কোন নির্জন স্থানে এ রকম হ'লে—"

"তুমি যা করেছ বাবা, আমার ছেলে হ'লে এর চেয়ে বেশি কিছু করত না। আমি ব্রাহ্মণ, আশীর্বাদ করছি—" এই ব'লে বৃদ্ধ হাত তুলল।

যতই হোক, ডাক্তারের গায়ে এখনও বাঁকুড়া জেলার পাড়াগাঁয়ের গন্ধ আছে। এখনও পর্যন্ত কলকাতার নীরস ব্যবসাদারী ও তদানুষঙ্গিক শুষ্ক হাসিটা হাজার চেষ্টা ক'রেও ভাল ক'রে আয়ত্ত করতে পাবে নি; তাই বৃদ্ধের কথায় ও ভাবে তার চোখ ছলছল ক'রে উঠল। ক্রমশ আলাপে প্রকাশ হ'ল, বৃদ্ধের নাম ধনঞ্জয় বাচস্পতি, নিবাস ঢাকা বিক্রমপুর। ঢাকার এক বড় জমিদার নীলরতনবাবু তাঁর শিষ্য। সম্প্রতি নীলরতনবাবু বালিগঞ্জে আছেন, ও তাঁর আহ্বানমত বৃদ্ধ আজ চার-পাঁচ দিন কলকাতায় এসেছেন। কালীঘাটে আর একটি শিষ্য আছে, তার সঙ্গে দেখা ক'রে মা কালীর আরতি দেখে যাবেন মনে ক'রে বেরিয়েছিলেন। যেতে যেতে এই বিপদ।

বড় জমিদারের কথা শুনে ডাক্তারের মনটা যেন কেমন ক'রে উঠল। ইচ্ছেটা, যদি কোন রকমে তার 'ফ্যামিলি' ডাক্তার কিংবা সেই রকম কিছু একটা হয়ে ঢুকতে পারে। তাই তাঁর সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত আলোচনা আরম্ভ করলে। কিন্তু ফল বড় আশাপ্রদ ব'লে মনে হ'ল না। কারণ নীলরতনবাবুর 'ফ্যামিলি'র বড়ই অভাব। সন্তানাদি নেই, এবং গৃহিণীও চার-পাঁচ বৎসর মারা গেছেন। অনেকে পোষ্যপুত্র নেবার উপদেশ দিচ্ছে। কিন্তু বাবু বড় সাচ্চা লোক; বলেন, "এক গাছের ফল কি আর এক গাছে জোড়া লাগে?" টাকাকড়ির ওপর মায়া নেই, তবে সম্প্রতি বাচস্পতি মশাই প্রমুখ কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির উপদেশে কিছু সৎকার্যে মন দিয়েছেন। স্ত্রীর নামে ঢাকায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হচ্ছে, তারই প্রতিষ্ঠার শুভদিন স্থির করবার জন্য বাচস্পতি মশায়ের কলকাতায় আগমন।

ডাক্তারের পিপাসিত প্রাণ বাচস্পতি মশায়ের কথা-সবিৎ-সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগল। বললে, "ডাক্তারখানার জন্য কি ডাক্তারের সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে?"

"তা তো ঠিক বলতে পারি না বাবা; তবে জিজ্ঞেস ক'রে দেখতে পারি। কেন? তোমার কি জানাশোনা ডাক্তার কেউ আছে?"

"দেখুন, যদি তেমন সুবিধা হয়, তা হ'লে আমি নিজেই—"

"ওঃ! তা বেশ, তা বেশ। যদি তোমার সুবিধা হয়, তা হ'লে আমি ব'লে-ক'য়ে দেখতে পারি। তবে তোমরা কলকাতার লোক, অত দূরে গিয়ে কি পোষাবে?"

"কি আর করি বলুন? কলকাতায় এসে থেকে নিজেই অনবরত ডিস্পেপসিয়ায় ভুগছি, তা আর অন্যের চিকিৎসা করি কেমন ক'রে? তাই মনে করছি—"

"আচ্ছা। তা হ'লে তুমি কাল একবার এমনি সময় যাবে; আমি এর মধ্যে বাবুকে ব'লে-ক'য়ে ঠিক ক'রে রেখে দেব।" এই ব'লে বাচস্পতি মশাই গাত্রোত্থান করলেন ও "আজ আর দেখছি কালীঘাটের শিষ্যবাড়ি যাওয়া হয় না"—ইত্যাদি বলতে বলতে ডাক্তারের প্রগাঢ় ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিয়ে ও আর এক দফা তাকে আশীর্বাদ ক'রে প্রস্থান করলেন।

অতি শঙ্কিতচিত্তে ডাক্তার প্রস্তাবটা গিন্নীর কাছে পেশ করলে। প্রথমটা তো গিন্নী আমলই দিলেন না, বললেন, "কলকাতা ছেড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে আমি ওসব দেশে গিয়ে থাকতে পারব না। যেতে না যেতেই নোনা লাগবে।" ইত্যাদি। তারপর যখন ডাক্তার বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বললে যে, ঢাকা প্রায় কলকাতারই মত, আর মাছ দুধ দই মিষ্টি ইত্যাদি খুবই সস্তা, তখন গিন্নীর মনটা কিছু ভিজে আ'সতে লাগল। সেই সুযোগে ডাক্তার একটা অমোঘ অস্ত্র নিক্ষেপ করলে,—অর্থাৎ কলকাতায় থাকলে মাঝে মাঝে দেশ থেকে আত্মীয়-স্বজনের আমদানির উপদ্রব আ'ছে; কিন্তু ঢাকায় গেলে সে সব আপদের সম্ভাবনা নেই। এটা অকাট্য যুক্তি, কাজেই গিন্নী এর ওপর আর কিছু বলতে পারলেন না, তবে ডাক্তারকে একটা অঙ্গীকার করিয়ে নিলেন যে, ঢাকায় গিয়েই অন্তত ইন্‌স্টলমেণ্টে একখানা মোটর গাড়ি কিনতে হবে,—কারণ মাসিক ভাড়ায় সেখানে গাড়ি না পাওয়াই সম্ভব।

পরদিন বৈকালে ডাক্তার পুরোদস্তুর সাহেবী বেশে সেজে, পকেট-কেস, স্টেথিস্‌কোপ ইত্যাদি সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে (কারণ যদি কোন বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়) 'নিজের' মোটরে ঠিক সা'ড়ে চারটের সময় নীলরতনবাবুর বাড়িতে উপস্থিত। প্রকাণ্ড বাড়ি, মস্ত কম্পাউণ্ড, সুন্দর

ফুলের বাগান, মাঝখানে ফোয়ারা, পাশে গ্রীন হাউস, সিঁড়ির ধারে ও বারান্দায় নানা রকমের ফুলের টব ইত্যাদি, দেখতে দেখতে ডাক্তার কতকটা অবাক হয়ে কতকটা সশঙ্কিত মনে আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠতেই এক ঝকঝকে-জরিদার-পোশাক-পরা চকচকে-চাপরাসধারী বেয়ারা একখানা প্লেট হাতে নিয়ে এসে সেলাম ক'রে দাঁড়াল। ডাক্তার প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়েই পকেটে হাত দিয়ে বললে, "ওঃ, ! কার্ড-কেসটা তো আনতে ভুল হয়ে গেছে !" বেয়ারাব প্রফুল্ল বদন কিঞ্চিৎ গম্ভীর হয়ে গেল, বললে, "তবেই তো বড গোলমাল হুজুর : এত্তেলা না দিলে তো রাজাবাবুর সঙ্গে দেখা হবে না।" ডাক্তার ভাবলে, কি ভুলটাই করেছি ? অন্তত টাইপ-করা একখানা কার্ড আনলেও কতকটা মান থাকত। ডাক্তারের শুকনো মুখ দেখে চাপরাসীর একটু দয়া হ'ল। বললে, "আচ্ছা হুজুর, নামটাই বলুন, আমি একবার খবর দিয়ে দেখি।"

"বল, কালীঘাটের ডাক্তার মণ্ডল এসেছেন ; বাচস্পতিজী কাল আসতে ব'লে এসেছিলেন।"

"ও ! গুরুজী ?" বলতে বলতেই চাপরাসী একটু স্নিগ্ধ হাসি হেসে ভেতরে গেল।

পরক্ষণেই গুরুজী স্বয়ং উপস্থিত। ডাক্তারের দেহে যেন এতক্ষণে প্রাণ এল। তৎক্ষণাৎ এগিয়ে গিয়েই আভূমিপ্রণতি ও পদধূলি গ্রহণ।

"এস বাবা ! কতক্ষণ এলে ?"

"এই আসছি।"

"এস, ভেতরে এস।" ব'লে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়ে ও সেই অবসরে রাজাবাবুর অতুল সম্পদ ও অশেষ গুণাবলির বর্ণনা করতে করতে ও ডাক্তারের সম্বন্ধে যা কিছু বলবার তা ব'লে-

ক'য়ে রেখেছেন ইত্যাদি সংবাদ দিতে দিতে তাকে নিয়ে মার্বেলের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন।

ডাক্তার বাড়ির সাজ-সরঞ্জাম দেখেই অবাক। ভাবলে, বড়লোক বটে,—বাড়িটাকে যেন ইন্দ্রপুরী ক'রে তুলেছে! উপরতলার ব্যাপার আরও জমকালো। বারান্দা ঘর সমস্তই মার্বেলে বাঁধানো। প্রতি ঘরে বহুমূল্য আসবাবপত্র, মখমলের পরদা, ইলেক্‌ট্রিকের ঝাড় ইত্যাদি। এরই একটি ঘরে ডাক্তারকে বসিয়ে আর দু-চারটে কথাবার্তা ব'লে গুরুজী সায়ংসন্ধ্যার জন্মে তৈরি হতে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে এক সাহেবী পোশাকে সজ্জিত দিব্যকান্তি যুবা-পুরুষ ঘরের মধ্যে ঢুকে ডাক্তারকে দেখেই থমকে দাঁড়াল। ডাক্তারের বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল। মনে করলে, ইনিই রাজাবাবু। এই ভেবে দাঁড়িয়ে উঠে যেমন নমস্কার করতে যাবে, অমনি সে একটু এগিয়ে এসে অতি মধুর হাসি হেসে হাত বাড়িয়ে ডাক্তারের হাতখানা ধ'রে বেশ একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, "হ্যালো, আপনিই বোধ হয় ডক্টর মণ্ডল ?"

ডাক্তার বিনীত ভাবে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ—"

"ওঃ! আপনি ভুল বুঝেছেন; আমি মিস্টার গাহা (গুহ),—রাজাবাবুর ম্যানেজার। আপনার সম্বন্ধে সমস্তই গুরুজীর কাছে শুনেছি। কাল তিনি যে রকম বিপদে পড়েছিলেন, আপনি না থাকলে—"

"আমি আর এমন কি করেছি ?"

"বিলক্ষণ! আপনি তাঁর প্রাণ দিয়েছেন। রাজাবাবু তাঁর কাছে শুনে আপনার ওপর যে কি রকম প্লীজ ড হয়েছেন তা আর কি বলব ?"

"আমার সৌভাগ্য—এ রকম একটা সূত্র দিয়ে যে আপনাদের সঙ্গে আলাপ হ'ল!" ইত্যাদি মিষ্টালাপের পর ম্যানেজার সাহেব চা ও জল-খাবারের ফরমাশ করলে, এবং ডাক্তার যেমনই শিষ্টাচারসঙ্গত ঈষৎ আপত্তির অবতারণা করবার চেষ্টা করলে, অমনই ম্যানেজার হাস্যমধুর বদনমণ্ডল কিঞ্চিৎ গম্ভীর ক'রে বললে, "মশাই, এটা এঁদের বাড়ির চিরন্তন প্রথা,—ভদ্রলোক কেউ বাড়িতে এলে তাঁকে যদি যথারীতি এণ্টার্টেন করা না হয়, তা হ'লে রাজাবাবু বড়ই রাগ করেন।"

তারপর জলযোগের মাঝখানে ম্যানেজার আসল কথাটা উত্থাপন করলে। বললে, "গুরুজী বলছিলেন যে, আপনি চাকরির চেষ্টা করছেন।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কলকাতায় আমার শরীর ভাল থাকছে না, আর আমার স্ত্রীকে নিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছি।"

"কেন? তাঁর কি হয়েছে?"

"এখানে তাঁর শরীর মোটেই ভাল থাকছে না। মাঝে মাঝে যেন ডিরেঞ্জমেণ্ট অফ্ ব্রেনের মত হয়। তাই অনেক দিন থেকে মনে করছি, একটা ঠাণ্ডা জায়গায়—অর্থাৎ যেখানে খুব ফাঁকা আর বড় নদীর হাওয়াটা পাওয়া যায়,—এমন কোন একটা জায়গায় একবার ট্রাই ক'রে দেখব।"

"ঠাণ্ডা জায়গায় যদি উপকার হয়, তা হ'লে একবার দার্জিলিং কিংবা শিলঙে গিয়ে দেখুন না কেন?'

"দেখুন, এ তো আর দু-চার দিনে সারবার ব্যারাম নয়,—কিছু বেশি দিন না থাকলে স্থায়ী উপকার হবে না। তাই এমন একটা জায়গায় যাবার চেষ্টা করছি, যেখানে জল-হাওয়াটা ভাল, আর কিছু রোজগারও করতে পারি। তবে এতদিন তেমন চেষ্টা কিছু করি নি; কারণ

কলকাতার প্র্যাক্‌টিস্‌টা ছেড়ে যেতে মায়া হয়। যতই যা বলুন, এত বড় ফিল্ড আর কোথায় পাওয়া যাবে ?"

"তা তো বটেই, কিন্তু সব দিক তো বজায় রাখতে হবে !"

"সেইজন্য এবার স্থির করেছি যে সে রকম সুবিধার জায়গায় যদি একটা চাকরি-বাকরি কিছু মেলে, তা হ'লে চোখ-কান বুজে অন্তত কিছুদিনের জন্য কলকাতার মায়া কাটা— ।"

ক্রমশ ঢাকার ডিস্পেন্সারি, রাজাবাবুর জমিদারি, পৈতৃক ব্যবসা ইত্যাদি সম্বন্ধে দুজনের অনেক কথাবার্তা হ'ল। রাজাবাবুর বহুকালের পাটের কারবার, চালানী কাজ, শিপ্‌মেণ্ট, যুদ্ধের সময় কেবল করোগেট টিন থেকেই আট লক্ষ টাকা লাভ হয়েছিল, ইত্যাদি গল্প শুনতে শুনতে ডাক্তার একেবারে তন্ময় হয়ে গেল। ভাবলে, ভগবান, যাকে দাও তাকে কি এমনই ছপ্পর ফুঁড়েই দাও !

ম্যানেজার বললে, "যেমন আয় তেমনই ব্যয়ও যথেষ্ট আছে। আর এঁদের এস্টেটে চাকরির একটা বিশেষত্ব এই যে, মাইনেটা খুব বেশি ; আর সেটা রাজাবাবুর আমলে হয়েছে। তিনি বলেন যে, পেট ভরা থাকলে রোগে ধরে না।"

শুনতে শুনতে ডাক্তারের চোখে মুখে আনন্দের জ্যোতি ঠিকরে উঠল। বললে, "তা হ'লে দয়া ক'রে আমার একটা গতি ক'রে দিন। এমন আশ্রয় আর কোথা পাব ?"

ম্যানেজার সাহেব কিঞ্চিৎ গম্ভীর ভাবে, একটু মুরুব্বিয়ানা সুরে, ঈষৎ হেসে বললেন, "দেখা যাক, কতদূর কি হয় ! তবে একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রেখে দি। আমাদের এস্টেটে নিয়ম হচ্ছে, আমরা মাইনে যেমন বেশি দি, তেমনই কর্মচারীর কাছ থেকে কিছু টাকা জামিন নিয়ে রাখি ; কারণ রাজাবাবু বলেন যে, কর্মচারীরা ছেলের

মত; যদি কখনও ভুলভ্রান্তিবশত কিছু একটা ক'রেই বসে, তখন পুলিস ডেকে ফৌজদারী করা কিংবা দেওয়ানী আদালতে ডিক্রী ক'রে তাকে সর্বস্বান্ত করা—এসব নিষ্ঠুরতা তাঁর ভাল লাগে না। তার চেয়ে জামিনের টাকা থেকে বোধ শোধ ক'রে নিয়ে আস্তে আস্তে বিদেয় ক'রে দেওয়াই ভাল।"

জামিনের কথা শুনে ডাক্তারের প্রফুল্ল বদন কিঞ্চিৎ ম্লান হয়ে গেল। একটু উদ্বেগের ভাব দেখিয়ে বললে, "ডাক্তারদেরও কি জামিন দিতে হয়? তারা তো আর টাকাকড়ির কারবার করে না।"

"বলেন কি মশাই! ডাক্তারের চার্জে অতবড় একটা ডিস্পেন্সারি থাকবে, তার ওষুধ-পত্র সাজ-সরঞ্জামেরই দাম প্রায় বিশ হাজার টাকা, তা ছাড়া হাসপাতালের খরচপত্রের জন্য ডাক্তারের হাতে প্রায় সব সময় দু-তিন হাজার টাকা থাকবে; কাজেই জামিন না নিলে চলবে না। যাক, সে সব কথা পরে হবে। আগে আপনার সম্বন্ধে রাজাবাবুকে রাজি করাতে পারি কি না তাই দেখি। দরখাস্তও তো অনেক পড়েছে।"

"আপনি একটু ভাল ক'রে চেষ্টা করলেই হবে।"

"আমাকে বিশেষ চেষ্টা করতে হবে না বোধ হয়, কারণ গুরুজী আপনার দিকে আছেন। রাজাবাবু তাঁর কথা ঠেলতে পারবেন না। তারপর আপনার অদৃষ্ট।"

"মাইনেটা কি রকম কি হবে আপনারা স্থির করেছেন?"

"এখনও ফাইনালি ঠিক হয় নি, তবে তিন শো টাকার কম নয়।"

ডাক্তারের মুখে আবার আনন্দের জ্যোতি ফুটে উঠল; ভাবলে, এর জন্যে যদি তিন-চার হাজার টাকা পর্যন্ত জামিন দিতে হয়, তাও সে কোন

রকমে যোগাড় ক'রে দিয়ে দেবে। এখন রাজাবাবুর সঙ্গে দেখাটা হয়ে একটা কিছু পাকাপাকি কথা পেলেই মনটা ঠাণ্ডা হয়।

এই সময়ে ঘরের মধ্যে আর একজন লোক ঢুকল। লোকটার চেহারা কিছু রুক্ষ, চুলগুলো উস্কোখুস্কো। কাপড়-চোপড় ময়লা, রঙটা বেয়াড়া রকমের কালো. গলায় মালা, কপালে তিলক, মাথায় লম্বা টিকি।

ঘরে ঢুকতেই ম্যানেজার বললে, "আসুন, আসুন, সাহা মশাই, আমি মনে করেছিলুম, আপনি বুঝি আর এলেন না।"

"না এসে আর করি কি বলুন। যে দায়ে ঠেকেছি, আপনারা ভিন্ন আর গতি কি?"

ক্রমশ দুজনের মধ্যে যে কথাবার্তা হ'ল তাতে ডাক্তার বুঝলে যে, সাহা মশাই পূর্ববঙ্গের একজন বিখ্যাত পাটের ব্যবসাদার; সম্প্রতি একটা বড় অর্ডার নিয়ে সামলাতে পারছেন না, তাই রাজাবাবুদের একটা গদি থেকে কিছু মাল নিয়ে এ যাত্রা মান রাখবার চেষ্টায় আছেন। আজ চার-পাঁচ দিন ঘোরাফেরা করছেন, কিন্তু অগ্রিম দাদনের টাকাটা সম্বন্ধে কিছু স্থির না হওয়ায় কণ্ট্রাক্ট হচ্ছে না।

অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রে সাহা মশাই ম্যানেজারকে বললে, "অনেক জায়গায় চেষ্টা করলুম, কিন্তু হঠাৎ এত টাকার যোগাড় ক'রে উঠতে পারলুম না। আপনি দয়া ক'রে রাজাবাবুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দশ হাজার টাকাতেই রাজি করিয়ে দিন।"

"আমি আপনার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি সাহা মশাই, কিন্তু বারো হাজার টাকার কমে কিছুতেই হওয়া সম্ভব নয়। আপনারও তো আর সময় নেই; যখন আর কোন উপায়ই করতে পারলেন না, তখন ওতেই রাজি হয়ে যান; নইলে কি শেষে সব দিক হারাবেন?"

"আর রাজি হওয়া ছাড়া উপায় কি বলুন?" এই ব'লে সাহা মশাই একটা খুব লম্বা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে আস্তে আস্তে বুক-পকেট থেকে একটা প্যাকেট বার ক'রে তার ভেতব থেকে একশো টাকার নোট এক-একখানা বার ক'রে ম্যানেজারের হাতে দিতে লাগল। ডাক্তাব অবাক, কারণ এতগুলো টাকা একসঙ্গে সে কখনও দেখে নি। যখন টাকা দেওয়া শেষ হ'ল, তখন সাহা মশাই বললে, "তা হ'লে কালই যাতে কণ্ট্রাক্টটা রেজেস্ট্রি হয়ে যায় আব আমি দু-এক দিনের মধ্যেই মালটা পাই, দয়া ক'বে তাব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।"

"যে আজ্ঞে, আর আপনার কোন বিষয়েব জন্যে কিছু চিন্তা নেই; আপনি কাল ডেলিভারি-অর্ডার সকালেই নিয়ে ঢাকা যেতে পারবেন।"

তাবপর সাহা মশাই দু-একটা অবান্তর বিষয়ে কথাবার্তা ব'লে বিদায় হলেন। ডাক্তার কিছু আশ্চর্যভাবে জিজ্ঞাসা কবলে, "এতগুলো টাকা দিয়ে গেল, কই, রসিদ নিলে না তো?"

"বলেন কি মশাই! রাজাবাবুর কাছে আবাব রসিদ! বিনা রসিদে বারো হাজার কেন, বারো লাখ টাকা তাঁব সেরেস্তায় জমা দিয়ে গেলে তাব একটি পয়সাও এদিক ওদিক হবে না। এ রকম বিশ্বাস না থাকলে কি এতবড় কারবার চলে?"

ডাক্তার হাঁ ক'রে শুনতে লাগল, আব রাজাবাবুর সঙ্গে সাক্ষাতেব ইচ্ছেটা ক্রমে খুব বেড়ে উঠল। কিন্তু ইচ্ছেটা আব সেদিন পূর্ণ হ'ল না; কাবণ কিছুক্ষণ পরেই ম্যানেজাবেব কাছে সংবাদ এল যে, হুজুর-বাহাদুর গুরুজীর সঙ্গে শাস্ত্রালাপ আবম্ভ করেছেন; এখন বাইবে আসবেন না।

ডাক্তারের মনটা কিছু দ'মে গেল; ভাবলে, বডলোকেব চাব ধাবে যে রকম গণ্ডির উপদ্রব, তাতে সে সব ভেদ ক'রে শেষ পর্যন্ত পৌছানোই

শক্ত। যা হোক, "কাল আবার আসব" ব'লে ডাক্তার বিদায় নিলে।

বাড়িতে এসে গিন্নীর সঙ্গে অনেক তর্ক-বিতর্ক হ'ল। স্ত্রীলোক টাকা-পয়সার বিষয়ে চিরদিনই কিছু বেশি হুঁশিয়ার; তাই জামিনের কথাটায় সহজে রাজি হ'ল না; কিন্তু মাসিক তিন শো টাকার মায়াটাও ছাড়া বড় শক্ত। তাই আপত্তির বেগটা ক্রমশ হ্রাস হয়ে এসে শেষে দু হাজার পর্যন্ত জামিন দেওয়া যেতে পারে—এই স্থির হ'ল।

পরদিন ঠিক সেই সময় ডাক্তার রাজাবাবুর বাড়িতে উপস্থিত। ম্যানেজার খুব খাতির ক'রে উপরে ড্রয়িং-রুমে নিয়ে গিয়ে বসালে ও পূর্বদিনের মত যথারীতি জলযোগের পর বললে, "মশাই আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন; গুরুজীর কথাতেই কাজ হয়ে গেছে। আপনি এখন জামিনের টাকাটা দিয়ে ফেলুন।"

ডাক্তারের প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল; বললে, "আপনাকে আর কি ব'লে ধন্যবাদ দেব।"

"আহা। আমি আর কি করেছি? যদি ধন্যবাদ কাউকে দিতে হয় তো গুরুজীকে দেবেন; আপনি শুভক্ষণে তাঁর সুনজরে পড়েছিলেন।" ইত্যাদি কথা হতে হতেই এক সুগৌরকান্তি সর্বাঙ্গসুন্দর সুবেশধারী প্রৌঢ় পাশের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠতেই ডাক্তারও দেখাদেখি দাঁড়িয়ে উঠল।

ম্যানেজার একটু এগিয়ে গিয়ে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললে, "হুজুর, ইনিই ডাক্তারবাবু, যাঁর কথা গুরুজী আপনাকে বলেছেন।"

"ওঃ। বসুন।" বলতে সকলে বসতেই রাজাবাবু ডাক্তারের চেহারাটা বেশ আপাদ-মস্তক পর্যবেক্ষণ ক'রে ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এঁকে সমস্ত বলেছেন?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"দরখাস্ত অনেক পড়েছে; তবে গুরুজীর বিশেষ অনুরোধ, তাই আপনাকেই বাহাল করব স্থির করেছি।"

মনের আবেগে ডাক্তারের আর মুখ দিয়ে কথা বেরুল না, কেবল বললে, "হুজুরের দয়া।"

তারপর কাজকর্ম কি করতে হবে না-হবে এসব সম্বন্ধে দু-চার কথা হতে হতেই রাজাবাবুর সদয় সাহস পেয়ে ডাক্তার বললে, "হুজুর, যদি এতটা অনুগ্রহ করলেন, তা হ'লে জামিনের টাকাটা কিছু মাপ করতে হুকুম হয়।"

এই কথা শুনেই রাজাবাবু একেবারে অগ্নিশর্মা। বললেন, 'বলেন কি মশাই! আপনার হাতে এত হাজার টাকার জিনিসপত্র থাকবে, আর এই সামান্য তিন হাজার টাকার জামিন দেবেন না? ওসব হবে-টবে না। যদি না পারেন তা হ'লে আমাকে অন্য লোক বাহাল করতে হবে।" এই ব'লেই তিনি ভেতরে চ'লে গেলেন।

ডাক্তার তো অবাক।

ম্যানেজার বললে, "ডাক্তারবাবু, এ করলেন কি? হঠাৎ আপনি ও-কথাটা বলতে গেলেন কেন? বড়লোকের মেজাজ বুঝে ঠিক তালের মাথায় কথা বলতে হয় মশাই। আপনার তো ওসব অভ্যাস নেই,—কাজেই সব গুলিয়ে দিলেন।"

ডাক্তারের মুখ চুন। বললে, "কি ক'রে জানব মশাই? এখন উপায়?"

"উপায় আর কি? তবে দেখি আমি একবার চেষ্টা ক'রে। টাকা উনি গ্রাহ্য করেন না। নিজে হাতে দশ-বারো লাখ টাকা দানই ক'রে দিয়েছেন, দু-চার হাজারের কথা ওঁর মনে জায়গাই পায় না,—তবে

কিনা আপনি বড় বেতালে কথাটা উত্থাপন ক'রে ফেলেছেন। আচ্ছা, আমি একবার ব'লে দেখি।" এই ব'লে ম্যানেজার ভেতরে গেল ও একটু পরেই হাসতে হাসতে ফিরে এসে বললে, "যাক, অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এক রকম রাজি করিয়েছি ; আপনি মশাই—"

বলতে বলতেই রাজাবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকলেন ও ডাক্তারের দিকে কিঞ্চিৎ সকরুণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "আচ্ছা, ম্যানেজারবাবুর অনুরোধে আমি পাঁচ শো টাকা কমিয়ে দিলুম ; আর এ সম্বন্ধে কোন রকম উপরোধ-অনুরোধ যেন না শুনি।"

কাজেই ডাক্তারকে তাতেই রাজি হতে হ'ল।

ঠিক এই সময়ে বেয়ারা এসে ম্যানেজারবাবুকে খবর দিলে যে, একটি ভদ্রলোক হুজুরের সঙ্গে একবার দেখা করতে চান। ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ বাইরে এসে একটু পরেই একটি লোককে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল ও বললে, "হুজুর, এঁর নাম হীরালালবাবু, হুজুরের সঙ্গে একটু—"

লোকটার চেহারা অতি বেয়াড়া রকমের—লম্বা, রোগা, মুখে বসন্তের দাগ, দেখলেই মনে হয় যেন গুলিখোর। ম্যানেজারের কথা শেষ হতে না হতেই হীরালাল হাত জোড় ক'রে বললে, "হুজুর, আমি দর্শনপ্রার্থী।"

রাজাবাবু ক্ষণেকমাত্র তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কচ্ছি, এখন তোমার কথা শুনতে পারব না।"

"আজ্ঞে, আমার একটা বিশেষ নিবেদন—"

রাজাবাবু বাধা দিয়ে বেশ একটু ঝঙ্কারের সঙ্গে বললেন, "কেন বিরক্ত করছ ? এখন আমার সময় নেই, আর এক সময় আসবে।"

হীরালাল নাছোড়বান্দা; বললে "হুজুর, আমি কোহেন সাহেবের কাছ থেকে আসছি হুজুরের নাম শুনে।"

"ওঃ, কোহেন সাহেব তোমাকে পাঠিয়েছে? তুমি কি আমাকে আর কথনও দেখেছ?"

"হুজুর, রেসকোর্সে দেখেছি। কোহেন সাহেব হুজুরের কথা আমায় সব বলেছেন। আর তাঁর বিশ্বাস, হুজুর ছাড়া আর কারুর দ্বারা আমার এ কাজটি উদ্ধার হবে না। হুজুরের কত টাকা কত দিকে যাচ্ছে, এই গরিবের ওপর একটু দয়া করতেই হবে।"

"না না, ওসব দয়া-টয়া এথানে কিছু হবে না।"

"হুজুর, আমার আর কোন উপায় নেই। কোহেন সাহেব ব'লে দিয়েছেন তিনি গরিবের মা বাপ। তাঁর কাছে গিয়ে পড, কাজ হবে।"

"কি কাজ তোমার?"

"হুজুর, আমি পটলডাঙার মল্লিকদের কারবারে দালালি করি। সম্প্রতি তাঁদের কিছু টাকার খুব জরুরী দরকার হয়েছে। একখানা বাড়ি আর কিছু জমি গোপনে বন্ধক রেখে এই টাকাটার যোগাড করতে হবে আমার ওপর হুকুম হয়েছে।"

"কত টাকা?"

"আজ্ঞে, দেড লাখ। যেমন করেই হোক, আগামী শনিবারের মধ্যে টাকাটা যোগাড করা চাই-ই, তা না হ'লে আমার চাকরি থাকবে না।"

"কোথাও চেষ্টা করেছিলে?'

"হুজুর, অনেক জায়গায় চেষ্টা করলুম, কিন্তু কোথাও সুবিধে করতে পারলুম না। এথন হুজুরের দয়া।" এই ব'লে হীরালাল কাতর দৃষ্টিতে রাজাবাবুর পানে তাকিয়ে হাত জোড ক'রে রইল।

কথাটা শুনে রাজাবাবুর যেন একটু দয়া হ'ল। ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখ, আমার তো এখন সময় নেই; ওর কাগজ-পত্রগুলো কাল তুমি একবার দেখো।"...তুমি কাল এস হে একবার।"

"যে আজ্ঞে, হুজুর।" ব'লেই হীরালাল উঠল ও রাজাবাবুকে অতি ভক্তিভাবে নমস্কার ক'রে দরজার কাছ পর্যন্ত এসেই একটু থমকে দাঁড়াল। তারপর আবার ফিরে মাথা চুলকোতে চুলকোতে এগিয়ে এসে বললে, "হুজুর, আমার আর একটা নিবেদন আছে।"

"আবার তোমার কি নিবেদন?"

"হুজুর, আমার একটা খেলা আছে, হুজুরকে একবার দেখাতে চাই।"

"না না, আমার এখন খেলা-টেলা দেখবার সময় নেই বাপু। তুমি যাও এখন। আমার আর সময় নষ্ট ক'রো না।"

"হুজুর, আমি শুধু একবার খেলাটা দেখাব। পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না।"

"আচ্ছা, তবে দেখাও; চটপট।"

হীরালাল পকেট থেকে কাপড়ে বাঁধা ছোট একটা প্যাকেট বার করলে। তার ভেতর মতির মত সাদা সাদা খুব চকচকে কতকগুলো ঘুঁটি। গুনে দেখিয়ে দিলে চল্লিশটা। তারপর খেলাটা বুঝিয়ে দিলে। বোঝাবার সময় রাজাবাবু বেশ একটু আগ্রহের ভাব দেখিয়ে বললেন, "বাঃ, বেশ তো এক রকম নতুন খেলা। এর নাম কি হে?"

"হুজুর, একে 'বীড রেস' খেলা বলে। যদি অনুমতি হয়, তা হ'লে আমি হুজুরের সঙ্গে দু-এক দান খেলে দেখিয়ে দি।"

"আমার সঙ্গে খেলবে?"

"হুজুর যদি অভয় দেন। তবে আমি গরিব মানুষ, বেশি টাকা ধরতে পারব না।"

"আচ্ছা, এস, একটু খেলাই যাক। খেলাটা নতুন বটে।"

তারপর খেলা শুরু হ'ল। ডাক্তার অবাক হয়ে দেখতে লাগল। প্রথম দুই বাজি রাজাবাবু জিতলেন ও হীরালাল দু শো টাকা হারল। রাজাবাবুর তখন খুব ফুর্তি। খেলা বেশ জ'মে এসেছে,—একবারে চার শো টাকা ধরলেন, আর হেরে গেলেন। পরের দানে রাজাবাবু ছ শো টাকা ধরলেন ও সেবারেও হারলেন। তখন ম্যানেজার কিছু এগিয়ে এসে বললে, "হুজুর, একটু থামুন। ইনি যে খেলছেন, এঁর কাছে কত টাকা আছে দেখা যাক, ও শেষ পর্যন্ত টাকা দিতে পারবেন কি না সেটা না জেনে আর খেলাটা কি ভাল হবে?"

তখন রাজাবাবু হীরালালকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, কত টাকা আছে?"

"হুজুর, হাজার টাকা।"

"না না, ওতে হবে না। আমার সঙ্গে যদি খেলতে চাও, তা হ'লে দশ হাজার টাকা নিয়ে বসতে হবে।"

তখন দুজনের মধ্যেই বেশ একটু ঝোঁক চ'ড়ে গেছে। হীরালাল বললে, "হুজুর, আমার কাছে তো এখন বেশি টাকা নেই; আমি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনতে পারি; কিন্তু সে তো আর আজ হয় না। হুজুর যদি আজ আর না খেলেন, তা হ'লে আমার এই আট শো টাকাটা হুকুম ক'রে দিন, আমি আজ যাই।"

রাজাবাবু ম্যানেজারকে বললেন, "আচ্ছা, ওর টাকাটা দিয়ে দাও।" ম্যানেজার বিনীতভাবে কিছু আপত্তি করতে গেল; কিন্তু তাকে এক

ধমক দিয়ে বললেন, "না না, ও জিতেছে, ওর টাকা দিয়ে দাও। আচ্ছা, না হয় আমি দিচ্ছি, আমার কাছে টাকা আছে।"

এই ব'লে ভেতরে চ'লে গেলেন।

সেই সময় ম্যানেজার হীরালালকে বললে, "আপনার তো মশাই খুব বরাত জোর, আধ ঘণ্টার মধ্যে আট শো টাকা কামিয়ে নিলেন! এর আমায় কি দিচ্ছেন বলুন? আমাদের একটা পুওর ফাণ্ড আছে,—এই রকম বাজে আদায়ের টাকা আমরা তাতে জমা রাখি।"

"আপনাকে এই সামান্য টাকার আর কি দোব! পরে যদি আবার খেলা হয় আর আমি জিতি, তা হ'লে আপনাকে সন্তুষ্ট করব।"

কথাটা শেষ পর্যন্ত মীমাংসা হতে না হতেই রাজাবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকলেন ও হীরালালের সামনে একতাড়া নোট ফেলে দিয়ে বললেন. "নাও, তোমার টাকা দেখে নাও।" তারপর ডাক্তারের দিকে চেয়ে বললেন, "আপনার সঙ্গে আজ কথাবার্তা শেষ হ'ল না; আমি একটু বাড়ির ভেতর চললুম।"—এই ব'লে তিনি উঠলেন।

ম্যানেজার ও হীরালালের মধ্যে আবার লাভের ভাগ নিয়ে কথাবার্তা শুরু হ'ল। ম্যানেজার অন্তত সিকি ভাগ চায়; কিন্তু হীরালাল তাতে কিছুতেই রাজি হয় না। ক্রমশ ম্যানেজার একটু গরম হয়ে উঠল ও তাকে কতকগুলো গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। ব'লে দিলে যে, আর কখনও তাকে এ বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। যাবার সময় হীরালাল ঘুঁটিগুলো সেই ঘরের মধ্যে ফেলে গেল।

ডাক্তার দেখে-শুনে অবাক! এ রকম ব্যাপার সে জীবনে কখনও দেখে নি। তার যেন এ সব স্বপ্নের মত মনে হতে লাগল। ম্যানেজার একটু হাসিমুখে বললে, "ডাক্তারবাবু, আপনি বোধ হয় আমার ব্যবহার দেখে খুব আশ্চর্য হচ্ছেন। এটা আমার একটা

চালাকি। ও লোকটাকে আমাব ভাল ব'লে মনে হচ্ছে না। বাজাবাবুব যে মেজাজ আব আজকাল তাঁব যে বকম লোকসানের দশা চলছে, তাতে ও লোকটাকে প্রশ্রয় দিলে অনেক টাকা ঠকিযে নিয়ে যাবে। তাই তাকে প্রথম থেকেই দূব করতে চাই।"

"ঠিক কথাই তো। এটা আপনি না দেখলে আব কে দেখবে?"

"কিন্তু মশাই, যাই বলুন, খেলাটা বড ইণ্টাবেস্টিং। আপনি খেলাটা ঠিক ক'বে বুঝতে পেরেছেন?"

"না, আমি খেলাটা ঠিক ফলো কবতে পাবি নি।"

"আসুন, আপনাকে দেখিযে দি।" এই ব'লে ম্যানেজাব ঘুঁটি-গুলোকে নিয়ে ডাক্তাবকে বেশ ক'বে খেলাটা বুঝিয়ে দিলে ও বললে, "দেখতে পাচ্ছেন তো একটু সাবধানে খেললে এতে যে ঘুঁটি ধ'বে খেলবে তাব হাববাব কোনই সম্ভাবনা নেই।"

তাবপব একটু চুপ ক'বে থেকে বললে, "দেখুন ডাক্তাববাবু, সত্যি কথা আপনাকে বলতে কি, বাজাবাবুব এখন ভাংতি দশা চলছে; আমি আব কতদিক সামলাব? একটা লোককে তাডাই তো সাতটা এসে জোটে। যে বকম খেলাব ঝোঁক, কত টাকাই না এই বকম খেলাতে হেরেছেন।"

"তাই নাকি?"

"বলেন কেন? বাণীমা মাবা যাওযাব পব থেকে ঘাডে ভূত চেপেছে, আব কেবল টাকা উডুচ্ছেন। সময সময ভাবি, ওঁব টাকা তো থাকবেই না, তাতে যদি কিঞ্চিৎ আমাদেব মত গবিবেব পকেটে আসে। তবে নিজে তো আব কিছু কবতে পাবি না।"

"তা তো বটেই।"

"আচ্ছা ডাক্তাববাবু, আপনি বাজাবাবুব সঙ্গে খেলাটা একবাব

খেলে দেখুন। চাকরি চাকরি ক'রে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছেন, যদি এমনই কিছু লাভ করতে পারেন।”

“রক্ষা করুন মশাই, আমি জীবনে কখনও ও-রকম খেলা খেলি নি। গরিব মানুষ, রাজা-রাজড়ার সঙ্গে খেলা কি আমাদের সাধ্য?”

“আপনার কিছু ভয় নেই। আমি ভেতরে ভেতরে আপনার পার্টনার থাকব। তবে সেটা যেন কোন রকমে প্রকাশ না পায়! আচ্ছা, আপনার কাছে এখন কত টাকা আছে?”

“হাজার টাকা।”

“বেশ, আমিও হাজার টাকা দিচ্ছি; দেখাই যাক না, যদি আমাদের অদৃষ্টে কিছু মোটা রকম ফ'লে যায়।”

ডাক্তারের বুক দুরদুর করতে লাগল। অনেক কষ্টে এই টাকাটি যোগাড় ক'রে এনেছিল, এখন যদি বেঘোরে মারা যায়! অথচ একটু একটু লোভও হচ্ছে।

ম্যানেজার তাকে আর বেশি ভাবতে সময় না দিয়ে বললে, “আপনি কিছু ভাববেন না। ঠিক আমাদের জিত হবে। আমি রাজাবাবুকে ডেকে নিয়ে আসি। খেলাটা মাঝখানে ভেঙে যাওয়াতে তাঁর মনটা নিশ্চয়ই খুঁতখুঁত করছে, এখন বলবামাত্রই এসে খেলা জুড়ে দেবেন। আর দেখুন ডাক্তারবাবু, রাজাবাবু এলে আপনাকে একটা কথা বলতে হবে।”

“কি কথা?”

“বলবেন যে, আপনি হীরালালকে চেনেন। ওটা জোড়াসাঁকোর একটা গুণ্ডা, ওকে আর এখানে আসতে দেওয়া ঠিক নয়।”

ডাক্তার যেন হতভম্ব হয়ে গেল; কোন বিষয়েই কিছু প্রতিবাদ করতে পারলে না।

ম্যানেজার ভিতরে গিয়ে রাজাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এল। আসবামাত্রই ডাক্তার যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই হীরালাল সম্বন্ধে ম্যানেজারের উপদেশমত সমস্ত এক নিশ্বাসে ব'লে ফেললে।

রাজাবাবু বললেন, "তাই নাকি ? ও লোকটাকে তো তা হ'লে আর আসতে দেওয়া হবে না।"

ম্যানেজার বললে, "হুজুর, ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে জেনেই আমি তাকে সব জানিয়ে দিয়েছি, আর দরোয়ানদের ব'লে দিয়েছি, তাকে যেন ঢুকতে না দেয়।" তারপর কিছু নীচু স্বরে বললে, "হুজুর, ডাক্তারবাবু আপনার সঙ্গে খেলতে একটু ভয় করছেন। আপনি যদি অভয় দেন—"

রাজাবাবু তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এসে ডাক্তারের পিঠ চাপড়ে ঈষৎ হেসে বললে, "কিছু ভয় নেই ডাক্তারবাবু। খেলা আমোদের জিনিস, এ তো আর আপনার অপারেশন নয়।"

আবার ডাক্তারের বুক কেঁপে উঠল, কিন্তু সে অবস্থায় কোনরূপ প্রতিবাদ করা অসম্ভব। ভাবগতিক দেখে ম্যানেজার পিছন থেকে তার হাতটায় একটু টিপুনি দিয়ে বললে, "হুজুর! ডাক্তারবাবুর কাছে তো বেশি টাকা নেই; যদি হুজুরের অনুমতি হয় তা হ'লে উনি কাল টাকাকড়ির কিছু যোগাড় ক'রে নিয়ে এসে হুজুরের সঙ্গে খেলবেন।"

"না না, যোগাড়-টোগাড় কিছু করতে হবে না। যদি বেশি টাকা না থাকে, তা হ'লে তুমি কিছু ধার দাও। আর, আমি কি টাকার জন্যেই খেলছি তোমরা মনে কর ? খেলাটা বেশ ভাল লাগল; তাই একটু এন্‌জয় করতে ইচ্ছে হচ্ছে। আসুন ডাক্তারবাবু, আরম্ভ করা যাক।"

খেলা আরম্ভ হবার আগে ম্যানেজার বললে, "হুজুর, এ খেলাটা বড় সাদাসিধে ব'লে মনে হচ্ছে না। কি জানি যদি পরে কিছু ওজর-আপত্তি

হয়। কাজেই, উনি যে নিজের ইচ্ছামত খেলছেন তার একটা লেখাপড়া থাকা দরকার।” এই ব’লে ম্যানেজার কাগজ কলম নিয়ে এল ও ডাক্তার কলের পুতুলের মত তাতে ম্যানেজারের কথা অনুসারে দু-তিন লাইন লিখে সই ক’রে দিলে।

রাজাবাবু হেসেই অস্থির। বললেন, “আরে, তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি, আর সাতঝুড়ি ভয়। আসুন ডাক্তারবাবু, খেলা যাক—আর সময় নষ্ট ক’রে কি হবে?”

তারপর খেলা আরম্ভ হ’ল। ম্যানেজার গুপ্তভাবে ডাক্তারের পার্টনার—কাজেই সে তার খুব কাছ ঘেঁষেই বসল। প্রথম বাজিতে ডাক্তার চার শো টাকা জিতল। তখন ডাক্তারের মুখে আনন্দের জ্যোতি ফুটে উঠল, আর খেলাতেও একটু ঝোঁক চ’ড়ে গেল। দ্বিতীয় বাজিতেও ডাক্তার জিতল।

এই রকম চার-পাঁচ বাজি খেলা হবার পর হিসাব ক’রে দেখা গেল যে, ডাক্তার মোটের উপর ছ শো টাকা জিতেছে। তখন রাজাবাবু বললেন, “ওহে, আজ আর থাক্; আমাকে যে বউবাজার যেতে হবে, সেটা মনে আছে?”

ম্যানেজার “ওঃ, তাই তো” ব’লে যেন বড় অপ্রস্তুতে পড়ল ও তখনই বাইরে গিয়ে “রামদিন, চোবে, গাড়ি লানে ব’লো” ব’লে চীৎকার জুড়ে দিল।

ডাক্তার আর কি করে? আস্তে আস্তে উঠে “হুজুর, আমি তবে এখন যাই” ব’লে যাবার উপক্রম করতেই রাজাবাবু বললেন, “দাঁড়ান, আপনার টাকাটা এনে দিচ্ছি। ডেট অব অনার, আমি একদণ্ডও বাকি রাখি না।” এই ব’লে উঠে গিয়ে তখনই ছ শো টাকার নোট নিয়ে এসে ডাক্তারের হাতে দিলেন।

ডাক্তার হৃষ্টচিত্তে নোটগুলি নিয়ে খুব লম্বা এক নমস্কার ক'রে ঘরের বাইরে এল। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হতেই ম্যানেজার বললে, "ডাক্তারবাবু, চললেন নাকি?...আরে, ব্যাটারা সব মরেছে দেখছি! কারুর সাড়া শব্দ নেই!" এই ব'লে ডাক্তারের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে, "দেখলেন ডাক্তারবাবু, ভাগ্যিস আপনাকে টেনে-টুনে নিয়ে বসলুম, তাই কিঞ্চিৎ লাভ ক'রে চললেন।"

"আপনিও কোন্ না করলেন? আসুন।" এই ব'লে ডাক্তার তিন শো টাকার নোট ম্যানেজারের হাতে গুঁজে দিল।

"থ্যাঙ্ক ইউ, কিন্তু খেলাটার একটা মজা দেখলেন তো? একটু হুঁশিয়ার হয়ে খেললে যে বাঁড চালে, তার হারবার কোনই সম্ভাবনা নেই। যাক, আজ অল্পের উপর দিয়েই সন্তুষ্ট হওয়া যাক। কাল ঠিক এই সময়েই আসবেন আর টাকাকড়ি যতদুর যা যোগাড় করতে পারেন নিয়ে আসবেন।"

ডাক্তার হাঁ কি না বিশেষ কিছু বলতে পারল না, কারণ এই সব ব্যাপারের পর তার মাথাটা যেন কিছু গুলিয়ে যাচ্ছিল। কেবলমাত্র "আচ্ছা, আজ তবে আসি" ব'লে নমস্কার ক'রে আস্তে আস্তে গাড়িতে চ'ড়ে রওনা হ'ল।

গাড়ি যেমন ব্যড়ির সীমানা ছেড়ে রাস্তায় এসে উঠল, অমনই রাস্তার পাশ থেকে একটি ফুটফুটে সুন্দর সুবেশধারী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে ড্রাইভারকে ইশারা ক'রে গাড়ি থামাতে বললে। গাড়ি থামতেই ডাক্তারের কাছে এগিয়ে এসে সে বললে, "মশাই, আপনি কি রাজাবাবুর কাছ থেকে আসছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এখন গেলে কি তাঁর দেখা পাব?"

"বোধ হয় পাবেন না, কারণ তিনি এখনই বেরিয়ে যাবেন।"

"আপনি কোথায় থাকেন ?"

"কালীঘাটে। এই আমার ঠিকানা।" ব'লে ডাক্তার পকেট-বুক বার ক'রে তাতে পেন্সিলে নাম ও ঠিকানা লিখে ভদ্রলোককে দিল।

"আচ্ছা মশাই, নমস্কার।" ব'লে ভদ্রলোক চ'লে গেল। ডাক্তারও প্রফুল্ল মনে অপ্রত্যাশিত অর্থলাভের আনন্দে ভরপুর হয়ে নিজের বাড়ির দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

ভদ্রলোক কিন্তু সেইখানেই ঘুরতে লাগল। রাজাবাবু বাড়ি থেকে বেরুলেন না। কিন্তু গোঁসাইজী বেরিয়ে এলেন ও ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'তেই বললেন, "এই যে নিখিলবাবু! আপনি এসেছেন ? রাজাবাবুকে আপনার কথা সমস্তই বলেছি।"

"তাঁর সঙ্গে কি আজ দেখা হবে না ?"

"হওয়া শক্ত, তবে একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পাবেন। আসুন আমার সঙ্গে।" ব'লে তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িব দিকে গেলেন। যেতে যেতে নিখিলবাবু বললে, "আপনাকে তো বলেছি, আমার আর বেশি সময় নেই ; এই মাসের মধ্যেই যেখান থেকেই হোক মালটার যোগাড করতে হবে।"

"তা হয়ে যাবে এখন।"

বাড়ির ভেতর ঢুকে ম্যানেজারের সঙ্গে প্রথমেই দেখা। তাকে অল্প কথায় নিখিলবাবুর পরিচয় ও তিনি রাজাবাবুর সঙ্গে দেখা কবতে চান, এইটা জানিয়ে দিয়ে গোঁসাইজী "আমার সন্ধ্যা-বন্দনার সময় হয়ে এল" ব'লে চ'লে গেলেন।

ম্যানেজার নিখিলবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে বুঝল যে, তার কিছু

বেশি পরিমাণে তেঁতুলের দরকার—মাইসোর স্টেটে চালান দিতে হবে।

"এত তেঁতুল নিয়ে কি হবে মশাই ?"

"মাইসোরে খুব বেশি তেঁতুলের খরচ। কেবল মহারাজার বাড়িতেই মাসে এক শো মণ লাগে; তা ছাড়া প্রত্যেক বড়লোকের বাড়িতেই তেঁতুলের খরচ খুব বেশি। আমি শুনেছি, রাজাবাবুর এস্টেটে খুব তেঁতুল হয়। যদি আপনি দয়া ক'রে তাঁকে ব'লে-ক'য়ে একটা কণ্ট্রাক্ট করিয়ে দিতে পাবেন, তা হ'লে বড়ই উপকার হয়।"

তারপর উভয়ের মধ্যে রাজাবাবুর জমিদারি, ব্যবসা, কণ্ট্রাক্ট, টাকাকড়ি ইত্যাদি অনেক বিষয়ে কথাবার্তা হ'ল। ম্যানেজার বললে, "আজ আর রাজাবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়া অসম্ভব, কারণ সন্ধ্যার পর তাঁর কাছে কাউকে নিয়ে যাবার হুকুম নেই। আপনি কাল বেলা এগারোটার সময় আসবেন; আমি ইতিমধ্যে তাঁকে ব'লে-ক'য়ে সব ঠিক ক'রে রেখে দোব।" তারপর একটু নীচু স্বরে বললে, "আর কিছু টাকাও সঙ্গে আনবেন, কারণ যখন আপনার এত তাড়াতাড়ি, তখন অন্তত ছোট রকমের ইনস্টলমেণ্ট অ্যাডভান্স ক'রে কণ্ট্রাক্ট যত শীঘ্র সম্ভব পাকাপাকি ক'রে নেওয়া দরকার। বেশি না পারেন, অন্তত দু হাজার টাকা আনবেন।"

"দেখব, যতদূর যোগাড় করতে পারি।" এই ব'লে নিখিলবাবু নীচে এল। তার সঙ্গে রামা চাকরও নীচে এল। সে ম্যানেজারের সঙ্গে নিখিলবাবুর কথাবার্তা কতক কতক শুনেছিল, তাই জিজ্ঞাসা করলে, "বাবু, এত তেঁতুল নিয়ে কি করবেন ?"

"আমার তেঁতুলের কারবার আছে হে। একটা বড় রকমের চালানের দরকার হয়ে পড়েছে। কিছুতেই মালটার যোগাড় করতে

পারছি না, তাই তোমাব বাবুর জমিদারি থেকে যোগাড় করবার চেষ্টা করছি।” মনে মনে বললে, তেঁতুল নিয়ে আব কি করব, তোমার বাবুব কপালে গুলব।

ডাক্তারের আজ বড় আনন্দ। বাড়ি গিয়েই গিন্নীর কাছে আদ্যন্ত সমস্ত বর্ণনা ও উপসংহারে তিন শো টাকা লাভের ঘোষণা। গিন্নীর চিরগম্ভীর মুখে যেন মুহূর্তে কৈশোরেব তড়িৎপ্রবাহ খেলে গেল। হাসতে হাসতে বললে, “বল কি! চাকবির সন্ধান করতে না করতেই এই রোজগার! তুমি তো আমাব কথায় আমলই দিতে না! ব্যবসাই বল আর প্র্যাকটিসই বল, চাকবি হ’ল মানুষের লক্ষ্মী। দেখ না, আমাব বাপের বাড়িব সকলে চাক্‌বে (অর্থাৎ তাঁর এক ভাই হাটখোলাব দত্তদেব বাড়ির সবকার আব এক ভাই ছাপাখানাব কম্পোজিটর), তাই মা লক্ষ্মী যেন উথলে উঠছেন।” আজ আব ডাক্তারেব প্রতিবাদ কববাব প্রবৃত্তি নেই, কাজেই গিন্নী যা বলেন তাই অমৃত। তাবপর দুজনে পবামর্শ হ’ল, যেমন ক’বেই হোক, কিছু বেশি টাকাব যোগাড় করতে হবে, শেষ পর্যন্ত না হয় কিছু গহনা বন্ধক দেওয়া যাবে। অন্তত হাজাব তিনেক টাকা হাতে ক’রে নিয়ে গিয়ে আবাব রাজাবাবুর সঙ্গে খেলতে হবে—এই স্থির হ’ল।

পবদিন বেলা এগাবোটাব সময় নিখিলবাবু রাজাবাবুব বাড়িতে উপস্থিত। ম্যানেজাব তাকে ড্রইং-রুমে বসিয়ে পান সিগাবেট ইত্যাদি দিয়ে যথাবীতি অভ্যর্থনা ক’বে, বেশ নিবিষ্ট মনে কন্ট্রাক্টেব একটা খসড়া করতে শুরু ক’বে দিলে, আর বেয়ারাকে ডেকে বললে, “রাজাবাবুকে খবর দাও, নিখিলবাবু এসেছেন।”

অল্পক্ষণ পরেই রাজাবাবু ঘরে ঢুকলেন ও যথাবিহিত সম্ভাষণাদির পর ম্যানেজার নিখিলবাবুর প্রার্থনা ও কণ্ট্রাক্টের খসড়া ইত্যাদি রাজাবাবুর কাছে পেশ করলে।

"আমি আর ওসব কি দেখব? তুমি তো সব দেখেছ?"

"আজ্ঞে, আমি দেখেছি, তা হ'লেও হুজুর একবার—"

"আরে না না, আমাকে আর দেখতে হবে না; কই, কোথায় কি সই করতে হবে বল, ক'রে দিচ্ছি।"

এই সময় নিখিলবাবু হাত জোড় ক'রে বললে, "হুজুর, অ্যাডভান্সের টাকাটা এখনও সমস্ত যোগাড় করতে পারি নি। আর একদিন সময় না দিলে আমার আর উপায় নেই। এখন হুজুরের দয়া!"

রাজাবাবুর প্রশান্ত বদন তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল। ম্যানেজারকে এক ধমক দিয়ে বললেন, "এ কি তোমাদের কাণ্ড! আগে সমস্ত ঠিক-ঠাক না ক'রে কেন আমায় বিরক্ত করছ?"

ম্যানেজার যেন লজ্জায় জড়সড় হয়ে গেল। বললে, "হুজুর, আমি তো নিখিলবাবুকে টাকা আনতে বলেছিলুম। উনি যে আনতে পারেন নি, সেটা তো আমায় এতক্ষণ জানান নি।"

নিখিলবাবু বললে, "হুজুর, ম্যানেজারবাবুর কোন দোষ নেই, সমস্ত অপরাধ আমারই। আমাকে দয়া ক'রে আর একটি দিন সময় দিন। কাল ঠিক এই সময় আমি সব টাকার যোগাড় ক'রে নিয়ে হুজুরের সামনে হাজির হব।"

"আচ্ছা, তাই হবে; কিন্তু আবার যেন কথার নড়চড় না হয়। আমি এক কথার মানুষ, সেটা জেনে রাখবেন।" এই ব'লে রাজাবাবু খুব বিরক্ত ভাবেই ভেতরে চ'লে গেলেন।

নিখিলবাবুও আস্তে আস্তে বিদায় হ'ল।

নিখিলবাবু নীচে নেমে যাওয়া মাত্রই রাজাবাবু ঘরের মধ্যে আবার ঢুকে ম্যানেজারের খুব কাছে এসে বললে, "রমেশ, ও-লোকটার ভাবগতিক কি রকম কি বুঝলে বল দেখি?"

"আমি তো কিছু খারাপ দেখছি না।"

"আমার তো বড ভাল ব'লে বোধ হচ্ছে না। ব্যাটার যেন ছুঁকছুঁকে চাউনি। গোঁসাইজীকে ধাপ্পা দিলে নাকি?"

"আরে না না, ওসব কিছু না। তোমার যেন সবতাতেই ধুকধুকুনি! গোঁসাইজীর চোখে ধুলো দিতে পারে এমন লোক এখনও জন্মায় নি।"

"না হে, একটু দেখে-শুনে চলা দরকার।"

"কিছু না, কিছু না। চল, একটু গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া যাক। ব্যাটার সঙ্গে ব'কে ব'কে নাড়ী পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে।" এই ব'লে হাসতে হাসতে দুজনে অন্য ঘরে চ'লে গেল।

বিকালবেলায় ডাক্তার এসে হাজির। বেশভূষার আরও পারিপাট্য, সহাস্য বদন, মুখে চোখে আনন্দের ঝলক। ম্যানেজার খুব অন্তরঙ্গভাবে অভ্যর্থনা ক'রে চা ও জলখাবারের ফরমাশ করলে, ও আহারাদি শেষ হওয়ামাত্রই রাজাবাবু দর্শন দিলেন। আজ আর বেশি ভূমিকার দরকার হ'ল না,—দু-চার কথা হবার পরেই খেলা আরম্ভ হয়ে গেল।

ম্যানেজার ডাক্তারের খুব কাছে বসল, কারণ আজও সে তার গুপ্তভাবে পার্টনার। প্রথমেই ডাক্তারের দু শো টাকা জিত; পরের বাজিতেও চার শো টাকা জিত। তখন আর ডাক্তারকে পায় কে! আহ্লাদে ফেটে যাবার যোগাড়!

ম্যানেজার তার হাতে একটু টিপুনি দিয়ে সেই সঙ্গে একটু

চোখের ইশারা করলে, আর পরের বাজিতেই ডাক্তার একবারে দু হাজার টাকা ধ'রে বসল।

ব্যাড-লাক! ডাক্তার হেরে গেল। কোথায় গেল সে হাসি, আর কোথায় গেল সে আনন্দ! একেবারে মুখ চুন! ভাবলে, এ কি হ'ল। হার কেমন ক'রে হতে পারে? এ তো সম্ভব নয়। কিন্তু ম্যানেজার যে খেলার সময় ডাক্তারের আরও কাছ ঘেঁষে বসেছিল ও ঘুঁটি সাজাবার সময় সে তার বাঁ হাতটা একটু অনাবশ্যক-ভাবে নাড়াচাড়া করছিল, সেটা আর ডাক্তার খেয়াল করতে পারে নি।

ডাক্তার যেন একেবারে দ'মে গেল। সেই সময় রাজাবাবু খুব একমুখ হেসে "ওহে! তোমরা কি মনে কর আমি জিততে জানি না? আচ্ছা, আমি আসছি" ব'লে উঠে অন্য ঘরে গেল।

ম্যানেজার ডাক্তারকে সাহস দিয়ে বললে, "ভাবছেন কি ডাক্তারবাবু! খেলতে গেলে হারজিত আছে; ও-রকম মুষড়ে গেলে চলবে কেন?"

"আর মশাই!"

"আরে না না, আপনি কিছু ভাববেন না; এই দানে একবারে তিন হাজার টাকা ধরুন, আর সুদশুদ্ধু আদায় ক'রে নিন।"

ডাক্তারের তখন যেন মাথার ঠিক নেই, একবার ভাবলে, আর খেলব না,—আবার ভাবলে যে না খেললে টাকাটা উদ্ধারের আর কোনই উপায় নেই। তার মাথা যেন গুলিয়ে যেতে লাগল, কিন্তু ভাববার আর বেশি সময় পেলে না; কারণ রাজাবাবু তখনই এসে পড়লেন ও আবার খেলা আরম্ভ হ'ল।

সে বাজি ডাক্তার দু শো টাকা ধরলে ও জিতলে। তখন ম্যানেজার

পাশ থেকে তার হাতে বেশ ক'রে আর একটা টিপুনি দিল। আর ডাক্তার সেই ঝোঁকে ও-টাকাটা উদ্ধারের লোভে পরের দানে আবার দু হাজার টাকা ধ'রে বসল। যেমন ধরা, তেমনি হারা।

তখন ডাক্তারের মুখ একেবারে সাদা; বুক টিপটিপ করছে, দরদর ক'রে ঘাম পড়ছে, তার মনে হচ্ছে যেন দুনিয়াটা সব ঘুরছে। রাজাবাবুর তখন খুব ঝোঁক চ'ড়ে গেছে; বললেন, "কি ভাবছেন, ডাক্তারবাবু? খেলুন।"

"হুজুর, আর না।"

"না কি? এর মধ্যেই খেলা শেষ করবেন? এতগুলো টাকা হারলেন, অন্তত সেটা তোলবার একবার চেষ্টা করবেন না?"

"রক্ষা করুন হুজুর। আর আমার মাথার ঠিক নেই, আমায় নিষ্কৃতি দিন।"

"বিলক্ষণ! সে কি হয়? এই তো খেলা জ'মে এসেছে, এখনই কি ছাড়া যায়?"

ডাক্তার আর কিছুতেই রাজি হ'ল না। তখন কে যেন তার চোখের পর্দা টেনে সরিয়ে দিলে। তার মনে হতে লাগল, এসব যেন সমস্তই বুজরুকি,—ভেল্কিবাজি। যেন এই সব বাড়ি ঘর দোর, সাজ-সরঞ্জাম, জমিদারি, ব্যবসা, হাসপাতাল, চাকরি দেওয়া—সমস্তই ভুয়ো! তার প্রাণটা ধড়ফড় করতে লাগল। মনে হ'ল যেন সে ছুটে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। ম্যানেজার বললে, "তবে আর কি ডাক্তারবাবু, যখন আর খেলবেনই না, তখন হিসাবটা ক'রে ফেলুন। যে টাকাটা পাওনা হচ্ছে সেটা দিয়ে দিন। কত আছে আপনার কাছে?"

ঠিক সেই সময় দু-তিনজন দরোয়ান খানসামা এসে বারান্দায়

দাঁড়াল। ডাক্তারের মনে হতে লাগল তারা যমদূত, তাকে সশরীরে যমালয়ে নিয়ে যেতে এসেছে। ম্যানেজার আর ডাক্তারের কোন উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে তার পকেট থেকে একটা নোটের তাড়া বার ক'রে নিলে ও দেখলে, তাতে আড়াই হাজার টাকা আছে। ডাক্তার নির্বাক, নিশ্চল, নিস্পন্দ। ম্যানেজার বললে, "তা হ'লে বাকি টাকাটার কি হবে?"

ডাক্তারের মুখে কথা নেই। "আচ্ছা,—এ টাকাটার তরে একটা হ্যাণ্ডনোট লিখে দিন" এই ব'লে ম্যানেজার নিজের পকেট থেকে কাগজ ও কলম বার ক'রে দিলে। ডাক্তার কলের পুতুলের মত ম্যানেজার যা ব'লে গেল, তাই লিখে সই ক'রে দিলে।

রাজাবাবু একটু মৃদু হেসে "আচ্ছা, আজ তবে আসুন" ব'লে উঠে গেলেন।

ম্যানেজার বললে, "ডাক্তারবাবু, আপনি তো আর খেললেন না,—আমি আর কি করব? যাক, যদি জামিনের টাকাটা যোগাড় করতে পারেন, তা হ'লে দু-একদিনের মধ্যে সেটা নিয়ে আসবেন। তা না হ'লে আমাদের অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।"

ডাক্তারের আর কথা বলবার শক্তি নেই; কেবল এই মাত্র বললে, "মশাই, আমার আর চাকরিতে কাজ নেই, আমায় নিষ্কৃতি দিন। ভগবান এর বিচার করবেন।" এই ব'লে তখনই উঠে টলতে টলতে কোন রকমে নীচে নেমে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

গাড়ি রাস্তায় গিয়ে পড়তেই নিখিলবাবু আগের দিনের মত রাস্তার পাশ থেকে এগিয়ে এসে গাড়ি থামাতে বললে। তারপর গাড়ির কাছে এসে ডাক্তারকে নমস্কার ক'রে বললে, "কি মশাই! রাজাবাবুর কাছ থেকে আসছেন নাকি? এখন গেলে দেখা হবে?"

তারপর ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "এ কি! আপনার মুখ এমন শুকনো কেন? কোন অসুখ বোধ করছেন নাকি?"

ডাক্তারের চোখ ছলছল ক'রে উঠল। কিছু না ব'লে এক রকম জোর ক'রেই নিখিলবাবুর হাত ধ'রে তাকে গাড়িতে তুলে নিলে। গাড়ি আবার চলতে লাগল। তারপর একটু সামলে বললে, "মশাই, আপনি আর ও-বাড়িতে যাবেন না।"

"কেন বলুন দেখি?"

"ওঃ, ভয়ানক জুয়াচোর, আমার সর্বনাশ করেছে।" ব'লেই ডাক্তার কেঁদে ফেললে।

"কি বকম! আপনাকে কোন বিষয়ে ঠকিয়েছে নাকি?"

"আমাব যথাসর্বস্ব গেছে মশাই, আপনাকে আর কি বলব?"

"বলেন কি! ব্যাপারটা কি সব খুলেই বলুন। আমি যে ওদেব সঙ্গে একটা কারবারের ঠিক করছি।"

"ও-পথে যাবেন না মশাই।" ব'লে ডাক্তার প্রথম থেকে যা যা হয়েছিল সব বলতে আরম্ভ করলে। নিখিলবাবু খুব নিবিষ্ট মনে সব শুনতে লাগল। মনে হ'ল, যেন সে ডাক্তারের কথাগুলো সব গিলে ফেলছে। ডাক্তারের কথা শেষ হ'লে বললে, "এখন কি করবেন ঠিক করছেন?"

"কি আর কবব বলুন,—আমার মাথার ঠিক নেই। মনে হচ্ছে, বরাবর গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ি। আমার আব কারুব কাছে মুখ দেখাতে ইচ্ছে কবছে না।"

"কি আর এমন হয়েছে মশাই, যার জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যাবেন? এখন যাতে টাকাটা উদ্ধার হয় তার চেষ্টা করুন।"

"টাকা আর উদ্ধার হয়েছে! সে আর এ জন্মে নয়।"

"কেন ? পুলিসে খবর দিন না ?"

"আর পুলিস-হাঙ্গামায় কাজ নেই মশাই ; শেষটায় কি আমিও জুয়াখেলার চার্জে পড়ব।"

"কেন, আপনি চার্জে পড়বেন কেন ? আপনাকে মিথ্যে কথা বলে ঠকিয়ে খেলতে রাজি করিয়েছে।"

"না মশাই, ব্যাটারা আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে যে, আমি নিজের ইচ্ছায় খেলেছি।"

"তা হোক, তাতে কিছু আসে-যায় না। আইন সম্বন্ধে আমার সামান্য কিছু জানাশুনো আছে। আপনার এতে কোন বিপদ হবে না, সেটা আমি নিশ্চয় বলতে পারি।"

"যাক মশাই, আর ওসব হাঙ্গামে কাজ নেই ; আমার বরাতে যা হবার হয়ে গেল, মনে করব আমি ঐ টাকাটা আর-জন্মে ও-ব্যাটার কাছে ধারতুম, এ-জন্মে শোধ হয়ে গেল।"

নিখিলবাবু কিন্তু নাছোড়বান্দা, ডাক্তারকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করালে যে, নিখিলবাবুর এক বিশেষ বন্ধু পুলিস-ইন্সপেক্টর,—তাঁর কাছে গিয়ে পরামর্শ করা যাক।

পরের দিন সকালবেলা দেখা গেল যে, রাজাবাবুর বাড়ি লাল-পাগড়িতে ভ'রে গেছে, আর নিখিলবাবু অতি ব্যস্তভাবে খানাতল্লাশি পরিদর্শন করছেন।

ছিন্নমস্তা

উলুবেড়িয়া থানার দারোগাবাবু রাত্রি প্রায় বারোটার সময় অফিস-ঘরে ব'সে একটা জটিল মোকদ্দমার ডায়েরি লিখছিলেন। সমস্ত দিন মফস্বলে ঘুরে শরীর অবসন্ন, ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, খাবার জন্য বাড়ি থেকে তিন-চার বার ডাক এসেছে; কিন্তু ডায়েরি আর শেষ হয় না। সব নিস্তব্ধ, কেবল থানার ঘড়িটি টিকটিক ক'রে, আর 'পাহারা'র সেপাইটি বারান্দার থামে অঙ্গ ঢেলে ও ঈষৎ নাক ডাকিয়ে আপনাদের কর্তব্য পালন করছে।

দারোগাবাবু আরও দশ-পনরো মিনিট লিখেই চেয়ারে ঢ'লে পড়ে, একটি লম্বা রকমের হাই তুলে, চক্ষু মুদে ডায়েরিটা রাত্রের মত মুলতুবি রাখবেন কি না ভাবছেন, এমন সময় তাঁর মনে হ'ল, কে যেন ঘরের মধ্যে ঢুকল। চেয়েই দেখেন, সম্মুখে এক বীভৎস মূর্তি! শীর্ণকায়, রুক্ষকেশ, উদভ্রান্তদৃষ্টি, রক্তমাখা গরদের কাপড় ও চাদরে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত এক যুবাপুরুষ,—হাতে রক্তমাখা খাঁড়া। দেখবামাত্র দারোগাবাবু চমকে উঠলেন ও "পাহারা" ব'লে ডাক দিলেন। তৎক্ষণাৎ আপনাকে সামলে নিয়ে বললেন, "আপনি কে? কি হয়েছে?"

আগন্তুক বললে, "আমার স্ত্রী খুন হয়েছে,—এই খাঁড়ার ঘায়ে। দেখছেন তো এতে কত রক্ত লেগে আছে। আমিই তার জন্য দায়ী। এজাহার লিখে নিন।"

দারোগাবাবু আগন্তুকের আপাদমস্তক ভাল ক'রে দেখে বললেন, "ঐ বেঞ্চে বসুন। আমি এই কাগজপত্রগুলো রেখে আপনার এজাহার শুনব। খাঁড়াখানা দেওয়ালের গায়ে ঠেসিয়ে রাখুন।"

আগন্তুক বসল না। বললে, "আমার এজাহারটা লিখবেন তো লিখুন, নয় তো আমি চললুম।"

দারোগাবাবু দেখলেন, লোকটা প্রকৃতিস্থ নয়; যা বলছে তার কি ফল হতে পারে হয়তো নিজেই বুঝতে পারছে না; কিন্তু তার কথামত কাজ করা ভিন্ন উপায় নেই।

"আচ্ছা, যদি না বসেন, তা হ'লে আমি যে কয়টা কথা জিজ্ঞাসা করি দাঁড়িযে দাঁড়িয়েই তার উত্তর দিন।"

"আর কিছু আমার বলবার নেই।"

"আপনার বলবার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার জানবার এখনও অনেক কিছু আছে। আপনার নাম কি? বাড়ি কোথায়? আপনার স্ত্রী কেমন ক'রে খুন হয়েছেন? লাস কোথায় আছে? ইত্যাদি আপনাকে যে সব কথা জিজ্ঞাসা করব, আপনি একে একে তার উত্তর দিন, আমি লিখে নিচ্ছি।" এই ব'লে দারোগাবাবু এজাহারের বই খুলে সেই মত প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন।

আগন্তুক নিরুত্তর। দারোগাবাবু যতই প্রশ্ন করেন, সে ততই ছাদের দিকে তাকায়। ভাবলেন, লোকটা পাগল নাকি? কিন্তু পাগল হ'লে এমন ভদ্রদের কাপড়-চোপড় প'রে এত রক্ত মেখে আসত না। আর জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক ভেবে তিনি তার কথামতই এজাহার লিখে নিলেন ও বললেন, "চলুন, আপনার বাড়িটা একবার দেখে আসি, আমার সঙ্গে আসুন।" এই ব'লে তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। 'পাহারা'কে ব'লে গেলেন, "বাড়িতে খবর দিও, আমাকে এখখুনি বাইরে যেতে হচ্ছে; কখন ফিরতে পারব বলতে পারি না।"

একজন কন্‌স্টেব্‌ল একখানি ঘোড়ার গাড়ি আনল। কোচম্যান জিজ্ঞাসা করলে, "বাবু, কোথা যেতে হবে?" দারোগাবাবু কিছু

বললেন না। কোচম্যান আবার জিজ্ঞাসা করলে। তখন আগন্তুক যেন অন্যমনস্ক ভাবেই "হরিপুর" ব'লেই গাড়িতে উঠে বসল। দারোগাবাবু তার পাশে বসলেন ও কন্‌স্টেব্‌লকে গাড়ির মধ্যেই নিলেন। খাঁড়াখানি সঙ্গে নিয়েছিলেন।

অমাবস্যার রাত্রি, একটু মেঘও হয়েছে, ঘুটঘুটে অন্ধকার। গাড়ির মধ্যে তিনজনই নিস্তব্ধ। কেবল দারোগাবাবু মধ্যে মধ্যে টর্চ জ্বেলে গাড়ির মধ্যে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছেন ; কিন্তু সেই অবসরে আগন্তুকের মুখের ভাবও লক্ষ্য করছেন।

গাড়ি একটি ছোট নদীর ধারে এল। গ্রীষ্মকাল। নদীতে জল নেই। নদী পার হ'লেই প্রায় আধ মাইলের মধ্যেই হরিপুর গ্রাম। নদীতে নামবার আগে কোচম্যান গাড়ি থামাতেই আগন্তুক গাড়ি থেকে নামবার উপক্রম করতেই, কন্‌স্টেব্‌ল তৎক্ষণাৎ তার হাত চেপে ধ'রে জানিয়ে দিলে যে, পালাবার চেষ্টা করা বৃথা। দারোগাবাবু আগন্তুকের মুখে টর্চের আলো ফেলে তার মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে বললেন, "আপনি এখানে নামবেন ?"

আগন্তুক উত্তর দিল, "হুঁ।"

"তবে নামুন।" ব'লে দারোগাবাবু আগে নামলেন ও তাকে নামিয়ে নিলেন। কন্‌স্টেব্‌লও নামল।

কিছু না ব'লেই আগন্তুক নদীর ধার দিয়ে চলতে আরম্ভ করল। দারোগাবাবু কন্‌স্টেব্‌লকে তাদের অনুসরণ করবার ইঙ্গিত ক'রে তার সঙ্গে সঙ্গে চললেন।

একটু গিয়েই জঙ্গল আরম্ভ হ'ল। তার মধ্যে কোনও পথ নেই বললেই হয়, এবং যা একটুখানি আছে তাতে সেই অন্ধকারে টর্চের আলো থাকা সত্ত্বেও চলা দুঃসাধ্য। আগন্তুকের সেদিকে যেন কোনও

বাধাই নেই। গাছের ডাল ভেঙে, ছোট ছোট ঝোপ টপকে সে আগে আগে চলল।

ক্রমশ জঙ্গল একটু গভীর হয়ে এল। দারোগাবাবু কিছু উদ্বিগ্ন হলেন। ভাবলেন, লোকটার কোন বদ মতলব নেই তো? তিনি সম্প্রতি একটা ডাকাতি মোকদ্দমায় একদল ডাকাতের ওপর একটু জোর তদন্ত চালিয়েছিলেন ও বিচারে তাদেব কয়েকজনেব জেল হয়েছিল। ভাবলেন, তাদের দলেব লোক ষড়যন্ত্র ক'রে তাঁকে কোনও বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছে না তো? তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে গুলিভরা পিস্তলটি বার ক'রে হাতে নিলেন। তাঁর আদেশমত কন্‌স্টেব্‌লও বন্দুকে গুলি ভ'রে নিলে।

প্রায় আধ ঘণ্টা এভাবে চ'লে আগন্তুক একটু থামল ও চারিদিকে তাকাতে লাগল। যেন কি খুঁজছে! সেখানে জঙ্গলটা অনেক কম। আরও একটু যেতেই দারোগাবাবু দেখলেন যে. কিছু দূবে একটা খুব ক্ষীণ আলোর রশ্মি দেখা যাচ্ছে। আগন্তুকও সেটা দেখতে পেলে, এবং দেখবামাত্র একরকম ছুটেই সেই দিকে চলল। দাবোগাবাবু ও কন্‌স্টেব্‌লও তার সঙ্গে ছুটল। কন্‌স্টেব্‌লটি হিন্দুস্থানী। দারোগাবাবুকে বললে, "বাবু, ও ভূত নয়তো?'

সামনেই এক ভাঙা মন্দির। তার ভেতর থেকেই অল্প আলো বেরুচ্ছে। আগন্তুক ছুটে গিয়ে মন্দিরের ভেতর ঢুকল ও "মা" ব'লে চীৎকার ক'রে উঠল। দারোগাবাবু মন্দিরে ঢুকে যা দেখলেন. তাতে তাঁর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। পুলিসের চাকরিতে অনেক বীভৎস দৃশ্য দেখেছেন, কিন্তু এ দৃশ্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। মন্দিরে কালীমূর্তি,—জীর্ণ মন্দিরের কালিমায় ও স্তিমিতপ্রায় প্রদীপের আলোকে মূর্তি যেন আরও

ভীষণ, এবং তার সম্মুখে সদ্যোরক্তের উপর লুণ্ঠিত মুণ্ডহীন এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ।

আগন্তুক পুনরায় এক মর্মভেদী চীৎকার ক'রে মৃতদেহের দিকে অগ্রসর হতেই দারোগাবাবু তাকে ধ'রে ফেললেন ও জিজ্ঞাসা করলেন, "এ স্ত্রীলোক কে? আপনার স্ত্রী?"

আগন্তুক উচ্চৈঃস্বরে বললে, "হ্যাঁ।"

দারোগাবাবু বললেন, "দেখুন, এ দেবতার মন্দির, এখানে মিথ্যা কথা বলবেন না। আপনি আপনার স্ত্রীকে কেন খুন করলেন? সব আমাকে বলুন।"

আগন্তুক চীৎকার ক'রে বললে, "খুন নয়,—বলিদান।" ব'লেই মূর্ছিত হয়ে প'ড়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ দারোগাবাবু আপনার কর্তব্য স্থির ক'রে নিলেন। কন্‌স্টেব্‌লকে বললেন, "তেওয়ারী, তুমি ব্রাহ্মণ,—ঘটের মধ্যে জল আছে দেখা যাচ্ছে। ঐ জল নিয়ে ভদ্রলোকের চোখে মুখে দিয়ে, বাতাস ক'রে জ্ঞান সঞ্চারের চেষ্টা কর। আমি দেখি, নিকটে কোন লোকালয় আছে কি না!"

মন্দিরের বাইরে এসে, জঙ্গলটা যেদিকে অপেক্ষাকৃত কম সেই দিকে অল্প কিছুদূর গিয়েই দারোগাবাবুর মনে হ'ল, যেন কিছুদূরে একটা বসতি আছে। কিন্তু অন্ধকারে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করতে পারলেন না। তখন পকেট থেকে একটা বাঁশী বার ক'রে কয়েকবার বাজালেন। সঙ্গে সঙ্গেই কিছু দূরে একটা কুকুর ডেকে উঠল। সেই দিকে আরও কিছুদূর গিয়ে কয়েকবার বাঁশী বাজাতেই কয়েকটা কুকুর ডাকতে আরম্ভ করল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, নিকটেই একটা বসতি আছে। তিনি তখন উচ্চৈঃস্বরে "চৌকিদার চৌকিদার"

ব'লে ডাকতে আবম্ভ করলেন ও বসতিব দিকে টর্চ নাড়াতে লাগলেন। তাঁর ডাকে জেগে উঠে বসতির কয়েকটি লোক সেথান থেকে বেবিয়ে এল। তথন তিনি তাদেব নিজেব পরিচয় দিযে তাদের সাহায্যে চৌকিদারকে আনিযে নিলেন এবং সকলকে নিয়ে মন্দিবে ফিবলেন।

ইতিমধ্যে ভদ্রলোকেব জ্ঞানসঞ্চাব হযেছিল। গ্রাম থেকে যাবা এসেছিল, তাদের মধ্যে একজন তাকে দেখেই ব'লে উঠল, "অ্যাঁ! এ যে হবিপুবেব নবেনবাবু।' তাবপব তাব সম্বন্ধে যে যা জানে সব দাবোগাবাবুকে জানাল।

চৌকিদাবকে লাশেব 'াহাবায বেখে এবং গ্রামেব লোকেদেব তাব সাহায্য করতে উপদেশ দিযে দারোগাবাবু নবেন ও তেওযাবীকে নিয়ে চ'লে গেলেন। যাবাব আগে 'ছিন্নমস্তা'ব মুণ্ডেব জন্য একবাব মন্দিবেব চারিদিকে খোঁজ কবলেন ; কিন্তু কোথাও তাব সন্ধান পেলেন না।

দাবোগাবাবু যথন নবেনেব বাড়ি পৌঁছলেন, তথন প্রায ভোব হযে এসেছে। বেশ বড় দোতলা বাড়ি, তবে কতক অংশ জীর্ণ, সামনে বড উঠোন প্রাচীব দিযে ঘেবা। বাড়িটি দুই অংশে বিভক্ত,—এক অংশ নরেনেব ও অপব অংশ তাব কাকা জগদীশেব। নবেনেব সংসাবে তাব স্ত্রী ও সাত বৎসরের ছেলে মনীশ ভিন্ন আব কেউ ছিল না। একটি ঝি সংসাবেব কাজকম কবত এবং চাকব গোপাল বাইবেব কাজ কবত ও চাষবাস দেখত। নবেনেব পিতামহ ঐ গ্রামেব জমিদার ছিলেন, কিন্তু ক্রমে অবস্থা খাবাপ হওযায় তাঁব সমযেই জমিদাবি বিক্রি হযে যান। নবেনেব অল্পবযসেই তার বাপ মাবা যায় ও তার অংশে জমি-জায়গা যা কিছু ছিল জগদীশ অভিভাবকত্ব কবতে কবতেই তার অধিকাংশই গ্রাস কবেছে। জগদীশেব ছেলে নেই,—সম্প্রতি সম্বন্ধীর ছেলেকে পোষ্যপুত্র নিযেছে।

বাড়িতে ঢুকেই নরেন চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। সেই শব্দে জেগে উঠে জগদীশবাবু বেরিয়ে এলেন ও দারোগাবাবুর কাছে সমস্ত শুনে কেঁদে উঠলেন। তাঁর স্ত্রীও এসে নেপথ্যে কান্নায় যোগ দিলেন। জগদীশবাবু চোখ মুছতে মুছতে বললেন, "আহা! এমন বউ আর হবে না! তোর মনে শেষে এই ছিল নরেন!" ইত্যাদি।

দারোগাবাবু জগদীশকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে বললেন, "দেখুন জগদীশবাবু, আপনি এ গ্রামের প্রেসিডেন্ট, আইনমতে এ মোকদ্দমার তদন্তে আপনার সাহায্য আমার প্রাপ্য। কিন্তু এ গুরুতর মোকদ্দমা, এবং আপনার ভাইপো যখন আসামী, আমি আপনার কাছে বেশি কিছু আশা করতে পারি না। তবে ব্যাপারটি এত জটিল ও অসাধারণ যে, নরেনের পারিবারিক জীবনের সত্য সংবাদ না পেলে তার ঠিক মীমাংসা হওয়া শক্ত। অতএব সে সম্বন্ধে আপনাকে কিংবা আপনার স্ত্রীকে আমি যে সব কথা জিজ্ঞাসা করব, দয়া ক'রে তার সঠিক উত্তর দেবেন।"

জগদীশবাবু বেশ একটু গাম্ভীর্য টেনে এনে বললেন, "তা নিশ্চয় দোব; মিথ্যা বলব না। আমি সব সময়েই সরকারী কর্মচারীদের সাহায্য ক'রে এসেছি। তাতে যদি আমার ছেলের বিরুদ্ধেও সত্য কথা বলতে হয়, আমি কিছুমাত্র দ্বিধা করব না। সত্য কথা তো বলবই, তা ছাড়া ঘটনা সম্বন্ধে আপনি যখন তদন্ত করবেন আমি তাতেও সাহায্য করব; কারণ সত্য কথা বেরুলে হয়তো নরেনের নির্দোষিতা প্রমাণ হয়ে যেতে পারে।"

দারোগাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তা পারে; কিন্তু তার কোনও আশা দেখছি না, কারণ নরেন নিজের দোষ স্বীকার ক'রে নিজেই এজাহার দিয়েছে।"

জগদীশবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তা তো আগেই বলেছেন, কিন্তু আপনাকে তদন্তের সময় সাহায্য করলেও আমি এটা আপনাকে জানিয়ে রাখছি যে, আপনি যদি শেষ পর্যন্ত নরেনকে দোষী সাব্যস্ত ক'রে বিচারের জন্য চালান দেন, তা হ'লে আমি তার পক্ষে মোকদ্দমাব তদবির করব।"

দারোগাবাবু বললেন যে তাতে তাঁব কোন আপত্তি নেই, এবং জগদীশের কর্তব্যনিষ্ঠা ও তৎসঙ্গে দৃঢ়তা দেখে বড়ই খুশি হলেন। তখন তিনি বুঝতে পাবেন নি যে ভাইপোর প্রতি জগদীশের ভালবাসার দৌড় কতদূব! সেই অল্প সময়েব মধ্যেই নবেনের বাকি সম্পত্তিটুকু তাকে কত টাকা ধার দিয়ে বন্ধক বাখতে পারেন, তিনি মনে মনে তারই একটা খসড়া হিসাব করছিলেন।

ঝিকে জিজ্ঞাসা ক'রে দারোগাবাবু জানলেন যে, নবেন ও তাব স্ত্রী গত সন্ধ্যায় প্রায় আটটার সময় একসঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল। কোথাষ যাচ্ছে তা ব'লে যায় নি। উভয়েই গরদের কাপড পবেছিল ও নরেনেব গায়ে গবদেব চাদর ছিল। নরেন হাওড়াতে চাকবি করত এবং উলুবেড়ে থেকে ডেলি-প্যাসেঞ্জার ছিল। প্রায ছ মাস আগে ছুটি নিয়ে এসে বাড়িতেই ছিল ও মাঝে মাঝে জ্বরে ভুগছিল। স্ত্রী-পুরুষে খুব সদ্ভাব ছিল।

জগদীশবাবু ও তার স্ত্রীও সেই রকম বললেন, তবে জগদীশবাবু একটু ইতস্তত ক'বে এ কথাও বললেন যে, ইদানী উভয়ের মধ্যে এমন কিছু একটা হয়েছিল, যার জন্যে নরেন তাব স্ত্রীকে খুব খিটখিট করত; মাঝে মাঝে কান্নাকাটিও হ'ত। দাবোগাবাবু একটু আশ্চয হয়ে জগদীশের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকালেন।

দারোগাবাবু প্রথামত নবেনের বাড়ি খানাতল্লাশি করলেন, বিশেষ

কিছু পাওয়া গেল না। নবেনের স্ত্রীর ঘর তেমন ভাল ক'রে তল্লাশি হ'ল না, মোটামুটি এক রকম দেখে নেওয়া হ'ল। তেওয়ারী পুরনো কন্‌স্টেব্‌ল, বললে, "বাবু, বাক্সগুলো একবার খুলে দেখবেন না?"

দারোগাবাবু বললেন, "চাবি তো নেই। বোধ হয় মৃতার কাপড়ে বাঁধা আছে। যাক, ওতে আব এমন কি পাওয়া যাবে?"

খাঁড়াটি নবেনেব ব'লে সকলেই সনাক্ত করলে।

অপরাহ্নে জগদীশবাবু দারোগাবাবুকে বললেন, "দেখুন, আপনাকে আমি যথন কথা দিয়েছি যে এই মোকদ্দমার তদন্ত সম্বন্ধে আমি সাহায্য করব, তথন সে বিষয়ে কোন কথা আপনার কাছে গোপন করা আমার অন্যায় হবে। আপনি একবার এই গ্রামের পরাণ হালদারকে ডেকে এনে তার জবানবন্দি নিন।"

দারোগাবাবু তখুনি তাকে ডেকে আনিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ও জানলেন যে, গত বাত্রে নরেন ও তার স্ত্রী পূর্বের কথামত তাব বাড়িতে এসে সেখান থেকে তাব গাড়িতে নদীর ধার পর্যন্ত যায় ও নদী পার হয়ে উভয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চ'লে যায়। তাকে নদীর এপারে অপেক্ষা করতে ব'লে গিয়েছিল। কিন্তু অনেক রাত্রি পর্যন্ত তারা যখন ফিরল না, তথন সে বাড়ি ফিরে এসেছিল। নরেনের গায়ে চাদর জড়ানো ছিল, সেইজন্য তার সঙ্গে খাঁড়া ছিল কি না অন্ধকারে সে বুঝতে পারে নি।

প্রমাণ পরিষ্কার, কিন্তু খুনের উদ্দেশ্য কি? দারোগাবাবু অনেক ভেবেও তার একটা সঠিক মীমাংসা করতে পারলেন না। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোন মনোমালিন্য ছিল—এ কথা জগদীশ ভিন্ন আর কেউ বলে নি, এবং নরেনের প্রতি জগদীশের যে কিরূপ আন্তরিক ভাব সেটা দাবোগাবাবু ইতিমধ্যেই বুঝেছিলেন। বাড়িতে গোপাল ছাড়া

অন্য পুরুষ মানুষ কেউ ছিল না, কিন্তু সে বহুদিনের চাকর,—নরেনের বাবার আমলের। নরেন ও মনীশকে সে এক রকম নিজ হাতে মানুষ করেছে। ঘটনার সময় সে এখানে ছিলই না, অতএব তাকে নিয়ে কোন রকম সন্দেহ করা চলে না। যা হোক, এই-জাতীয় গুরুতর মকদ্দমার কার্য-প্রণালী-অনুসারে তিনি উপরওয়ালা ইন্সপেক্টরের উপদেশ নিয়ে পুলিস-সাহেবের আদেশ প্রার্থনা ক'রে রিপোর্ট করলেন।

নরেনের শ্বশুর হরেন্দ্রবাবু পশ্চিমে চাকরি করতেন। এই সংবাদ পেয়েই তিনি এলেন ও দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে সমস্ত অবস্থা অবগত হলেন। তিনি দারোগাবাবুকে বললেন যে, তাঁর কন্যা-জামাতার মধ্যে কোন রকম অসদ্ভাবের কথা তিনি কখনও শোনেন নি বা সন্দেহ করেন নি; বরং তাদের পরস্পরের প্রতি এ রকম ভালবাসা ছিল যে তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না যে, নরেন তাঁর মেয়েকে খুন করেছে। দারোগাবাবু একটু ঝঙ্কারের সঙ্গে বললেন, "কিন্তু প্রমাণ তো যথেষ্ট হয়ে গেছে। মানুষ ঝোঁকের মাথায় কখন কি ক'রে বসে, তা কি কেউ বলতে পারে? মকদ্দমা বিচারের জন্য পাঠাতে হবেই। আপনি বরং ভাল উকিল কি ব্যারিস্টার দিয়ে তার পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করুন। জগদীশবাবুর ওপর নির্ভর করবেন না, সেটা আপনাকে বলাই বাহুল্য মাত্র।"

দারোগাবাবুর কাছে আর কিছু হবার আশা নেই দেখে হরেন্দ্রবাবু পুলিস-সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনিও তখন এই মকদ্দমা সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করছিলেন ও দুই-একটা বিষয়ে তাঁরও কতকটা সন্দেহ হচ্ছিল। হরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁর সে সব সন্দেহ দৃঢ় হ'ল। হরেন্দ্রবাবুর প্রার্থনামত একজন ভাল ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টরকে

এই মকদ্দমার তদন্তে নিযুক্ত করবার জন্যে তিনি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে প্রস্তাব পাঠালেন।

দু-তিন দিনের মধ্যে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর শ্রীরামবাবু এসে তদন্তভার গ্রহণ করলেন।

দারোগাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সেই কালী-মন্দিরে গেলেন ও মন্দিরের ভেতরটা বিশেষভাবে দেখে, মৃতদেহ কোথায় ঠিক কি অবস্থায় দারোগাবাবু দেখেছিলেন তা জেনে নিলেন। মন্দিরের মেঝেটা পাকা, কিন্তু আধুনিক ধরনে সিমেণ্ট করা নয় ও বহু পুরাতন মেঝে ব'লে, যেখানে খাঁড়ার অগ্রভাগ মেঝেতে লেগেছিল সেখানটা বেশ গভীরভাবে কেটে গেছে। শ্রীরামবাবু তা লক্ষ্য ক'রে সেই কাটার দৈর্ঘ্য ও গভীরতা মেপে নিলেন; তারপর ছুরি দিয়ে সেখানটা কিছু কেটে, খাঁড়ার ভগ্ন অগ্রভাগ সেখান থেকে বার করলেন। দারোগাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু বুঝতে পারছেন কি?"

"এ তো আমি বুঝেইছিলাম; এইখানেই কেটেছে।"

"হ্যাঁ, তা তো কেটেছে। কিন্তু নরেনের স্ত্রী যখন ঠাকুর প্রণাম করছিলেন তখনই কেটেছে। নরেন যে বলেছে 'বলিদান', তাই-ই ঠিক। কিন্তু বলিদানটি করলে কে?"

"আমি তো আগেই বলেছি, নরেন ছাড়া কে আর করবে?"

শ্রীরামবাবু কেবলমাত্র "হুঁ" ব'লে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন ও দারোগাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে হরিপুরে গেলেন। সেখানে নরেনের বাড়ি ইত্যাদি দেখে ও সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে থানায় ফিরলেন।

থানাতে লাশ পরীক্ষার রিপোর্ট প'ড়ে বুঝলেন যে, মৃতার গলা এক কোপেই কাটা গিয়েছিল। খাঁড়ার অগ্রভাগটি ভাঙা, সেটা তিনি দেখে গিয়েছিলেন। মন্দির থেকে যে অংশ এনেছিলেন, সেটা ঐ

ভাঙাটাতে ঠিক মিলে গেল। দারোগাবাবুকে বললেন, "আমি একবার জেলখানায় আসামীর সঙ্গে দেখা করব, তার ব্যবস্থা করুন।"

দারোগাবাবু বললেন, "সে কিছুই বলবে না। তবে আপনি যখন বলছেন দেখা করবেন, তখন তাই করুন।"

শ্রীরামবাবু জেলখানায় নরেনের সঙ্গে দেখা করলেন। সে তাঁর সামনে এলে তিনি কেবলমাত্র তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন, কিন্তু কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলেন না। তার পর ঈষৎ চিন্তা ক'রে বললেন, "নরেনবাবু, আমি ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর, আপনাকে এখন কিছুই জিজ্ঞাসা করতে চাই না; কিন্তু যদি আপনার স্ত্রীর হত্যাকারীকে আমি ধরতে পারি, তা হ'লে আমার অনুরোধ যে আপনি সে সময় প্রকৃত ঘটনা সমস্তই প্রকাশ করবেন, এবং আমি এও বলছি যে আপনি তা না করলেও আপনার উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।" ব'লেই তাব মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। দেখলেন যে, তার মুখ ক্ষণকাল উজ্জ্বল হয়েই পরক্ষণে ম্লান হয়ে গেল।

জেলখানাতেই শ্রীরামবাবু ডাক্তার-সাহেবের সঙ্গে দেখা কবলেন ও তাঁকে ভগ্ন অংশ সহিত খাঁড়াখানি ও কাগজপত্র সমস্ত দেখিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। জানতে পারলেন, নরেন যক্ষ্মারোগে অনেকদিন ভুগছে। ডাক্তার-সাহেব বললেন, "তার আয়ু তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।"

শ্রীরামবাবু বললেন, "এই জেলখানাতেই নাকি? আপনার ফাঁসিকাঠে?"

ডাক্তার-সাহেব বললেন, "তাই মনে করেছিলাম, কিন্তু আপনার সঙ্গে কথাবার্তার পর থেকে আর সে ধারণা নেই। বোধ হয় আমার সাক্ষ্যতেই বেঁচে যাবে।"

হরেন্দ্রবাবু তখনও হাওড়ায় ছিলেন। শ্রীরামবাবুর সঙ্গে তিনি

দেখা করলেন। তাঁর কাছ থেকে শ্রীরামবাবু জানলেন যে নরেন প্রায় এক বৎসর যক্ষ্মারোগে ভুগছে। বলতে বলতে হরেন্দ্রবাবু কেঁদে উঠলেন। বললেন, "আমার মেয়ে তো গেছেই, কিন্তু নরেন তাকে খুন করেছে—এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না। আমি তাকে ছেলেবেলা থেকে জানি। আমার ঐ একটি মেয়ে, যখন তার বিয়ে দি তখনও নরেনের অবস্থা ভাল ছিল না; কারণ ইতিপূর্বেই জগদীশ তার জমিজায়গা অধিকাংশ গ্রাস করেছিল। কিন্তু আমার মনে বরাবর এই শান্তি ছিল যে, মেয়েটাকে আমি একটা মানুষের হাতে দিয়েছি। আপনি তাকে এ যাত্রা বাঁচান, তারপর তার অদৃষ্টে যা আছে তা তো বুঝতেই পারছি।" ব'লে আবার কেঁদে ফেললেন।

শ্রীরামবাবু থানায় এলে দারোগাবাবু তাঁকে ডায়েরি দেখাতে দেখাতে বললেন, "আপনি তো সবই একরকম দেখলেন, এখন ডায়েরিটা শেষ ক'রে বিচারের জন্যে রিপোর্ট দেওয়া যাক। আর তো কিছু পাওয়া যাবে ব'লে মনে হয় না।"

শ্রীরামবাবু ডায়েরিতে চক্ষু রেখেই যেন একটু অন্যমনস্কভাবে বললেন, "হুঁ, কার বিচার?"

"কেন? নরেনের।"

"সে তো খুন করে নি।"

"বলেন কি? এ-রকম প্রমাণ! আর তা ছাড়া সে নিজেই স্বীকার করেছে। এখন জেলখানায় বুঝি তার শ্বশুরের উপদেশ পেয়ে সব উল্‌টে দিচ্ছে?"

"না, সে কিছুই উল্‌টে দেয় নি,—কোন কথাই বলে নি। কিন্তু, স্বীকার সে কখন করলে?"

"এজাহারে।"

"এজাহারটা একবার ভাল ক'রে দেখুন তো! কোথায় সে বলেছে যে, তার স্ত্রীকে সে খুন করেছে?"

দারোগাবাবু এজাহার প'ড়ে যেন একটু থমকে গেলেন। ভাবলেন, তাই তো, খুন করেছি—এ কথা তো পরিষ্কার ভাবে বলে নি। বললেন, "তা, দেখুন না, এ তো এক প্রকার বলা ছাড়া আর কি?"

শ্রীরামবাবু বললেন, "দেখুন, 'এক প্রকারে' মুলো-বেগুন চুরিব মকদ্দমা চলে, কিন্তু মানুষকে ফাঁসিকাঠে লটকানো যায় না। আপনার তদন্ত শেষ হয়েছে, কিন্তু আমাব তদন্ত এখনও আরম্ভই হয নি। চলুন, আর একবাব হরিপুব যাওয়া যাক। মকদ্দমার আলামত সমস্তই সঙ্গে নেবেন।"

দারোগাবাবু মনে মনে খুবই বিবক্ত হলেন। ভাবলেন, কেবল সময় নষ্ট কববার জন্যে সরকার এত টাকা খরচ ক'রে এই সব জীবগুলিকে পুযে রেখেছে।

হরিপুরে গিয়ে শ্রীরামবাবু ঝিকে নিভৃতে নিয়ে গিয়ে আব একবাব জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। জানতে পারলেন যে, ঘটনাব দিন নরেন কিংবা তার স্ত্রী কিছুই খায় নি,—উপবাসী ছিল। শ্রীরামবাবু বললেন, "তুমি বেশ ক'বে মনে ক'রে দেখ দেখি, নরেনবাবুব স্ত্রী যখন যান তখন তাঁর গায়ে কোন গয়না ছিল কি না!"

"হ্যাঁ, তিনি যে গয়না সব সময়ে প'রে থাকতেন তা সমস্তই তাঁর গায়ে ছিল মনে হয। তবে সেটা আমি বেশ ভাল ক'বে দেখি নি। নাকে হীরের নাকছাবি ছিল, সে আমার ঠিক মনে আছে।"

শ্রীরামবাবু জানতেন যে, মৃতার গাযে কোন গয়না পাওয়া যায় নি। দারোগাবাবুকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, "তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, স্বামী স্ত্রীকে খুন ক'রে তার গয়নাগুলো মন্দিরের পাশে লুকিয়ে রেখে

থানায় এজাহার দিতে গিয়েছিল, কি বলেন? আচ্ছা, মৃতার বাক্সের মধ্যে কোন গয়না পেয়েছিলেন কি?"

দারোগাবাবুর মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না। শ্রীরামবাবু বললেন, "বুঝেছি। চলুন, বাক্সগুলো খুঁজে দেখা যাক।"

দারোগাবাবু যে সমস্ত আলামত নিয়ে গিয়েছিলেন, তার মধ্যে বাক্সের চাবি ছিল। সমস্ত বাক্স বেশ ক'রে খোঁজা হ'ল, কিন্তু খুব সামান্য দুই-একটা সোনার জিনিস ছাড়া কিছু পাওয়া গেল না। গোপাল যে ঘরে থাকত সেটাও দেখা হ'ল। একটা ভাঙা বাক্সের মধ্যে কেবল একটা ছেঁড়া জামা আছে দেখা গেল।

জগদীশকে জিজ্ঞাসা ক'রে শ্রীরামবাবু জানলেন যে, যে শুক্রবারে ঘটনা হয়েছে, তার আগের সোমবারে গোপাল বাড়ি গেছে। তার বাড়ি নারাণগড় স্টেশন থেকে দু মাইল দূরে, আনন্দপুর গ্রামে। শ্রীরামবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "গোপাল যে মাইনে পেত, সে টাকা সে কোথায় রাখত জানেন?"

জগদীশবাবু বললেন, "নরেন ইদানিং আর তাকে মাইনে দিতে পারত না,—তবে মাঝে মাঝে অল্প কিছু কিছু দিত শুনেছি। গোপাল স্থানীয় পোস্ট-অফিসে টাকা রাখত।" তারপর নিজে থেকেই বললেন, "আমার তো গোপালকে কিছুতেই সন্দেহ হয় না। সে বহুদিনের চাকর, তার বিরুদ্ধে কখনও কিছু শুনি নি।" ইত্যাদি।

শ্রীরামবাবু পোস্ট-মাস্টারের সঙ্গে দেখা ক'রে জানলেন যে, পোস্ট-অফিসে গোপালের যা কিছু টাকা ছিল সে তা ঘটনার দিন অর্থাৎ শুক্রবারে উঠিয়ে নিয়েছিল। বোঝা গেল যে, সে তার আগের সোমবারে বাড়ি যায় নি। জিজ্ঞাসায় পোস্ট-মাস্টার আরও বললেন

যে, গোপাল ইতিপূর্বে আরও অনেকবার টাকা উঠিয়েছিল ; কিন্তু সমস্ত টাকা কখনও ওঠায় নি।

পোস্ট-অফিস থেকে শ্রীরামবাবু নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশনে গেলেন। অনুসন্ধানে জানলেন যে, ঐ সোমবার নারাণগড স্টেশনের কোন টিকিট বিক্রি হয় নি এবং তার পরদিনেও নয়। তিনি ঈষৎ হেসে দারোগাবাবুর দিকে একবার চাইলেন, তারপব স্টেশন-মাস্টারকে বললেন, "দেখুন দেখি, তাব পরের শনিবার সকালেব ট্রেনের সময নারাণগড স্টেশনে কোন টিকিট বিক্রি হয়েছে কি না?"

দেখা গেল যে, একখানা টিকিট বিক্রি হয়েছে।

তখন মেদিনীপুরে খুব স্বদেশী আন্দোলন চলছে। শ্রীরামবাবু 'স্বদেশী' নেতার বেশে আনন্দপুবে আবির্ভূত হলেন, এবং সেই দিনই স্থানীয় লোকজনকে ডেকে একটা মীটিং ক'রে, বেশ কডা রকমেব একটা বক্তৃতা দিয়ে দিলেন। অবিলম্বে পুলিস এসে উপস্থিত হ'ল, ও তাঁর গ্রেপ্তার অবশ্যম্ভাবী মনে ক'রে গ্রামের লোক তাঁব বিদায-সম্বর্ধনাব জন্যে ফুলের মালা গাঁথতে আরম্ভ করল।

কিন্তু পরদিন ভোববেলায় দেখা গেল যে, গোপালেব বাড়ি পুলিসে ভ'রে গেছে ও শ্রীরামবাবু নিবিষ্ট মনে খানাতল্লাশি কবছেন। গোপাল আড়ষ্টভাবে সামনে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে রান্নাঘবেব দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। শ্রীরামবাবু সেটা লক্ষ্য করলেন। গোপালের শোবার ঘরে কিছু পাওয়া গেল না, কেবল তাব জামার পকেটে একখানি বেলেব টিকিট পাওযা গেল। শ্রীরামবাবু চকিতে সেই টিকিটের তারিখটা দেখে নিলেন। তাবপর তাঁব কথামত সকলে রান্নাঘরে ঢুকল। শ্রীরামবাবু একজন সাক্ষীকে বললেন, "মশাই, যদি অনুগ্রহ ক'রে আপনি উনোনের ছাইগুলো টেনে বার করেন তো বড ভাল হয়।"

যেমন ছাইগুলি কতক বার করা হ'ল, তার সঙ্গে কাপড়ে বাঁধা একটা পুঁটলি বেরিয়ে এল। সেটা খুলে দেখা গেল, তার মধ্যে একটি রুলি ও একটি হীরের নাকছাবি রয়েছে। রুলিতে ঈষৎ রক্তের দাগ। শ্রীরামবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কেবল মাত্র একবার গোপালের দিকে তাকালেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। গোপাল তখন কাঁপছে,—মুখ শুকিয়ে গেছে, সর্বাঙ্গে ঘাম ছুটছে।

গোপালকে নিয়ে রেল-স্টেশনে এসে শ্রীরামবাবু দারোগাবাবুকে টেলিগ্রাফ করলেন যে, তিনি যেন সেই দিনই নরেনকে জেলখানা থেকে পুলিসের হেপাজতে নিয়ে হরিপুরে আসেন। ট্রেনে গোপালকে নিজের কামরাতেই নিলেন, কিন্তু তাকে কোন কথা বললেন না।

থানায় এসে শুনলেন যে, দারোগাবাবু কিছুক্ষণ আগে নরেনকে সঙ্গে নিয়ে হরিপুর গেছেন।

একজোড়া হাতকড়া পকেটে রেখে শ্রীরামবাবু গোপালকে নিয়ে রওনা হলেন ও বরাবর কালী-মন্দিরে উপস্থিত হলেন। গোপালকে মন্দিরের ভেতর কিছুক্ষণ একলা রেখে তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে নরেনের বাড়িতে পৌঁছলেন।

বাড়ির ভেতর ঢুকেই গোপাল থমকে দাঁড়াল ও উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারিদিক দেখতে লাগল। শ্রীরামবাবু তাকে নিয়ে গিয়ে, যেখানে নরেনের স্ত্রী প্রত্যহ তাকে ভাত খেতে দিত সেইখানে বসালেন। তারপর দারোগাবাবুকে আড়ালে ডেকে ও হাতকড়া তার হাতে দিয়ে বললেন, "বোধ হয় আপনি নরেনের হাতে হাতকড়া দেন নি। যদি তাই-ই হয়, তা হ'লে এখুনি এই হাতকড়া তার হাতে লাগিয়ে তাকে এখানে নিয়ে আসুন, আর ঐ থামের পাশে দাঁড় করান।" দারোগাবাবু কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শ্রীরামবাবু বেশ একটু

জোর দিয়েই বললেন, "যা বলি তাই করুন, এখন মুহূর্তও সময় নষ্ট করবেন না।"

দারোগাবাবু নরেনকে নিয়ে এলেন। তার শীর্ণ মূর্তি, ধূলিধূসরিত অঙ্গ, পাগলের মত দৃষ্টি ও হাতে হাতকড়া দেখে গোপাল চক্ষু নত করল। ঠিক সেই সময়েই (শ্রীরামবাবুর শেখানোমত) মনীশ কাঁদতে কাঁদতে গোপালের কাছে এসে বললে, "গোপালদাদা! মা কোথা?" গোপাল চমকে উঠল, তাব সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল, চোখে রক্ত ছুটল—যেন মূর্ছা হবাব উপক্রম। পরক্ষণেই সে চীৎকার ক'রে বললে, "মনি, আমিই মাকে মেরে ফেলেছি রে ভাই।" ব'লেই উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠল। দারোগাবাবু বেশ আগ্রহের সঙ্গে তার দিকে এগিয়ে যেতেই সে কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে গডিয়ে পডল। তখন নরেন চীৎকার ক'রে বললে. "না, না, গোপাল খুন করে নি,—ও মিথ্যে বলছে,—একেবারে মিথ্যে কথা।"

দারোগাবাবু নরেনকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, শ্রীরামবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "নরেনবাবু ঠিকই বলছেন. গোপাল খুন করে নি।" তারপর নরেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নরেনবাবু, আমি তো আপনাকে বলেছি যে, আপনার স্ত্রীর হত্যাকারীকে যখন ধবব, তখন সমস্ত প্রকাশ করবার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করব। যখন এখনও সে অনুরোধ করি নি, তখন বুঝবেন তাকে এখনও ধবতে পারি নি।"

দারোগাবাবু অবাক হয়ে শ্রীরামবাবুর মুখের দিকে চাইলেন।

গোপালকে তার নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে শ্রীরামবাবু বললেন, "গোপাল, যা কবেছ সব বল।"

গোপাল আর একবার কিছুক্ষণ কাঁদল। তারপর বললে, "বাবু, আমি মাকে মেরে ফেলেছি,—তার গয়নার লোভে। শ্মশানকালীর

পূজো করলে বাবুর ব্যারাম সেরে যাবে—এই পরামর্শ দিয়ে ও তার সমস্ত ঠিকঠাক ক'রে বাড়ি যাবার ভান ক'রে এখান থেকে চ'লে যাই। নিকটেই ছিলাম। কয়েকদিন পরে অমাবস্থার রাত্রে আমার কথামত বাবু আর মা কালী-মন্দিরে পূজো করতে যান। পাঁঠা বলি দিতে হবে ব'লে খাঁড়া নিয়ে যাবার জন্যে বাবুকে বলেছিলুম। পূজোর পর যখন মা ঠাকুর প্রণাম করলেন, তখনই সেই খাঁড়ার কোপ দিয়ে তাকে খুন করলুম।"

তার কথার অসামঞ্জস্য শ্রীরামবাবু বেশ বুঝতে পারলেন। ঈষৎ হেসে বললেন, "তা বেশ করেছ, এখন আমার সঙ্গে আর একবার মন্দিরে চল।"

মন্দিরে গিয়ে শ্রীরামবাবু গোপালকে বললেন, "বাবা, তুমি তো সবই বলছ, এখন ছিন্নমস্তার মুণ্ডটির কোথায় সন্ধান পাওয়া যায় বল দেখি?"

গোপাল কিছু না ব'লেই জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হ'ল ও ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা জায়গা দেখিয়ে দিল। সেখানে একটু খুঁজতেই মাংসহীন মুণ্ড পাওয়া গেল।

দারোগাবাবুর খুব আনন্দ। যা হোক, এইবারে মকদ্দমাটার কিনারা হ'ল। মন্দিরের দিকে আসতে আসতে শ্রীরামবাবুকে বললেন, "আপনি যা-ই কেন বলুন না, গোপাল নিশ্চয়ই খুন করেছে, তাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতেই হবে।"

"হ্যাঁ, সে তো তাই-ই চায়; কিন্তু তার প্রাণটা অত সহজে যাবে না।"

"কেন বলুন দেখি, খুনের মকদ্দমায় এর চেয়ে আর কি বেশি প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে?"

"প্রমাণ তো পেলেন। কিন্তু মন্দিরের ভেতর একটা ছাঁচি-কুমড়ো ঝুলছে দেখেছেন? গোপালের প্রাণটা ঐ ছাঁচি-কুমড়োর ভেতর আছে। ওটা যতক্ষণ সেখানে ঝুলবে, তাকে মারে কে?"

দারোগাবাবু কিছুই বুঝতে পারলেন না। ভাবলেন, লোকটা পাগলের মত কি সব বলে! বললেন, "আপনি কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু এতেও যদি বলেন যে, সে খুন করে নি, তা হ'লে করল কে?"

শ্রীরামবাবু বললেন, "সেইটাই তো আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। তার জন্যেই তো পাবলিকের টাকা খাচ্ছি।"

দারোগাবাবুর সঙ্গে মন্দিরে ঢুকে শ্রীরামবাবু কড়িকাঠে সংলগ্ন একটি শিকেয় রাখা ছাঁচি-কুমড়োর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "কুমড়োটার নীচে একটা কাটার দাগ দেখেছেন? দেখেই মনে হচ্ছে বেশি দিনের কাটা নয়। হত্যাকারী যখন খাঁড়ার কোপ মারে, তখন খাঁড়ার মাথাটা কুমড়োর নীচে লাগায় ঐখানটা কেটে যায়। গোপাল এত বেঁটে যে তার হাতের খাঁড়া ওখান পর্যন্ত পৌঁচতেই পারে না।"

দারোগাবাবু ভাল ক'রে দেখে বললেন, "তাই তো!"

তখন শ্রীরামবাবু বললেন, "দেখুন, আপনি যতই প্রমাণ উপস্থিত করুন না কেন, এই খুনের চার্জ থেকে নরেনকে বাঁচিয়ে দেবে তার কৃশত্ব, আর গোপালকে বাঁচিয়ে দেবে তাব বেঁটেত্ব।" ব'লেই একটু হাসলেন।

গোপালকে মন্দিরের ভেতর আনা হ'ল। শ্রীরামবাবু স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললেন, "গোপাল, তুমি যে মহাপাপ করেছ, তার উপযুক্ত শাস্তি প্রাণদণ্ড। তোমাব মনে অনুতাপ এসেছে, তাই তুমি এখনও পর্যন্ত সেই দণ্ডই চাও। কিন্তু তুমি ইচ্ছে করলেই তোমার

প্রাণদণ্ড হবে না। এই ঘরের মধ্যে এমন জিনিস আছে, যা প্রমাণ ক'রে দেবে তুমি নিজ হাতে খুন কর নি। তবে তুমি এর মধ্যে ছিলে, আব ঠিক জান কে খুন করেছে। আর আমার কাছে লুকিও না।"

গোপাল ইতস্তত করতে লাগল। তখন শ্রীরামবাবু তাকে কালীমূর্তির দিকে আর একটু এগিয়ে নিয়ে এসে বললেন, "দেখ, এ দেবতার মন্দির। সম্মুখে জাগ্রত কালীমূর্তি, আমি ব্রাহ্মণ, আর তোমার যে মা আজ সাত বৎসর ধ'রে তোমার সামনে ভাতের থালা ধ'রে দিয়েছে, তুমি তার রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে। মিথ্যে কথা ব'লো না।"

গোপাল একবার শ্রীরামবাবুর মুখের দিকে, একবার কালীমূর্তির দিকে, একবাব মেঝেব রক্তের দিকে চাইল, তারপর চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল, "কাপালিক।"

গোপালকে বাইরে এনে শ্রীরামবাবু কাপালিক সম্বন্ধে সমস্ত কথা জেনে নিলেন। প্রায় তিন মাস পূবে কালী-মন্দিরে কাপালিকের সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়। সে প্রায়ই তার কাছে যেত এবং তার সঙ্গে গাঁজা খাওয়া ধরেছিল। তারই পরামর্শমত গোপাল এই কার্যে লিপ্ত হযেছিল। কিন্তু মৃতাকে খুন করার উদ্দেশ্য তাব ছিল না, এমন কি খুন করার সময় পর্যন্তও সে জানত না যে, কাপালিক তাকে খুন করবে। সে তাকে বলেছিল যে, গয়নাপত্র কেড়ে নিয়ে তারা পালিয়ে যাবে। ঘটনার ঠিক আগেই সে নরেনকে নদীতে জল আনতে পাঠায়; কারণ, ব্রাহ্মণের আনা জল ভিন্ন চলবে না। তার সঙ্গে গোপালকেও যেতে বলে। যাতে মন্দিরে ফিরতে তাদের কিছু দেরি হয়, সে সম্বন্ধে গোপালকে ইঙ্গিতে নির্দেশ দেয়। তারা মন্দিরে এসেই দেখে, মৃতা গলাকাটা অবস্থায় মেঝেতে প'ড়ে ও কাপালিক সেখানে নেই। নরেন চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠে তার স্ত্রীর মৃতদেহের ওপর লুটিয়ে পড়ে। তারপরেই

রক্তাক্ত খাঁড়াখানা নিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে যায়। সে যাবার পর কাপালিক আসে। মৃতার গয়না কাপালিক আগেই খুলে নিয়েছিল। মুণ্ডটি নিয়ে গিয়ে ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়ে কাপালিক ও গোপাল রেলওয়ে স্টেশনে যায়। উভয়ে সকালের ট্রেনে চ'লে যায়।—নারাণগড স্টেশনে গোপাল ট্রেন থেকে নেমেছিল। কাপালিক সেখানে নামে নি, কোথায় নেমেছে তা সে জানে না।

মৃতাকে কেন খুন করলে—এ কথা গোপাল কাপালিককে জিজ্ঞাসা করেছিল। সে বলে যে তার মনে হয়েছিল, মৃতার গায়ে খুব শক্তি আছে এবং জোর ক'রে গয়না কেড়ে নিতে গেলে সে খুব সম্ভবত বাধা দেবে ও চীৎকার করবে। এই চিন্তা তার মাথায় ওঠা মাত্র সে তখুনি খুন করাই স্থির করে। তাকে দেবতা প্রণাম করতে বলায় সে যেমন প্রণাম করল, তেমনি খাঁড়া নিয়ে কোপ দেয়। এর আগে গোপাল তিন-চারবার কাপালিককে নরেনের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল, এবং সেখানেও কাপালিক এক রাত্রে কালীপূজা করেছিল। তারা গভীর রাত্রেই নরেনের বাড়ি যেত, ও তার রোগশান্তির জন্য কাপালিক নানারূপ প্রক্রিয়া করত। কালী-মন্দিরে সস্ত্রীক পূজা করতে আসার উপদেশ কাপালিকই নরেনকে দেয়।

শ্রীরামবাবু নিজের ডিটেকটিভ কন্‌স্টেব্‌ল বলদেও মিশ্রকে কাপালিক সম্বন্ধে সমস্ত কথা বুঝিয়ে দিয়ে এবং তার আকৃতি ও গঠনের যথাসম্ভব আভাস দিয়ে বললেন, "মিশির, তুমি এখুনি বেরিয়ে পড়। স্টেশনে গিয়ে দেখ, মহাপুরুষ কোন্‌ স্টেশনের টিকিট কিনেছিলেন! সম্ভবত সেখান থেকে বেশি দূর এখনও যান নি। তবে, কাপালিকের বেশে তাকে আর পাবে না বোধ হয়। যাবার সময় থানা থেকে তোমার 'সাধু'র বেশ ও হাতকড়া নিয়ে যাবে।"

স্টেশনে গিয়ে মিশির অনুসন্ধানে জানল যে, ঐ ট্রেনে নারাণগড়ের পরবর্তী কোন স্টেশনের টিকিট বিক্রি হয় নি। তবে টিকিটবাবু বললেন যে, তাঁর যতদূর স্মরণ হয়, কিছুদিন আগে সকালের ট্রেনেব সময় তিনি দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, লাল-কাপড়-পরা এক সন্ন্যাসীকে স্টেশনে দেখেছিলেন।

মিশির নারাণগড়ের পরবর্তী স্টেশনের টিকিট নিয়ে সেখানে গিয়ে নামল। অনুসন্ধানে কোনও ফল হ'ল না. এই রকম ক'রে পরের পরের স্টেশনে অনুসন্ধান করতে করতে বখরাবাদ স্টেশনে জানতে পারল যে, কিছুদিন আগে লাল-কাপড-পরা এক সন্ন্যাসী ট্রেন থেকে নামে। তাব টিকিট ছিল না। এ রকম সন্ন্যাসীদের কাছে ভাড়া আদায়ের সম্ভাবনা কম ব'লে তাকে নিয়ে টানাটানি না ক'রে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

মিশির বখরাবাদ-স্টেশনমাস্টারেব সঙ্গে গোপনে কথাবার্তা ব'লে ও নিজের জিনিসপত্র কিছু তার জিম্মায় রেখে, 'সাধু'ব বেশে স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেল।

গ্রামে গ্রামে গিয়ে সাধু নিজের 'গুরুজী'র সন্ধান আরম্ভ করলে। দু দিন অনুসন্ধানের পর এক গ্রামে গিয়ে জানতে পারল যে, এক সন্ন্যাসী গ্রামের প্রান্তে এক গাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে আসন ক'রে বসেছে। সকলেই বললে, "সন্ন্যাসী মস্তবড় যোগী,—এরই মধ্যে ঔষধ দিযে নাকি অনেকের রোগ সারিয়েছে।" ইত্যাদি।

সন্ধ্যার পর লোকের ভিড় কম হ'লে মিশির গিয়ে সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করলে। সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ ও মাথায় জটা। কিছুক্ষণ আলাপেব পব গঞ্জিকা সেবন হ'ল, এবং মিশির তাতে যোগ দিয়ে ও 'দেশে'র নানারূপ গল্প ক'রে সন্ন্যাসীকে আপ্যায়িত করলে।

সন্ন্যাসীর চেহাবা দেখেই মিশির বুঝেছিল যে, এই সেই কাপালিক। এবং আলাপে তার সন্ন্যাসীত্বের সম্পূর্ণ অভাব দেখে তার ধারণা

বদ্ধমূল হ'ল। মিশির এও লক্ষ্য করল যে, সন্ন্যাসী যেন সদাই সতর্ক, যেন সামান্য কারণেই চমকে উঠছে, কথা বলতে বলতে কেবলই অন্যমনস্ক হচ্ছে। তার হাবভাব দেখে মিশিরের মনে হ'ল যেন সে তাকে সন্দেহ করছে। ভাবলে, আর সময় দেওয়া হবে না; 'গুরুজী' হয়তো রাত্রের মধ্যেই ভেগে পড়বেন।

মিশির আর এক ছিলিম গাঁজার প্রস্তাব করল। এবং সন্ন্যাসী যেমন গাঁজা বার করবার জন্য ঝুলির ভেতর হাত ঢুকিয়েছে, সে তার ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার সেই হাতখানা চেপে ধরল। তখন ধস্তাধস্তি আরম্ভ হ'ল, এবং যে কয়েকজন দর্শক সেখানে ছিল তারা "সাধুকে মারছে", "সাধুকে মারছে" ব'লে সন্ন্যাসীর সাহায্যার্থ এগিয়ে এল। ইতিমধ্যে মিশির অপূর্ব কৌশলে, সন্ন্যাসীর অধিকতর দৈহিক বল সত্ত্বেও, তাকে ধরাশায়ী করেছে। চীৎকার ক'রে বললে, "এ লোকটা সাধু নয়,—খুন ক'রে পালিয়ে এসেছে। আমি পুলিস, আমাকে সাহায্য কর।" এবং সঙ্গে সঙ্গেই সাধুর কৃত্রিম জটা টান দিয়ে খুলে ফেললে। তখন লোকগুলি থমকে দাঁড়াল এবং তাদের মধ্যে একজন তৎক্ষণাৎ এগিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীকে চেপে ধরতেই, আরও কয়েকজন গিয়ে তার ওপর পড়ল। মিশির তখন ঝোলা থেকে হাতকড়া বের ক'রে সন্ন্যাসীর হাতে লাগিয়ে দিলে।

গোলমাল শুনে নিকটবর্তী বসতি থেকে আরও কয়েকজন লোক এসে জুটল। সাধুর লাঞ্ছনা দেখে তারা উত্তেজিত হয়ে মিশিরকে আক্রমণ করতে উদ্যত হ'ল। আগে যারা সেখানে ছিল, তারা তাদের বাধা দিলে। ক্রমশ দুই দলে বচসা হয়ে মারামারির উপক্রম। একদল বলে, সাধু ভণ্ড। অন্যদল বলে, সিপাহী ভণ্ড। তখন মিশির ছোট একখণ্ড কাগজ বার ক'রে তাদের দেখিয়ে বললে, "আমি সত্যিই

পুলিসের লোক। কেউ যদি ইংরেজী পড়তে জানেন তো এটা প'ড়ে দেখুন। আপনাদের সাবধান ক'রে দিচ্ছি, যদি আমার কাজে বাধা দেন, তা হ'লে আপনারা বিপদে পড়বেন।"

আক্রমণকারীরা একটু দ'মে গেল, ও তাদের আস্ফালন বন্ধ হ'ল।

মিশির তখন সাধুর ঝুলিটা টেনে নিয়ে এসে, তার ভেতরের জিনিস সব বার ক'রে, কাপালিকের বেশভূষাটা দেখিয়ে বললে, "দেখুন, আপনাদের সাধুর কত রকমের সাজ সঙ্গে আছে। আচ্ছা, আরও কিছু দেখাতে পারব বোধ হয়।" এই ব'লেই সাধুকে তার আসন থেকে টেনে নিয়ে এসে সেই আসন তুলে ফেললে। দেখা গেল যে, তার নীচের মাটিটা আলগা। সাধুর চিমটে দিয়ে সেইখানটা একটু খুঁড়তেই তার ভেতর একটা কাপড়ে-বাঁধা পোটলা পাওয়া গেল। সেই পোটলা খুলতেই দেখা গেল, তার মধ্যে কয়েকটি সোনার গয়না।

সেই দেখেই আগন্তুকরা সকলেই ব'লে উঠল, "ব্যাটা সাধু চোর," ও উত্তেজিত হয়ে তাকে মারবার উপক্রম করলে। মিশির তাদের বাধা দিয়ে বললে, "আপনারা মারপিট করবেন না; বরং যাতে আমি একে নিরাপদে হাওড়াতে নিয়ে যেতে পারি, সে বিষয়ে আমাকে সাহায্য করুন।"

জেলখানায় নরেন ও গোপাল প্রচলিত প্রথামত কাপালিককে সনাক্ত করলে। নরেন গয়নাগুলি তার স্ত্রীর বললে। তখন শ্রীরামবাবু নরেনকে বললেন, "নরেনবাবু, এইবার আপনার স্ত্রীর হত্যাকারীকে ধরেছি। এখন আপনি আপনার মৌন অঙ্গীকার পালন করুন।"

নরেন কোন কিছু গোপন না ক'রে আদ্যোপান্ত সমস্তই বললে। তারপর সাশ্রুনয়নে বললে, "ইন্সপেক্টরবাবু, এজাহারে আমি মিথ্যে

বলি নি। আমার স্ত্রীর খুনের জন্যে আমিই দায়ী ;—আমিই তাকে জল্লাদের হাতে এগিয়ে দিয়েছি। আমাকে প্রাণদণ্ড দিন। আমি আর বাঁচতে চাই না।” ব’লেই মূর্ছিত হ’য়ে প’ড়ে গেল।

বিহার ও যুক্তপ্রদেশ ‘ফিঙ্গার-প্রিণ্ট বুরো’তে কাপালিকের আঙুলের ছাপ পাঠাতেই জানা গেল যে, সে শাহাবাদ জেলার একজন প্রসিদ্ধ ডাকাত, এবং কয়েকটি ডাকাতি ক’রে প্রায় এক বৎসর ফেরার আছে।

যথাসময়ে দায়রার বিচারে কাপালিকের প্রাণদণ্ডের আদেশ ও গোপালের পাঁচ বৎসর জেলের আদেশ হ’ল।

বুদ্ধিমান

সাহাগঞ্জ জেলার মালিপুর মহকুমার স্কুলের পণ্ডিত রামশরণ তেওয়ারীর একমাত্র পুত্র কিষণলাল দশ বৎসর বয়সে, কিঞ্চিৎ পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে ও অধিক মাত্রায় পিতার তাড়নায়, অমরকোষের প্রায় অর্ধেকটা মুখস্থ করিয়া ফেলিল। ঐটুকু ছেলের অমরকোষ আবৃত্তির বহর দেখিয়া পাড়ার লোক স্তব্ধ হইয়া গেল। কেহ বলিল, "শ্রুতিধর।" কেহ বলিল, "সরস্বতীর বরপুত্র।" পণ্ডিতজী সগর্বে বলিতেন, "কিষণ আমার বড় বুদ্ধিমান।" ক্রমশ সকলেই কিষণলালকে 'বুদ্ধিমান' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কিন্তু বুদ্ধিমানের বুদ্ধির আর বিশেষ বৃদ্ধি হইল না। না হইবারই কথা, কেন না অল্পবয়সে বুদ্ধির উপর ঐরূপ অত্যাচার হওয়ায় ক্রমশ সবই যেন তাল পাকাইয়া গেল। তবে পণ্ডিতজীর অনর্গল চড়-চাপড় ও নিজের হাতের সুন্দর লেখার জোরে 'বুদ্ধিমান' প্রথমবারেই, অর্থাৎ উনিশ বৎসর বয়সে, ম্যাট্রিকুলেশনটা থার্ড ডিভিশনে পাস করিল।

অনেক ছেলে ঠেঙাইয়া পণ্ডিতজী ছেলেদের মনোবিজ্ঞানে বিশেষ সুদক্ষ হইয়াছিলেন, সেই জন্য 'বুদ্ধিমানে'র বুদ্ধির সঙ্গে আর ধস্তাধস্তি না করিয়া নিজের একটি ছাত্রকে ধরিয়া তাহাকে স্থানীয় মুনসেফী অফিসে ত্রিশ টাকা বেতনে গতাইয়া দিলেন। চাকরি হইলেই বিবাহ অবশ্যম্ভাবী। অতএব অনতিবিলম্বে একটি সুন্দরী পুত্রবধূ আসিয়া পণ্ডিতজীর ঘর আলো করিল, ও যথাসময়ে, অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে পৌত্রের মুখ দেখাইয়া আপনার কর্তব্য

পালন করিল। ইহার কিছুকাল পরেই পণ্ডিতজী নিশ্চিন্তমনে স্বর্গারোহণ করিলেন। গৃহিণী অনেক আগেই গিয়াছিলেন।

ক্রমশ একটি কন্যা ও আর একটি পুত্র আসিয়া কিষণলালের সংসার উজ্জ্বল করিল; কিন্তু মাহিনা তিন বৎসরে ছয়টি টাকার বেশি বাড়িল না। অর্থকষ্টে ও পত্নীর তাড়নায় 'বুদ্ধিমানে'র বুদ্ধি লোপের উপক্রম হইল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই সময় পণ্ডিতজীর ছাত্রটি হাইকোর্টে বদলি হইলেন ও সেখানে কিষণলালকে লইয়া গিয়া পঞ্চাশ টাকা বেতনে একটি কাজে ঢুকাইয়া দিলেন।

বড় শহরে আসিয়া কিষণলালের খরচ কিছু বাড়িয়া গেল। তাহার উপর সুন্দরী পত্নীর এটা-ওটা-সেটা আবদার। ক্রমশ পত্নীর চাল ও বাজারের দেনা বাড়িতে লাগিল।

আর কোনও উপায় নাই দেখিয়া একদিন কিষণলাল পত্নীকে বলিল, "দেখ, আর তো পেরে উঠি না, তুমি একটু খরচ কমাও।"

পত্নী মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "তুমি পেরে ওঠ না—এ আমি বিশ্বাস করি না। তোমাকে লোকে বুদ্ধিমান বলত,—যদি বুদ্ধিটা সব উপে গিয়ে না থাকে, তা হ'লে কিঞ্চিৎ খরচ কর। দুনিয়ায় টাকা ছড়ানো রয়েছে, কুড়িয়ে নিতে পারলেই হয়।" বুদ্ধিমান ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "তা তো পারি, কিন্তু একবার বুদ্ধির দৌড় ছাড়লে শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারব কি না জানি না। তখন যেন কেঁদে ভাসিয়ে দিও না।"

কিষণলালের কাজ ছিল আপিসের নথি নিম্ন আদালতে ফেরত পাঠানো; সুতরাং উপরি-পাওনার বিন্দুমাত্র আশা ছিল না। কিন্তু উপরি-পাওনা তো চাই। রেলওয়ে পার্সেলে নথি পাঠানো হইত, এবং পার্সেলের রসিদ সংযোগে বিল করিয়া টাকা লওয়া হইত।

কিষণলাল রেল-স্টেশন হইতে একটি বহি সংগ্রহ করিয়া দুই-চারখানি রসিদ জাল করিয়া কিঞ্চিৎ উপরি-পাওনা হজম করিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পুনরায় ঐরূপ করিতে গিয়া রসিদখানি বুদ্ধিমানের দুর্বুদ্ধিবশত জাল বলিয়া ধরা পড়িল। সে ঐ রসিদে বাইশে এপ্রিল তারিখ দিয়াছিল, কিন্তু ঐ তারিখে গুড্‌ফ্রাইডের ছুটি ছিল বলিয়া পার্সেল-অফিস বন্ধ ছিল। উপরিতন কর্মচারীর নজরে তাহা পড়িয়া গেল এবং তখন পূর্বের কতকগুলি রসিদ ডেস্‌পাচ-বহির সহিত মিলাইয়া দেখিতে আরও কয়েকখানি জাল রসিদ বাহির হইয়া পড়িল।

দায়রায় কিষণলালের বিচার হইল। কিন্তু সে এমন করুণ সুরে নিজের অল্পবয়স, বুদ্ধিহীনতা ও পারিবারিক দুর্দশার কথা বিবৃত করিল যে, জুরী করুণায় গলিয়া গেলেন ও তাঁহাদের অনুরোধে জজ-সাহেব তাহাকে কেবল মাত্র তিন মাসের জেল দিলেন। তাহার চাকরিটি গেল।

জেল হইতে খালাস হইয়া কিষণলাল বাড়ি আসিলে তাহার পত্নী কাঁদিবার উপক্রম করিতেই সে বলিল, "দেখ, কাঁদতে পাবে না, সে কথা তো আগেই ব'লে রেখেছি। বুদ্ধির দৌড় যখন একবার ছেড়েছি, তখন আর তাকে কিছুতেই রুখতে পারব না। তোমার কিছু ভয় নেই। আর তো চাকরির বন্ধন নেই। আর যখন একবার জেল দেখেছি, তখন সেটার ভয়ও করি না। এবার কি করি দেখ।"

সাহাগঞ্জে গিয়া কিষণলাল প্যাণ্ট কোট নেকটাই হ্যাট ইত্যাদি কিনিয়া দস্তুরমত সাহেব সাজিল। চেহারাটা ভালই ছিল, অতএব সাহেবী পোশাকে মানাইল ভাল।

সে পণ্ডিতজীর নিকট শুনিয়াছিল যে, একতাবপুরের জমিদার জয়ধর সিং তাঁহার ছাত্র। সেই পরিচয়ে একতারপুরে গিয়া সে

জয়ধরবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল ও পণ্ডিতজীর অবর্তমানে নিজের সাংসারিক দুরবস্থার কথা জানাইয়া বলিল, "বাবার আশীর্বাদের জোরে আমি গত বৎসর বি. এল. পাস করেছি, ও তাঁর এক ছাত্রের সুপারিশে হাইকোর্টের জজ-সাহেবকে ধ'রে সম্প্রতি মুনসেফী চাকরি পেয়েছি।" এই বলিয়া হাইকোর্টের ছাপা ফর্মে টাইপ করা বাঙ্গালী পত্র দেখাইল। (হাইকোর্টে চাকরি করিবার সময় কিষণলাল কতকগুলি চিঠির ফর্ম সংগ্রহ করিয়াছিল, ও তাহাতে হাইকোর্টের স্ট্যাম্প দিয়া রাখিয়াছিল।) জয়ধরবাবু বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলে কিষণলাল পুনরায় নিজের দুরবস্থার কথা জানাইয়া হাকিমী চাকরির উপযুক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি কিনিবার জন্য জয়ধরবাবুর নিকট পাঁচ শত টাকা ধার চাহিল। বলিল, "আমি সুদ দিতে পারব না; কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই টাকাটা শোধ ক'রে দোব।" জয়ধরবাবু একখানি পাঁচ শত টাকার চেক দিলেন।

জয়ধরবাবুর বন্ধু উজীরপুরের জমিদার হরবংশবাবু তাঁহার কন্যার জন্য একটি সুপাত্রের সন্ধান করিতে জয়ধরবাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিষণলালকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, এ ছেলেটি তো বেশ। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বিয়ে হয়েছে?" কিষণলাল সুন্দর মুখখানিকে অতি মাত্রায় লাল করিয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে, না।" বুদ্ধিমানের উপস্থিতবুদ্ধি তাহার মুখে ওই উত্তর আনিয়া দিল। তখন জয়ধরবাবু তাহাকে হরবংশবাবুর কথা বলিলেন ও তাঁহার নামে একখানি পত্র লিখিয়া কিষণলালের হাতে দিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন।

কিষণলাল স্টেশনে আসিয়া পত্রখানি খুলিল ও তাহার মধ্যে যে

মুনসেফী চাকবিব কথা ছিল তাহা ছুবি দিয়া পরিষ্কারভাবে তুলিযা দিযা তাহাব পবিবর্তে "আই. সি. এস." লিখিযা দিল।

হববংশবাবু কিবণলালকে বিশেষ আদবযত্ন করিয়া বিবাহেব কথা উত্থাপন কবিতেই সে সলজ্জভাবে বলিল, "দেখুন, আমাকে তো ট্রেনিংএব জন্যে বিলেত যেতে হবে। সেখান থেকে ফিবে না আসা পর্যন্ত বিবাহ কবা অসম্ভব। বিলেত যাওযাব জন্য আমাব এখন কিছু টাকাব দবকাব। আপনি যদি কিছু সাহায্য কবেন, আমি সে উপকাব ভুলব না। তবে বিয়ে হওয়া না-হওযা ভগবানেব হাত। আমাব সম্প্রতি হাজাব টাকাব দবকাব। আমি ফিবে এসে অল্পদিনেব মধ্যেই এ টাকাটা শোধ দিযে দোব।"

হববংশবাবু ভাবিলেন, কিছু দিযা ছেলেটাকে হাতে বাখা যুক্তিসঙ্গত। বলিলেন, "আমি তোমাকে হাজাব টাকা দিচ্ছি। ভগবান যদি আমাব ইচ্ছা পূর্ণ কবেন, তা হ'লে এ টাকাটা তোমায় আব শোধ দিতে হবে না।" আবও বলিলেন যে, নবীনগবেব জমিদাব বামশবণবাবু তাঁহাব আত্মীয। তাঁহাব ছেলে বিলাতে আছে। তাঁহাব সঙ্গে একত্র থাকিলে সুবিধা হইবে। এই বলিযা বামশবণবাবুব নামে একখানি পত্র লিখিযা কিষণলালেব হাতে দিলেন। কিষণলাল আসিবাব সময হববংশবাবুব নাম ইত্যাদি ছাপা দুই-চাবখানি চিঠিব কাগজ তাঁহাব টেবিল হইতে সংগ্রহ কবিল।

কিষণলাল বাড়ি আসিযা পত্নীকে এক হাজাব টাকা দিযা বলিল, "খুব সাবধানে খবচ ক'বো। এখন আমি কিছুদিনেব জন্য গা-ঢাকা দোব। যে পথে পা দিযেছি, কখন কি হয বলা যায না।"

পত্নী ক্রন্দনেব সুবে বলিল, "আমি তো জানি তুমি তোমাব বুদ্ধির জোবে টাকা আনছ। এতে হবে আবাব কি, তা তো বুঝতে

পারছি না।" কিষণলাল হাসিয়া বলিল, "নাঃ, কি আর এমন হবে : হয়তো আর একটা শ্বশুরবাড়ি।"

এবার কিষণলাল পাটনায় গিয়া সজোরে বুদ্ধি চালাইতে আরম্ভ করিল। গোপনে কোকেন বিক্রি করিয়া কিছু লাভ করিল ও সেই মূলধনে আফিমের গুপ্ত কারবার আরম্ভ করিল। এ রকম কাজ কিষণলালের বুদ্ধির সহিত ঠিক খাপ খাইল না। অতএব একবার আফিম-সহ ধরা পড়িয়া ছয় সপ্তাহের জেল খাটিল।

জেল হইতে বাহির হইয়া কিষণলাল কয়েকটি ভদ্রলোকের সহিত দেখা করিয়া প্রকাশ করিল যে, সে পাটনা ইউনিভার্সিটি হইতে বৃত্তি পাইয়া জার্মানিতে কেমিস্ট্রি পড়িতে যাইতেছে ও ইউনিভার্সিটির একখানি চিঠি সকলকে দেখাইল (অবশ্য চিঠিখানি জাল)। ইহাও বলিল যে, সে চিনি তৈয়ারি করিবার উপযোগী রাসায়নিক প্রক্রিয়া সমস্ত শিখিয়াছে এবং যদি সুবিধামত একটা চাকুরি পায় তাহা হইলে আর জার্মানি যাইবে না। তখন বিহারে চিনির কল খুলিবার জন্য নানা স্থানে প্রচেষ্টা হইতেছিল। ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন তাহাকে একখানি চিঠি দিয়া হবিগঞ্জে চিনির কলে পাঠাইয়া দিল।

চিনির কলে কিষণলালের চাকরি হইল, কিন্তু সে কেমিস্ট্রির এক বর্ণও জানে না। চাকরি চালাইবে কেমন করিয়া? প্রথমে একটু চিন্তিত হইল, তারপর ভাবিল, যাক, বুদ্ধির জোরে চালাইয়া লওয়া যাইবে। আসল কাজ তো কুলীরা করে, বাবুরা রিপোর্ট লেখে আর মাহিনা গুনিয়া লয়।

এই সময় একটি ভদ্রলোক হবিগঞ্জের ডাক-বাংলোয় আসিয়া সেখানে আর একটি চিনির কল হইতে পারে কি না এবং হবিগঞ্জের কল হইতে কোন কর্মচারী সংগ্রহ করিতে পারা যায় কি না, তাহার অনুসন্ধান

করিতে আরম্ভ করিলেন। কিষণলালের সহিত আলাপ হইতেই কিষণলাল বলিল যে, কিছু বেশি মাহিনা পাইলে সে এ কল ছাড়িয়া যাইতে রাজী আছে এবং আরও কিছু বেশি পাইলে সে জার্মানি যাওয়ার কল্পনা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া তিন বৎসরের এগ্রিমেণ্ট দিয়া কাজ করিবে।

পরদিন কিষণলাল ডাক-বাংলোয় গিয়া ভদ্রলোকের সহিত দেখা করিল ও ইউনিভার্সিটির চিঠি দেখাইল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া প্রায় দ্বিগুণ মাহিনা দিতে স্বীকার করিলেন ও বলিলেন, "আমাদের চুক্তির নিদর্শনস্বরূপ কিছু অগ্রিম দিচ্ছি। আপনার মত লোককে কি আমি ছাড়তে পারি?" এই বলিয়া বজ্রমুষ্টিতে তাহার হাত ধরিতেই পাশের ঘর হইতে আর একটি লোক আসিয়া কিষণলালের হাতে হাতকড়া লাগাইয়া দিল।

বুদ্ধিমান বুঝিল, তাহার চেয়েও বুদ্ধিমান লোক আছে। সে কিছু বলিতে যাইতেছিল, তখন বাবুটি হাসিয়া বলিলেন, "কিষণলাল, তুমি অনেককে ঠকিয়েছ। হরবংশবাবুকে ঠকিয়ে হাজার টাকা নেওয়ার চার্জে তোমায় আমি গ্রেপ্তার করলাম। জয়ধরবাবু তোমার বাবার ছাত্র, তিনি আর তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন না। আরও দুটি মকদ্দমা তোমার বিরুদ্ধে রুজু হয়েছে; যথাসময় সব জানতে পারবে। সম্প্রতি ইউনিভার্সিটির ওই চিঠিখানি আমায় দাও।"

পাটনায় কিষণলালের বিচার হইল। প্রমাণ পরিষ্কার, অতএব সাজা অবশ্যম্ভাবী। মকদ্দমার শুনানি শেষ হইলে কিষণলাল অপরাধ স্বীকার করিয়া সজলনয়নে হাকিমকে নিজের দুঃখের কাহিনী বলিল,—অর্থাৎ প্রথমত অতি সামান্য অপরাধে তাহার দণ্ড হইয়াছিল ও চাকুরিও গেল। তাহার পর আর কোথাও চাকুরি জুটিল না, স্ত্রী-পুত্র

অনাহারে মরে, এ অবস্থায় ঐরূপ উপায়ে কিছু উপার্জন করা ভিন্ন তাহার গত্যন্তর ছিল না, ইত্যাদি। তাহার পর করজোড়ে বলিল, "হুজুর, আমি তো আর চুরি-ডাকাতি করি নি। নিতান্ত পেটের দায়ে দুটো মিষ্টি কথা ব'লে, না হয় লোকের কাছ থেকে সামান্য কিছু নিয়েছি। তাদের অজ্ঞাতসারে তো কিছু করি নি।"

হাকিম বলিলেন, "তা তো বটেই; লোকেরও তো বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে, তারা ঠকে কেন?"

কিষণলাল একটু সহানুভূতি পাইয়া সাগ্রহে বলিল, "হুজুর, দুনিয়ায় কে না কাকে ঠকাচ্ছে! আপনার গোয়ালা এক সের দুধে দেড় পো জল ঢালছে, বড় বড় মহাজন ঘির সঙ্গে চর্বি মেশাচ্ছে, ডাক্তার দু আনার ওষুধে এক টাকা চার্জ করছে; এমন কি যেখানে টাকা-পয়সার নাম গন্ধও নেই, সেখানেও পুরো মাত্রায় ঠকানো চলছে। এই ধরুন—" বলিয়া পেশকারবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার কেরানী এক ঘণ্টা কাজ করে তো দেড় ঘণ্টা ঘুমোয়।" পেশকার তখন চেয়ারে বসিয়া ঢুলিতেছিল। উকিল-মোক্তারেরা হাসিয়া উঠিল। হাকিম কষ্টে হাসি চাপিয়া ও ফরিয়াদী পক্ষের বক্তৃতা শুনিয়া দুই দিন পরে রায় দিবেন বলিলেন।

কিষণলাল জামিনে খালাস ছিল। পরদিন হাকিমবাবু ডাকে একখানি চিঠি পাইলেন, তাহাতে ওই মকদ্দমার ফরিয়াদী হরবংশ-বাবু লিখিতেছেন যে, কয়েক দিন পূর্বে তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে কিষণলাল খুব সম্ভ্রান্তবংশের লোক ও তাহার পিতা অসহযোগ-আন্দোলনের সময় গভর্মেণ্টের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এ সমস্ত কথা আগে জানিলে তিনি হয়তো কিষণলালের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিতেন না; যাহা হউক, যখন মকদ্দমার শুনানি শেষ

হইয়া গিয়াছে, যদি কিষণলালের একান্তই সাজা হয় তাহা হইলে উল্লিখিত বিষয় বিবেচনায় তাহার সাজা যত দূর সম্ভব কম হইলে তিনি অত্যন্ত সুখী হইবেন। বলা বাহুল্য, 'বুদ্ধিমান' হরবংশবাবুর নামাঙ্কিত চিঠির কাগজে ঐরূপ টাইপ করিয়া হাকিমের উপর প্রয়োগ করিল।

যথাসময়ে মকদ্দমার রায় বাহির হইল। প্রত্যেক মকদ্দমায় কিষণলালের তিন মাস মাত্র জেল হইল; কিন্তু দণ্ডভোগ একসঙ্গে হইবে অর্থাৎ মোটের উপর তিন মাস।

জেল হইতে খালাস হইয়া বাড়ি গিয়া কিষণলাল স্ত্রীকে বলিল, "বুদ্ধির জোরে এবারও কতকটা বেঁচে গেছি, কিন্তু এ পথে আর না। যে টাকা রোজগার করেছি, তাতে তোমার কিছুদিন চলবে। আমি কোথাও গিয়ে যা হয় একটা কিছু জুটিয়ে নেব।"

নবীনগরের জমিদার রামশরণবাবুকে হরবংশবাবু যে চিঠিখানি লিখিয়া কিষণলালের হাতে দিয়াছিলেন, সে তাহা বাহির করিল ও খামের ভিতর হইতে চিঠিখানি লইয়া তাহার পরিবর্তে হরবংশবাবুর চিঠির কাগজে টাইপ করা আর একখানি চিঠি রাখিয়া দিল। তাহাতে হরবংশবাবু লিখিতেছেন যে, কিষণলাল তাঁহার খুব নিকট-আত্মীয়। তাহার হাতের লেখা খুব ভাল ও সে খুব ভাল টাইপ করিতে পারে (এটা সত্য কথা); অতএব তাহার সুবিধামত একটি চাকুরির ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিলে তিনি অত্যন্ত সুখী হইবেন। এই চিঠি লইয়া কিষণলাল রামশরণবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল ও তাঁহার সুপারিশে স্থানীয় হাই-স্কুলে কেরানীর কাজ পাইল।

পাঁচ-ছয় মাস খুব মনোযোগের সহিত কাজ করায় হেডক্লার্কবাবু তাহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট। এই সময় হেডক্লার্কবাবুর শরীর খারাপ

হওয়ায় তিনি ছয় মাসের ছুটি লইলেন ও কিষণলালকে তাঁহার স্থানে কাজ করিতে দিয়া গেলেন।

ছেলেদের মাহিনা আদায় করা হেডক্লার্কের প্রধান কাজ। কিষণলাল এমন আগ্রহের সহিত কাজ আরম্ভ করিল যে, প্রথম মাসেই প্রায় সমস্ত বাকি টাকা আদায় হইয়া গেল। দ্বিতীয় মাসেও খুব ভাল আদায় হইল। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে সে ছাত্রদের বাড়ি গিয়া মাহিনা আদায় করিতে লাগিল। কর্তৃপক্ষ তাহার কাজ দেখিয়া খুব খুশি। কিষণলাল মনে মনে হাসিল। ভাবিল, "অদ্ভুত পরিবর্তন!" কিন্তু বুদ্ধির পরিচালনা করিতে না পাবায় তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিল। ভাবিল, প্রত্যেক মাসে অনেকগুলা টাকা হাতে আসিয়া তখনই বাহির হইয়া যায়। কিছু টিপিয়া রাখিলে মন্দ কি? তারপর ভাবিল, নাঃ, ওটা ঠিক নয়; ও-কাজ তো যে-সে করিতে পারে,—উহাতে আর বাহাদুরি কি আছে?"

ইহার চার-পাঁচ দিন পরে ঐ জেলার জমিদার ও অন্যান্য ভদ্রলোকগণ স্কুলের হেডমাস্টারের স্বাক্ষরিত পত্র পাইলেন যে, স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকে সারনাথের স্তূপ ইত্যাদি দেখাইতে লইয়া যাওয়া হইবে, অতএব তাহার ব্যয়নির্বাহের জন্য কিছু অর্থসাহায্য আবশ্যক; যিনি যাহা দিবেন, হেডক্লার্কের নামে পাঠাইয়া দিবেন।

ক্রমশ তাঁহাদের প্রেরিত চাঁদা আসিতে লাগিল। 'বুদ্ধিমান' টাকাগুলি পকেটস্থ করিয়া কয়েক দিন পরে স্ত্রীর নামে একটা মোটা রকমের ইন্‌সিওর চিঠি পাঠাইল। ভাবিল, দিন কতক পরে কতকগুলা ছেলেকে কোথাও লইয়া গিয়া পিক্‌নিক্ করিয়া আসিলেই হইবে। এখনও তো হেডক্লার্কের ফিরিতে দেরি আছে; কোন রকমে সামলাইয়া লইব।

কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে হেডক্লার্ক পাঁচ-সাত দিনেব মধ্যেই ফিবিল। তখনও চাঁদাব টাকা আসিতেছে। ঐরূপ একটা মনিঅর্ডাব হেডক্লার্কেব হাতে পডায তিনি প্রথমে কিছু বুঝিতে পাবিলেন্ না। তাবপব কিষণলালকে জিজ্ঞাসা কবাতে সে সত্য কথা সমস্তই প্রকাশ কবিল। হেডক্লার্ক বলিল, "তুমি কাজটা ভাল কব নি। স্কুলেব কর্তৃপক্ষকে আমি না জানিয়ে পাবব না। তবে আমি এক বকমে সেবে নিতে পাবি যদি তুমি টাকাটা দিযে দাও। তা হ'লে যাদেব টাকা তাদেব ফেবত দেওয়া যাবে আব বলা যাবে যে, আব সাবনাথ যাওযা হ'ল না।"

লব্ধমুদ্রা উদ্গীবণ কবা কিষণলালেব নীতিশাস্ত্রেব বাহিবে। সে একটু মাথা চুলকাইযা বলিল, "বডবাবু, টাকাটা তো সৎকাজে লাগিয়েছি। সামান্য মাইনেতে কুলোয না। ছেলেপুলে না খেযে মাবা যায। এ বকমে কিছু উপার্জন কবা ছাডা আমাব আব অন্য উপায় নেই। যদি বডলোকদেব কাছে গিযে বলি যে, আমাব সংসাবে বডই কষ্ট, দুটো টাকা দিযে সাহায্য করুন, তা হ'লে কেউ এক পযসা দেবে না, অথচ তাঁবা এই বকম ব্যাপাবে, অর্থাৎ ছাত্রদেব আনন্দ ভ্রমণ, এক ঘণ্টায ছয় মাইল সন্তবণ, বাইসিকেলেব উপব বসিযা সাত বাত্রি জাগবণ, ইত্যাদিতে নাম কেনাব জন্য অকাতবে মুক্তহস্ত।"

বডবাবু কিষণলালেব পূর্ব ইতিহাস জানিতেন না; ভাবিলেন, হয়তো খুব অভাবে পডিযাই সে এই কাজ কবিযা বসিয়াছে। বলিলেন, "যা হোক, তুমি কাজটা খুব খাবাপ কবেছ। আমি দেখি কোনও বকমে সেবে নিতে পাবি কি না। কিন্তু তোমাব এখানে আব কাজ কবা হবে না; তোমাকে নিযে আমি বুড়োবযসে কোন্‌দিন কি বিপদে পডব।"

কিষণলালেরও কেরানীগিরি চাকরিতে আর মোহ ছিল না, এবং সে চাকরি ছাড়িয়া সরিয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে হেডমাস্টার ইতিপূর্বেই এই ব্যাপার জানিতে পারিয়াছিলেন ও কিষণলাল রামশরণবাবুর লোক বলিয়া তাঁহার কানেও ইহা তুলিয়াছিলেন। রামশরণবাবু হরবংশবাবুকে পত্র লিখিয়া জানিলেন যে, কিষণলাল তাঁহাকে ঠকাইয়াছে। তিনি পুলিসে সংবাদ দিলেন ও যথারীতি বিচার হইয়া কিষণলালের ছয় মাস জেল হইল।

জেলখানায় গিয়া কিষণলাল প্রকাশ করিল যে, সে খুব ভাল লেখাপড়া ও টাইপের কাজ করিতে পারে (কথাটা মিথ্যা নহে)। ক্রমশ জেলারবাবুর নজর তাহার উপর পড়িল ও সে লেখাপড়ার কাজ পাইতে লাগিল। জেলারবাবু তাহার কাজে খুব খুশি, এবং সেই সূত্রে অন্যান্য বিষয়েও তাহার অনেকটা সুবিধা হইল। এই সময় বিহারে ভূমিকম্প হইল ও জেলখানা ভাঙিয়া যাওয়ায় কতকগুলি কয়েদীকে সময়ের পূর্বেই গভর্মেণ্ট মুক্তি দিলেন। 'বুদ্ধিমান' সেই সঙ্গে মুক্তি পাইল।

বাড়ি ফিরিতেই গৃহিণী চোখের জলে বুক ভাসাইয়া কিষণলালের হাত দুইটি ধরিয়া বলিল, "দেখ, যা হবার তা হয়ে গেছে। আর তুমি কোথাও যেতে পাবে না। এই শহরেই যা পার কিছু একটা কর। তোমার কিছু পৈতৃক জমিজমাও তো আছে, তাতেই এক রকম ক'রে চ'লে যাবে।"

কিষণলাল গম্ভীরভাবে বলিল, "যদি সে বুদ্ধিটা প্রথম থেকে তোমার মাথায় উঠত, তা হ'লে আর আমাকে এত বুদ্ধি খরচ করতে হ'ত না। যা হোক, যখন তুমি বলছ, কিছুদিন না হয় তোমার বুদ্ধিতেই চলি।"

একটি পুরাতন টাইপ-রাইটার কিনিয়া কিষণলাল স্থানীয় মুনসেফী

আদালতে দলিল-লেখকেব কাজ আরম্ভ করিল। তাহার স্বভাব ভাল না হইলেও, সে পূর্বে ঐ আফিসে কাজ করিয়াছিল বলিয়া হাকিমবাবু দযা কবিয়া তাহাকে অনুমতি দিলেন। নকল কবিবাব কাজ কিছু কিছু পাইতে লাগিল বটে, কিন্তু দলিল ইত্যাদি লেখায় তাহাব অভিজ্ঞতা না থাকায, সেদিকে কোনও সুবিধা হইল না। যাহা হউক, চাব-পাঁচ মাস এই বকমে চলিযা গেল ও সংসাবেও বিশেষ কোন কষ্ট ছিল না, কেন না গৃহিণী নিজেব কথা বাখিয়া চলিতেছিলেন।

কিন্তু কিষণলাল এ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে কেমন কবিযা? মাঝে মাঝে তাহাব বুদ্ধি খোঁচা মাবিতে লাগিল। সে দেখিল, হিন্দী-জানা পুবাতন মুহুবীবা দলিল লিখিয়া বেশ উপার্জন কবিতেছে, অথচ সে পাস-কবা মুহুবী, তবু তাহাব কাছে কেহ দলিল লিখাইতে আসে না। ইহা তো সহ্য কবা যায না।

এবাব বুদ্ধিমান 'অতিবুদ্ধি' চালাইল। মুনসেফবাবুব অফিস হইতে কযেকখানি ছাপা চিঠিব ফম কোন প্রকাবে হস্তগত কবিযা তাহাব একখানিতে টাইপ কবিযা ও মুনসেফবাবুব সহি জাল কবিযা জেলাব জজ-সাহেবকে লিখিল যে, এখানে এখন শিক্ষিত মুহুবী কযেকজন থাকিযা বেশ কাজ কবিতেছে, অতএব অন্যান্য স্থানে যেমন হইযাছে এখানেও সেই বকম সুদক্ষ ও শিক্ষিত অর্থাৎ অন্তত ম্যাট্রিক পাস মুহুবী নির্বাচিত কবিযা তাহাদিগকে লাইসেন্স দেওযাব আদেশ দেওযা হউক।

বুদ্ধিমান মনে কবিযাছিল যে, পত্র পাইযাই জজ-সাহেব সেইরূপ কিছু একটা হুকুম পাঠাইযা দিবেন; কিন্তু তাহাব দুরদৃষ্টক্রমে তাহা হইল না। প্রথমত ইহাব অল্পদিন পূর্বে মুনসেফবাবুব সহিত জজ-সাহেবের এ বিষযে আলোচনা হইযাছিল ও মুনসেফবাবু বলিযাছিলেন

যে, সেরূপ শিক্ষিত মুহুরীর সংখ্যা খুবই কম; সুতরাং লাইসেন্সের নিয়ম চালাইলে কাজের অত্যন্ত অসুবিধা হইবে। দ্বিতীয়ত মুনসেফবাবুর সহিটা দেখিয়া তাঁহার যেন কেমন সন্দেহ হইল ও চিঠিখানাতে ইংরেজী ভুলও দুই-চারিটা ছিল, কারণ 'বুদ্ধিমানের'র ম্যাট্রিক পাসের বিদ্যায় আর কতদূর কি হইবে! জজ-সাহেব মুনসেফবাবুকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতে লিখিলেন।

কয়েকদিন পরে একটি ভদ্রলোক মালিপুরে আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন মুহুরীর নিকট দলিলের নকল টাইপ কবাইতে আরম্ভ করিলেন। 'বুদ্ধিমান'ও তাঁহার দুই-একখানা নকল টাইপ করিয়া তাহাতে নাম সহি করিয়া দিল।

ইহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে অতি প্রত্যুষে কিষণলালের বাড়ির চারিদিকে পুলিস দেখা দিল ও যথারীতি খানাতল্লাশি কবিয়া তাহার বাক্স হইতে কয়েকখানি হাইকোর্টের ও মুনসেফী আদালতেব চিঠিব ফর্ম, ম্যাট্রিক পাস করা মুহুরীদের নামের তালিকা ও অন্যান্য কয়েকটি জিনিস হস্তগত করিল।

কিষণলাল গ্রেপ্তার হইয়া যাইবার সময় গৃহিণীর সজল নয়ন দেখিয়া বলিল, "কিছু ভেবো না। ঠিক কেটে বেরিয়ে আসব।"

গৃহিণী কাঁদিয়া বলিল, "আবার বুঝি বুদ্ধি চালিয়েছিলে?"

কিষণলাল বলিল, "একটু।"

থানায় আসিয়া উল্লিখিত ভদ্রলোক কিষণলালকে বলিল, "বুদ্ধিমান, এবার আর তোমার অল্পে নিষ্কৃতি হবে না। জজ-সাহেবের চিঠিখানির টাইপ যে তোমার কলের ও সহিটি যে তোমার হাতের লেখা, তা বেশ পরিষ্কার প্রমাণ হয়েছে। অনেক দিন শ্রীঘর বাস করতে হবে।"

কিষণলাল ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তা এখন কেমন ক'রে বলব? তবে আমার মত লোককে জেলখানায় আটকে রাখবার জন্যে কেন যে আপনারা এত ব্যস্ত তা বুঝতে পারি না। যদি 'বুদ্ধিমান'কে শোধরাতে হয়, তা হ'লে তার জন্য Craniotomyর ব্যবস্থা করতে হবে,—অর্থাৎ এই উর্বর মস্তিষ্কটি বার ক'রে নিয়ে তার জায়গায় একটি গাধার মস্তিষ্ক বসিয়ে দিতে হবে।"

দস্যু-সর্দার

১

অনেক দিন আগেকার কথা বলিতেছি। তখন বর্ধমান ও হুগলী জেলার ভাগীরথী-তীরবর্তী অঞ্চলে ডাকাতির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। কোনও অবস্থাপন্ন পরিবার তখন নিশ্চিন্ত মনে রাত্রে ঘুমাইতে পারিত না। ডাকাতি শুনিলেই লোকের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত, এবং ডাকাতির সময় গ্রামশুদ্ধ লোক একত্র হইলেও প্রায়ই কেহ ডাকাতদের সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহস করিত না। তাই মুষ্টিমেয় লোক দুই-একখানা পুবাতন তলোয়ার বা বর্শা, কিংবা কতকগুলা লাঠি বা গাছের ডাল ভাঙিয়া আনিয়া এবং গ্রামবাসীদের ভীরুতা ও ঐক্যহীনতার সুযোগ লইয়া বড় বড় গ্রামে বহু লোকের সম্মুখেও অবলীলাক্রমে ডাকাতি করিয়া চলিয়া যাইত।

গ্রামে গ্রামে ডাকাতি হয়, পুলিস আসে, তদন্ত করে, আসামী চালান দেয়; কখনও কখনও আসামীদের বিচার হইয়া দণ্ড হয়; কিন্তু ডাকাতি বন্ধ হয় না। কত দারোগা ইন্সপেক্টর আসিল, গ্রামে গ্রামে কত ফাঁড়ি বসিল, বড বড় ডাকাতদেব দরজায় পাহারার বন্দোবস্ত হইল, কিন্তু ডাকাতির সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল। লোকের ধনপ্রাণ রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল।

বিজয়া-দশমীর রাত্রে মহাদেবপুরের শ্রীকান্ত মুখুজ্জের বাড়িতে ডাকাত পড়িল। ডাকাতেবা মশাল জ্বালিয়া, লাঠি ঘুরাইয়া, ডাক-হাঁক ছাড়িয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিল এবং তাহাদের অভ্যস্ত প্রথামত লুটপাট আরম্ভ করিল। শ্রীকান্তের বিধবা পত্নী তাহার শিশুপুত্র সহ যে ঘরে ছিল,

তিন-চার জন ডাকাত সেই ঘরে ঢুকিয়া বাক্স ভাঙিয়া মেঝে খুঁড়িয়া শ্রীকান্তের সঞ্চিত অর্থের সন্ধান করিল। কিন্তু কোথাও কিছু না পাইয়া ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিল।

একজন ডাকাত শ্রীকান্তের স্ত্রীকে বলিল, "তোর স্বামী পুলিসের গোয়েন্দাগিরি ক'রে অনেক টাকা পেয়েছিল ; কোথা রেখেছিস বল্, নইলে পুড়িয়ে মারব।" এই বলিয়া জ্বলন্ত মশাল তাহার দিকে আগাইয়া দিতেই আর একজন ডাকাত বলিল, "ওকে পুড়িয়ে মারলে তো টাকার সন্ধান পাওয়া যাবে না, তার চেয়ে ওর ছেলেটাকে পুড়িয়ে মারা যাক—সর্দারের সেই হুকুম।"

মা তখন সপ্তমবর্ষীয় বালককে বুকে চাপিয়া ধরিয়াছে। চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "বাবা, তোমরা আমার ধর্মবাপ, মারতে হয় আমাকে মেরে ফেল, আমার ছেলেকে মেরো না। তোমাদের পায়ে ধরি বাবা।"

ভয়ে, উদ্বেগে, পুত্রস্নেহে রমণী তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্যা, লজ্জা-সঙ্কোচের বাহিরে। অবগুণ্ঠন খুলিয়া কাতর সাশ্রুনয়নে সে একজন ডাকাতের দিকে চাহিল ও তাহার পায়ে ধরিবার উপক্রম করিতেই আর একজন দস্যু তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়াই বলিল, "তোর ছেলেকে মারব না, যদি তুই—"

. কিন্তু তাহার কথা শেষ হইল না। সেই মুহূর্তেই একজন দীর্ঘাকৃতি সুগঠিত-দেহ প্রৌঢ় প্রকাণ্ড এক বর্শা হস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকিতেই দস্যু চমকিয়া উঠিল। জ্বলন্ত মশালের আলোতে তাহার চক্ষুর লালসাময় দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়াই প্রৌঢ় বজ্রগম্ভীর স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "সিকদার!" দস্যু কাঁপিয়া উঠিল। তাহার হাতের মশাল পড়িয়া গেল।

"আচ্ছা, এর বিচার পরে হবে।" বলিয়া প্রৌঢ় রমণীর দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ, তোমার মত নিঃসহায় বিধবার বাড়িতে আমি ডাকাতি করি না। কিন্তু তোমার স্বামী তিন মাস আগে যদি মারা না যেত, তা হ'লে আমি বোধ হয় এতদিন ফাঁসিকাঠে ঝুলতাম। আমার বড় দুঃখ যে এই বর্শা আজ আমি তার বুকে বসাতে পারলাম না। বিশ্বাসঘাতক! নেমকহারাম।"

মৃত স্বামীর নিন্দায় রমণীর চক্ষু ক্ষণতরে জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "বাবা, আমার স্বামী তো গিয়েছেন, তুমি দয়া ক'রে আমার ছেলেটির প্রাণ-ভিক্ষা দাও। আমার টাকাকড়ি যা কিছু আছে, সব তোমাকে দিচ্ছি।"

প্রৌঢ় বলিল, "শুধু তোমার টাকা নিলে তোমার স্বামীর বিশ্বাস-ঘাতকতার উপযুক্ত দণ্ড হবে না। সে যেমন ডাকাতকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল, আমি তেমনই এমন দণ্ড দেব যে তার আত্মা পরলোক থেকে তা দেখে শিউরে উঠবে।" এই বলিয়া সে বালককে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল।

রমণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া "বাবা, আমার ছেলেটিকে রক্ষা কর" বলিয়া তাহার পায়ে পড়িবার উপক্রম করিল।

প্রৌঢ় সেই সুন্দর বালকের সুগঠিত দেহের দিকে নিবিষ্ট চিত্তে একবার চাহিল। তারপর রমণীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমার ছেলেকে মারব না, যদি তুমি—" বলিয়াই বালকের দিকে আর একবার চাহিল।

রমণীর সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, এও যে সেই কথাই বলে! কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিল যে, সে চক্ষুতে লালসা নাই, আছে শুধু দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্য।

"যদি তুমি তোমার ছেলেটি আমাকে দাও।" বলিয়াই প্রৌঢ় ছেলেটির দিকে আর একবার চাহিল।

রমণীর চক্ষু মুহূর্তের জন্য হর্ষোজ্জ্বল হইল, কিন্তু পরক্ষণেই ম্লান হইয়া জলে ভরিয়া উঠিল। বলিল, "আমি গরিব বিধবা। এই ছেলেটিই আমার একমাত্র সম্বল। একে নিয়ে তোমার কি হবে বাবা? দোহাই তোমার!"

"ছেলে নিয়ে কি হবে? ওকে ডাকাতি করতে শেখাব। তোমার স্বামী যেমন ডাকাতদের সর্বনাশ করবার চেষ্টা করেছিল, তার ছেলে হবে ডাকাতের সর্দার—উপযুক্ত দণ্ড। কেমন, রাজী আছ?"

রমণী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া আবার তাহার দিকে চাহিল, আবার তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল যে, প্রৌঢ়ের কঠোরতার অন্তরালে কোথায় যেন একটু অনুকম্পার আভাস প্রচ্ছন্ন আছে। সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, "তোমার পায়ে ধরি বাবা, ব্রাহ্মণের ছেলেকে ও-পথে নিও না। মহাপাপ!'

প্রৌঢ়ের উজ্জ্বল চক্ষু ক্ষণতরে আরও জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাকে সংযত করিয়া একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, "যে ব্রাহ্মণ ডাকাতদের কালীপূজো করত, আর সেই সুযোগ পেয়ে তাদের সর্বনাশ করবার যোগাড় করেছিল, তার ছেলে ডাকাতি করলে বিশেষ কোন দোষ হবে না। তোমার সঙ্গে তর্ক করবার আমার সময় নেই। হয় ছেলেটি আমাকে দাও, নইলে তোমার সামনেই ওকে শেষ ক'রে দিয়ে চ'লে যাই। আমার যে কথা সেই কাজ।"

রমণী তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া বালককে বুকে আঁটিয়া ধরিল। মাতৃত্বের প্রবল প্রেরণায় তাহার দেহ-মনে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলিয়া গেল, বদনমণ্ডলে দৃঢ়তার রেখা ফুটিয়া উঠিল, চক্ষুতে আগুন ছুটিল। কিন্তু

পর-মুহূর্তেই সবই যেন শিথিল হইয়া গেল। তখন যন্ত্রচালিতের মত সে বুক হইতে বালককে ছিঁড়িয়া লইয়া প্রৌঢ়ের পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করিল ও করুণ স্বরে কাঁদিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। বালকও তখন কাঁদিতেছে।

প্রৌঢ় বালককে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি একে নিলুম। এর জন্যে ভেবো না। যতদিন আমার শক্তি থাকবে, এর কোন অযত্ন হবে না। তোমাকে আমি আমার মেয়ের মত দেখব। তোমার কোন অভাব বা বিপদ হবে না।"

রমণী কাঁদিয়া বলিল, "আমি আর ওকে দেখতে পাব না বাবা?"

"পাবে, প্রতি বৎসর এই বিজয়া-দশমীর রাত্রে। এ ছাড়া কোনও দিন একে দেখবার আশা বা চেষ্টা ক'রো না। তোমার টাকাকড়িও আমি সব নিয়ে যাব। টাকা থাকলেই নানা উৎপাত। তোমার স্বামীর যে জমি-জায়গা আছে, তাতেই তোমার বেশ চ'লে যাবে। আমি তার ব্যবস্থা ক'রে দোব।" এই বলিয়া বালকের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তোমার ছেলেব নামটি কি?"

রমণী বলিল, "বিশ্বনাথ।" তারপর কি যেন ভাবিয়া প্রৌঢকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার উপক্রম করিল; কিন্তু ভয়ে তাহা বলিতে পাবিল না।

প্রৌঢ় তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আমাকে কি জিজ্ঞাসা করবে বুঝতে পেরেছি। আমি কে, তা জানতে চাও? আচ্ছা, তোমাকে বলতে আপত্তি নেই।—আমি কেদার ঘোষ।"

নাম শুনিয়াই রমণী শিহরিয়া উঠিল। সেকালে কেদার ঘোষেব নামে ভাগীরথী-তীর কম্পিত হইত। সে নাম তাহার স্বামীর নিকট সে অনেকবার শুনিয়াছিল।

২

তাহার পর পনেরো বৎসর গত হইয়াছে।

বিজয়া-দশমীর সন্ধ্যা। গঙ্গার উভয় কূলে স্থানে স্থানে প্রতিমা-বিসর্জনের বাদ্য, নদীবক্ষে বাচ খেলা, ঘাটে ঘাটে নর-নারীর সমাবেশ তখনও শেষ হয় নাই।

একখানি ছোট নৌকা কালনার ঘাট হইতে ছাড়িয়া গঙ্গার পশ্চিম কূল দিয়া ভাটিতে যাইতেছিল। নৌকায় দুইজন আরোহী ও একজন দাঁড়ি। আরোহীদের মধ্যে একজন নৌকার মধ্যে শুইয়া, ও আর একজন ছইয়ের বাহিরে বসিয়া। যিনি ভিতরে ছিলেন, তাঁহার পরিধানে গেরুয়া কাপড ও আলখাল্লা, গলায় তুলসীর মালা, গায়ে হরিনামের ছাপ; বয়সের অনুপাতে কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় পক্ক দাড়ি; মাথার লম্বা চুল খোঁপা করিয়া বাঁধা। সঙ্গীটিও সেই জাতীয়। কিন্তু বেশভূষার পারিপাট্য অপেক্ষাকৃত কম,—অর্থাৎ কতকটা নিম্নস্তবেব বাবাজী। নবদ্বীপেব নিকটবর্তী অঞ্চলে এরূপ বাবাজীদের গতিবিধি বিরল নহে; অতএব তাহারা কাহারও ঔৎসুক্য উদ্রেক কবে নাই।

শ্রীপুবেব ঘাটে নৌকা পৌঁছিতেই বড বাবাজী বলিল, "মাঝি, আব কত দূর?"

"আর ক্রোশ দুই আছে।" বলিয়া মাঝি ঘাটের দিকে নৌকার মোড় ফিরাইল।

ঘাটে নৌকা লাগিতেই মাঝি ও ছোট বাবাজী কিছু খাদ্যদ্রব্যের সন্ধানে তীরে উঠিল ও নিকটেই একটি মুড়ি-মুড়কির দোকান দেখিয়া তাহাতে ঢুকিল। দোকানদার তখন রাত্রের মত দোকান বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে। দোকানের এক কোণে এক সুন্দরাকৃতি সুগঠিত-দেহ

যুবক এক থালা মুড়কিতে দুধ ঢালিতেছিল। আগন্তুকদ্বয় দোকানে ঢুকিতেই সে একবার তাহাদের দিকে চাহিল, ও ক্ষীণ প্রদীপের আলোকে যতদূর দেখা যায় তাহাদের অবয়বাদি দেখিয়া লইয়া আহারে মন দিল।

মাঝি মুড়ি-মুড়কি চাহিতেই দোকানদার জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাবে গো তোমরা?"

মাঝি বলিল, "মহাদেবপুর।"

শুনিয়াই যুবক যেন একটু চমকিয়া উঠিল ও খাইতে খাইতে বক্রনয়নে উভয়েরই উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মাঝির উত্তর শুনিয়াই বাবাজীর চোখে মুখে বিরক্তির রেখা ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব গোপন করিয়া সে দোকানদারকে বলিল "বাপু, আমাদের দিয়ে দাও, বড় তাড়াতাড়ি।' বলিয়াই সে আড়নয়নে যুবককে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল।

আলখাল্লাধারী বাবাজীর যে কি তাড়াতাড়ি থাকিতে পারে, তাহা যেন স্থূলবুদ্ধি দোকানদারের মাথায় ঢুকিল না; তাই তাহার কথার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ না করিয়া সে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিল যে, তাহারা মহাদেবপুরে কাহার বাড়িতে যাইবে? তখন বাবাজীর ধৈর্য সীমা অতিক্রম করিল। অত্যন্ত বিরক্তির সহিত সে বলিল, "চার পয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনতে এসে অত পরিচয়ের দরকার কি বাবু? দাও। আর এই সিকিটার বাকি পয়সা দাও।" এই বলিয়া সে একটি সিকি দোকানদারের সামনে ছুঁড়িয়া দিল। আর কোন উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়া দোকানদার নিবিষ্ট চিত্তে মুড়ি মাপিতে আরম্ভ করিল।

যুবক আহার শেষ করিয়া ও আর একবার আগন্তুকদিগকে বেশ

করিয়া দেখিয়া পাশের দরজা দিয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল। যাইবার সময় দোকানদারকে ভিতরে আসিবার ইঙ্গিত করিয়া গেল।

দোকানদার সিকিটি দুই-একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিল, "পয়সা তো এখানে নেই,—বাড়িতে আছে। একটু দাঁড়াও, এনে দিচ্ছি।" বলিয়া বাড়ির ভিতর আসিল। আসিবামাত্র যুবক বলিল, "নিমাইদা, কি বুঝলে বল দেখি? আমি এর মধ্যে ঘাটে গিয়ে দেখে এসেছি, একখানা নৌকো আর তার মধ্যে আর একজন বাবাজী।"

"আমার তো ভাল মনে হচ্ছে না ভাই।" বলিয়া দোকানদার একেবারে যুবকের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "স'রে পড়। আজ আর বাঁড়ি গিয়ে কাজ নেই।"

"তা হয় না দাদা, তুমি তো জানই।" বলিয়া যুবক ঘরের ভিতর হইতে একটি পুঁটুলি বাহির করিয়া আনিয়া বলিল, "আমি চললুম। ভাবছি, বাবাজীর নৌকোতেই বাড়ি যাব।"

"সর্বনাশ! বল কি? না জেনে-শুনে সেটা করা কি ভাল হবে?"

"কিছু ভয় নেই দাদা। আর যখন একটা খটকাই লাগল, তখন না দেখে-শুনে বাড়ি যাওয়াটাও তো ঠিক হবে না। আজ তো সকলে মাতাজীকে নিয়ে গঙ্গায় বাচ খেলছে, আমি না হয় বাবাজীকে নিয়েই একটু বাচ খেলি। যদি দেখি বাবাজী বিরূপ, তা হ'লে আজ হয় তাঁর বিসর্জন, না হয় আমার।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে যুবক বাটির বাহির হইয়া গেল।

সঙ্গীদের ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া বড় বাবাজী একটু উদ্বিগ্নভাবে ছইয়ের বাহিরে আসিয়া একবার তীরের দিকে দেখিল, এবং কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তীরে নামিবার উপক্রম করিল। কিন্তু কি যেন ভাবিয়া তখনই ছইয়ের মধ্যে ঢুকিয়া শুইয়া পড়িল। ঠিক সেই

সময় যুবক অতি ধীরে ঘাটে নামিযা যে খোঁটাতে নৌকাটি বাঁধা ছিল তাহাব নিকট আসিল ও খোঁটা হইতে দডিটি খুলিয়া দিযা নৌকায উঠিযা বসিল।

তাহাকে নৌকায উঠিতে দেখিবাই বাবাজী "কে? কে?" বলিযা উঠিযা বসিল। যুবক অত্যন্ত বিনীতভাবে বলিল, "বাবাজী, আপনাব লোকের কাছে শুনলুম যে আপনি মহাদেবপুব যাবেন। আমিও সেই দিকে যাব। আর তো কোন নৌকো দেখতে পাচ্ছি না। দযা ক'বে যদি আপনাব নৌকোয একটু জাযগা দেন—"

"না না, এতে জাযগা হবে না বাপু। তুমি আব কোন নৌকো দেখ। নেমে যাও,—নেমে যাও বলছি।" বলিতে বলিতে বাবাজী ছইযেব বাহিবে আসিবাব উপক্রম কবিতেই যুবক বলিল, "তাই তো, নামি কেমন ক'রে? নৌকো যে চলছে, কাছিটা খুলে গেছে দেখছি।"

বাবাজী অত্যন্ত বিব্রত হইযা বলিল, "অ্যাঁ, কাছি খুলল কেমন ক'বে?"

"কি জানি? জলেব টানে খুলে গেছে বোধ হয। আচ্ছা, দেখি, যদি নৌকো ধাবে লাগাতে পাবি।" বলিযা যুবক দাঁড ধবিযা বসিল।

সে অবস্থায বাবাজী যে কি কবিবে কিছুই ঠিক কবিতে পাবিল না। যুবকের তীক্ষ্ণ চক্ষু তাহাব উদ্বেগ লক্ষ্য কবিল। যুবকও কিঞ্চিৎ উদ্বেগেব ভান কবিযা বলিল, "তাই তো, নৌকোটা তো ফেবাতে পাবলুম না! জলেব টানে যে নদীব ভেতবেই গিয়ে পডছে দেখছি। আপনি দাঁড ধবতে জানেন বাবাজী? পাবেন তো দেখুন।" বলিযা বাবাজীব মুখেব দিকে পুনবায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিল। যুবকেব দাঁড়েব জোবেই নৌকা তথন ভাটিব মুখে ছুটিযা গভীর জলে গিয়া পড়িয়াছে।

বাবাজী আরও বিব্রত হইয়া পড়িল। বলিল, "আরে, তুমি করছ কি? নৌকো যে নদীর মাঝখানে গিয়ে পড়ল! থাম, মাঝিকে ডাক দি।"

"তা দিতে পারেন। কিন্তু মাঝি এখানে আসবে কেমন ক'রে? যা হোক, আপনার কোন চিন্তা নেই। আমি মহাদেবপুরের ঘাটে আপনাকে ঠিক পৌঁছে দোব।"

বাবাজী অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিল, "কে বললে তোমাকে আমি মহাদেবপুর যাব? আমার সঙ্গী প'ড়ে রইল, আর আমি তোমার সঙ্গে চ'লে যাব? আচ্ছা মুশকিলে তুমি ফেললে তো হে!" বলিয়া আর একবার যুবকের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিজের ঝুলিটির দিকে হাত বাড়াইল।

বিদ্যুৎগতিতে যুবক দাঁড় ছাড়িয়া ছইয়ের মধ্যে ঢুকিল ও বাবাজী ঝুলির ভিতর হাত ঢুকাইবামাত্র তাহার ঘাড়ের উপর বাঘের মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। অতর্কিত আক্রমণে বাবাজী একটু বিপর্যস্ত হইল বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া অন্য হাতে যুবকের গলা টিপিয়া ধরিল। বাবাজীর শক্তি ও কৌশল দেখিয়াই যুবক বুঝিল, তাহার অর্ধপক্ক গোঁফ-দাড়ি ও বৈষ্ণবের বেশ কতদূর প্রকৃত। তখন সে বাবাজীর দাড়ি কামড়াইয়া ধরিয়া এক টান দিতেই তাহা খসিয়া গেল।

যুবক বলিল, "বাবাজী, এখন তো বুঝতে পারছি, আপনি কে। আপনি আমাকে না জানলেও আমি আপনাকে দূর থেকে দু-একবার দেখেছি। আর আপনিও বোধ হয় এখন অনুমান করেছেন, আমি কে।"

বাবাজী কেবলমাত্র "হুঁ" বলিয়া জোরে এক ঝাঁকি দিল ও ঝুলির

ভিতর হাত ঢুকাইবার জন্য আর একবার প্রাণপণে চেষ্টা করিল, কিন্তু যুবককে বিন্দুমাত্র টলাইতে পারিল না।

কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর যুবক বুঝিল যে, বাবাজীর শক্তি বড় তাচ্ছিল্যের বিষয় নহে ও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চলিলে কি হয় তা বলা যায় না। তখন সে অদ্ভুত কৌশলে ও অতি ক্ষিপ্রহস্তে নিজের কাপড়ের ভিতর হইতে একটা রুমাল বাহির করিয়া তাহার এক কোণে বাঁধা একটা জিনিস বাবাজীর নাকের উপর টিপিয়া ধরিল। বলিল, "আপনাকে আজ গঙ্গায় বিসর্জন দিতে পারতুম; কিন্তু এ যাত্রায় ব্রহ্মহত্যা করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। এখন অজ্ঞান ক'রে রেখে চললুম। যদি ফিরে এসে আপনাকে দেখতে পাই, তা হ'লে তখন যা হয় করা যাবে।"

বাবাজী তখন ক্রমশ অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছে। তাহারই কাপড় চোপড় ঝুলি হইতে বাহির করিয়া যুবক তাহাকে নৌকার ছইয়ের খোঁটার সঙ্গে শক্ত করিয়া বাঁধিল এবং আর কিছু দূর নৌকা বাহিয়া আনিয়া মহাদেবপুরের ঘাটে লাগাইল।

বাবাজীর ঝুলি হইতে পিস্তলটি বাহির করিয়া যুবক নিজের পুঁটুলির মধ্যে লইল, এবং বাবাজীর নাকের কাছে ও বুকে হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া নৌকা হইতে নামিয়া পড়িল।

তখন দশমীর চাঁদ পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছে। ছোট গ্রাম। একেবারে নিস্তব্ধ। গাছের ঘন ছায়ায় গ্রামের পথ প্রায় অন্ধকার। কিন্তু যুবক অতি পরিচিতের ন্যায় সেই পথ দিয়া চলিল। এইমাত্র যে একটা কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে সে চিন্তার লেশমাত্র তখন তাহার নাই। সে ভাবিতেছিল, এক দরিদ্রা বিধবার স্নেহময় মুখ, যাহার চোখের জলে তাহার প্রশস্ত বক্ষ ক্ষণপরে ভাসিয়া যাইবে।

রাস্তার আর একটা বাঁক ফিরিলেই বাড়ি দেখা যাইবে। তখন যুবক

যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য, যেন যন্ত্রচালিতের মত আপনার লক্ষ্যের দিকেই চলিযাছে। প্রতিপদক্ষেপে যে বিপদ ঘটিতে পারে, সে ধারণা তাহার থাকিলেও যেন কোন মোহের আকর্ষণে তাহার চিরাভ্যস্ত সতর্কতা বিলুপ্ত হইল। ঠিক বাঁকের কাছে আসিতেই পথের ঝোপ হইতে দুই জন লোক একসঙ্গে লাফাইয়া তাহাব পিছনে পড়িল ও আর একজন তাহার সামনে আসিয়া তাহার দিকে পিস্তল ধরিয়া দাঁড়াইল।

অতর্কিত আক্রমণে যুবক চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাসিয়া সম্মুখের লোককে বলিল, "ছোট বাবাজী যে, এরই মধ্যে এতদূর এসে পড়েছ? বাহাদুরি আছে।"

বাবাজী দৃঢ়স্বরে বলিল, "সাবধান বিশ্বনাথ, যদি এক পা এগিয়েছ, তা হ'লে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দোব। পিস্তলটা দাও। তারপর হাত তোল।"

যুবক তখনও ধীর স্থির সহাস্যবদন। পিস্তলটা দিয়া বলিল, "আজ তোমারই জিত বাবাজী। একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, নইলে আমরা মানুষের গন্ধ পাই তা তো জান। তা ছাড়া, আজ আমি অতি সাধুপুরুষ, —কাউকে মারব না, নিজেও মরব না। এখন কি করতে হবে বল?"

"তোমাকে ধরলুম, হাতকড়া দোব, বাধা দিও না। বাবাজী কোথায় আছে বল?"

"আজ বিজয়া-দশমীর রাতটায় থাক্ না হাতকড়াটা। ও তো আছেই। আমি একটা কথা বলি শোন, আমাকে ধরেছ—আমি সেটা স্বীকার ক'রে নিলুম। ঘণ্টাখানেকের ছুটি দাও। বাড়ি থেকে ফিরে আসি। তারপর হাতকড়া-টাতকড়া যে সব তোমাদের দস্তুর আছে ক'রো।"

"পাগল হয়েছ নাকি? তোমাকে ছেড়ে দোব? তা হ'লে আর তোমাকে পাব?"

"সাহস হয় না? আচ্ছা, চল তোমার বড় বাবাজীর কাছে। দেখি, তাঁর সাহস আছে কি না! তিনি ঘাটে নৌকোতে ঘুমুচ্ছেন।"

সকলে ঘাটে আসিয়া দেখিল, বড় বাবাজী নৌকার মধ্যে আলুথালুভাবে পড়িয়া আছেন। দেখিয়াই ছোট বাবাজী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া বলিল, "বিশ্বনাথ, তুমি বাবাজীকে খুন করেছ। তবে যে বললে ঘুমুচ্ছেন?"

"ঘুমুচ্ছেনই তো, দেখ না একটু নেড়ে-চেড়ে।"

নাড়াচাড়া অনেক করা হইল, কিন্তু বাবাজীর ঘুম ভাঙিল না। দেহে প্রাণ আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ অসাড়।

তখন বিশ্বনাথ বলিল, "আচ্ছা, তোমরা একবার নৌকো থেকে নেমে যাও। আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখি। একটু সময় লাগবে, তার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ো না।

ছোট বাবাজী বুঝিল যে, বিশ্বনাথই এই মূর্ছা ঘটাইয়াছে ও তাহার সাহায্য ভিন্ন মূর্ছাভঙ্গের আর উপায় নাই। সে সঙ্গীদিগকে লইয়া নৌকা হইতে নামিতেই বিশ্বনাথ নিজের কাপড়ের ভিতর হইতে একটি ছোট পুঁটুলি বাহির করিয়া তাহা বাবাজীর নাকের উপর টিপিয়া ধরিল। প্রায় তিন-চার মিনিট পরে বাবাজী চোখ খুলিল ও আরও তিন-চার মিনিটের মধ্যে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বিশ্বনাথকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল, "বিশ্বনাথ, আজ তোমারই জিত, এখন কি করবে বল?"*

---

* পাবনা জেলার তদানীন্তন দস্যু-সর্দার 'মোহর খাঁ'র দল মানুষকে অজ্ঞান করিবার ও পুনরায় তাহার জ্ঞানসঞ্চারের জন্য ঐরূপ কয়েক প্রকার দ্রব্য ব্যবহার করিত।

পুঁটুলিটি ও নিজের কাছে আর যাহা কিছু ছিল, তাহা সমস্তই গঙ্গার জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বিশ্বনাথ বলিল, "আপনি ভুল করছেন শ্রীরামবাবু, আজ আপনাদেরই জিত, আমি আপনাদের বন্দী।"

"সে কি? তা কেমন ক'রে হ'ল? তুমি কি নিজে ধরা দিতে চাও?"

"না, সে মতলব বড় ছিল না। কিন্তু আজ আমি ছোট বাবাজীর সাহস ও তৎপরতার কাছে নিজেকে ধরা দিয়েছি। বাঙালীর ছেলের শক্তি আর উপস্থিতবুদ্ধি দেখে বড় আনন্দ হ'ল, তাই বিনা বাধায় ধরা দিলুম। বাধা দিলে কি হ'ত বলা যায় না। যাক, আমার একটা প্রার্থনা আছে, শুনবেন কি?"

"তোমার প্রার্থনা কি, তা আমি জানি। আজ তুমি তোমার মার সঙ্গে দেখা করতে চাও।"

"হ্যাঁ, আমি ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যেই এখানে ফিরে আসব।"

"তোমাকে বিশ্বাস কি?"

বিশ্বনাথ একটু হাসিল। সে হাসির অর্থ এই যে, আধ ঘণ্টা আগে আমি যদি তোমাকে গঙ্গার জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতাম তাহা হইলে তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাস কোথায় থাকিত? কিন্তু সে রকম কথা কিছু সে বলিল না। কেবল স্থিরনয়নে শ্রীরামবাবুর পানে আর একবার চাহিয়া বলিল "আজ যদি আমাকে মার সঙ্গে দেখা করতে না দেন, তা হ'লে আমাকে জীবিত নিয়ে যেতে পারবেন না। এখন দেওয়া না-দেওয়া আপনার হাতে। তবে এটা আপনাকে বলতে পারি যে, আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। আমার সঙ্গে জানাশোনা না থাকলেও আমার কথা তো কিছু কিছু শুনেছেন।"

শ্রীরামবাবু আর একবার বিশ্বনাথের মুখের উপর তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিলেন। সেই ক্ষীণ আলোকেও তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, তাহার তেজোদীপ্ত বদন যেন দৃঢ়তায় আরও উজ্জ্বল, সে চক্ষুতে যেন অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি যেতে পার, কিন্তু আমাদের আইনকানুন জান তো? একেবারে তোমাকে ছেড়ে দিলে আমি আইনের চক্ষে অপরাধী হব, তাই যোগেন তোমাব সঙ্গে যাবে। তবে আমি তাকে ব'লে দিচ্ছি যে, সে যেন তোমার বাড়ির ভেতর না যায়। কেমন? তা হ'লেই হবে তো?"

তখন দশমীব চাঁদ অস্ত যাইতেছে। বিশ্বনাথ ও যোগেন অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

৩

গঙ্গাতীববর্তী ডুমুবদহের জঙ্গলে কেদার ঘোষেব দলের প্রধানবা একত্রিত হইয়াছে। কোন বিশেষ পবামর্শ কিংবা দলেব কোন প্রধানের বিচারের জন্য দলপতি এইরূপ বৈঠক আহ্বান করিত। প্রত্যেক প্রধান আপনার অধীনস্থ দস্যুদের শিক্ষা, পরিচালনা ও শাসনের জন্য দায়ী থাকিত। কিন্তু কোন প্রধান নিজে কোন অপরাধ কবিলে দলপতি অন্য প্রধানদের সহযোগে তাহার বিচার করিত। আজ দ্বিতীয় নায়ক সিকদারের বিচাব।

পূর্ণিমার রাত্রি। কিন্তু চাঁদ ঘন মেঘে ঢাকা। জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া আছে। সেই অন্ধকারে নিবাক, নিশ্চল প্রধানের দল সর্দারের চারিদিকে পাথরের মূর্তির ন্যায় উপবিষ্ট। কেদার এখন প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে; কিন্তু তাহার ঋজু দীর্ঘ দেহ এখনও যুবার ন্যায় বলিষ্ঠ, চক্ষুতে এখনও অসাধারণ দীপ্তি, মুখে অপরূপ গাম্ভীর্য।

ইঙ্গিত পাইবামাত্র দুই জন দস্যু সিকদারকে উপস্থিত করিল। তাহার হাত ও চোখ বাঁধা। চোখ বাঁধিবার উদ্দেশ্য এই যে, অপরাধী জানিতে পারিবে না যে কোন্ কোন্ প্রধান তাহার বিচার করিতেছে।

সিকদারকে দেখিবামাত্র কেদারের চক্ষু মুহূর্তের জন্য ধকধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, কপালের শিরা স্ফীত হইল, হাতের মুষ্টি আপনা হইতেই বদ্ধ হইয়া আসিল। জলদগম্ভীর স্বরে বলিল, "সিকদার! বিজয়া-দশমীর রাত্রে বিশুকে রক্ষা করবার ভার ছিল তোমার ওপর। কিন্তু সে আজ কালনার জেলে। তোমার কিছু বলবার আছে?"

সিকদার নিরুত্তর। সে জানিত, বাজে কথায় কেদার ঘোষ ভুলিবার পাত্র নয়, বরং তাহাতে আরও অনিষ্ট হইবে।

কেদার আবার চীৎকার করিয়া বলিল, "বল্, তুই তখন কোথায় ছিলি, যখন বিশু 'ইযে'র দোকানে ঢুকেছিল?"

"আমি একটু তফাতে ছিলুম।"

"একটু তফাতে ছিলি, না, গোয়েন্দাকে খবর দেবার জন্যে কালনা গিয়েছিলি?"

সিকদার কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করিয়া বলিল, "না, আমি খবর দিই নি।"

"হ্যাঁ, দিস নি সেটা ঠিক। গোয়েন্দা তার আগেই বেরিয়ে পড়েছিল। যদি দিতিস, তা হ'লে আজ আর তোর এমন ক'রে বিচার হ'ত না। এতক্ষণ তোর লাশ গঙ্গায় ভেসে হুগলী চ'লে যেত। বেইমান, নেমকহারাম! আমার বুকের বড় পাঁজরাখানা খ'সে গেছে, তা বুঝতে পারছিস?"

তারপর প্রধানদের দিকে চাহিয়া বলিল, "দোষী, কি, নির্দোষী? হাত তোল।"

সকলেই হাত তুলিয়া জানাইল যে, আসামী দোষী।

"আমরা তোকে দোষী সাব্যস্ত করলুম। তোর উপযুক্ত দণ্ড কি জানিস?" বলিয়াই কেদার নিজের দীর্ঘ হাত বাড়াইয়া দিল, "এই হাতের একটি চড় তোর গালে,—দুটোর দরকার হবে না।"

সিকদার শিহরিয়া উঠিল ও করুণাভিক্ষার উদ্দেশ্যে আপনার বদ্ধ হস্ত কপালে ঠেকাইল। তখন কেদারের অগ্নিবর্ষী নয়ন যেন কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া আসিয়াছে, বলিল, "হাঁ, এই তোর প্রথম গুরুতর অপরাধ, তাই তোকে মাপ করতে পারি; কিন্তু এক শর্তে—যদি বিশুকে তিন দিনের মধ্যে আমার সামনে হাজির করতে পারিস। কেমন, পারবি?"

"হ্যাঁ, পারব।"

৪

কালনা জেলে শ্রীরামবাবু বিশ্বনাথের সহিত দেখা করিলেন। বলিলেন, "বিশ্বনাথ, তোমার সঙ্গে আমার তো একরকম সন্ধি হয়ে গেছে। আমি যেমন তোমাকে বিশ্বাস করেছিলুম, তুমিও তেমনি আমাকে বিশ্বাস করতে পার।"

বিশ্বনাথ ঈষৎ হাসিল। সে হাসির অর্থ বুঝিতে প্রবীণ ডিটেকটিভের বিলম্ব হইল না। বলিলেন, "না, সেটা ভেবো না। অনেক চোর-ডাকাতের সঙ্গে অনেক ভাবে কথা বলেছি; কিন্তু তোমাকে যা বলব তার মধ্যে সন্দেহ করবার কিছু থাকবে না। তোমার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাতে আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। মনে ক'রো না, তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ ব'লে আমি এসব কথা বলছি। মোটেই না।

তোমাকে আমার সত্যি সত্যিই ভাল লেগেছে, মনে হয় এখনও এ পথ ছাড়লে তুমি মানুষ হতে পার। ডাকাতি তো এই বয়সে অনেক করেছ, আর কেন ?"

বিশ্বনাথ আবার হাসিল, এবার কিন্তু সন্দেহের হাসি নয়, মধুর—প্রাণখোলা হাসি। বলিল, "ইন্সপেক্টরবাবু, আপনাব সঙ্গে যখন আমার সন্ধি হয়েছে, তখন দু-একটা কথা বললে রাগ করবেন না তো ?"

"না, রাগ করব না। তুমি বল।"

"আমি বলি, আপনিও এ পথ ছেড়ে দিন। ডাকাত তো অনেক ধরেছেন, আর কেন ?"

শ্রীরামবাবু চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার উপদেশের এরূপ উত্তর তিনি আশা করেন নাই। বলিলেন, "আমরা এ পথ ছেড়ে দিলে যে তোমাদেব পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

"আপনাবা ছেড়ে না দিয়েই আর কতটা আগলাচ্ছেন ? একটা বিশ্বনাথ, কি তিনটে রঘুনাথকে জেলে পাঠালেন। কিন্তু তাতে কি ডাকাতি বন্ধ কবতে পারবেন ? তখনই দেখবেন, তাদেব জায়গায় দশটা বিশ্বনাথ আব বিশটা রঘুনাথ দাঁড়িয়েছে। শুধু শুধু কেন পণ্ডশ্রম করছেন ?"

"তাব আব উপায় কি বল ?"

"উপায় আছে বইকি। রোগেব গোড়া খুঁজে সেখানে ওষুধ দিন। আপনারা তো ডাকাতদের কোন কালে বিশ্বাস করলেন না,—তাদের চিরকাল তাড়িয়েই নিয়ে বেড়ালেন। তাদের একটু সুনজরে দেখতে শিখুন, তাদেরই সঙ্গে পরামর্শ করুন,—অনেক উপায় বেরিয়ে যাবে।"

শ্রীরামবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তা হবে। তোমার সঙ্গে সে

বিষয়ে পরে পরামর্শ করব। এখন যা বলি শোন। তুমি বামুনের ছেলে হয়ে এ রকম ক'রে ডাকাতি কর কেন?"

"আপনি বামুনের ছেলে হয়ে ডাকাত ধরেন কেন? এ তো আপনার পেশা হওয়া উচিত নয়। বামুনের ছেলে,—গঙ্গাস্নান করবেন, চণ্ডীপাঠ, পূজো-আচ্চা—"

"হ্যাঁ, তা বটে। কিন্তু তোমার মত তো চুরি-ডাকাতি করি না।"

ঈষৎ ঝঙ্কার দিয়া বিশ্বনাথ বলিল, "চুরি কখনও করি নি ইন্সপেক্টরবাবু। ও বদনাম দেবেন না। তবে, হ্যাঁ, ডাকাতি করি, শরীরে শক্তি আছে, সেটাকে কাজে লাগাই।"

"বেশ কাজ তো, লোকের লুটে-পুটে নেওয়া!"

"তাতে আর এমন কি দোষ হ'ল? জানেন তো আমরা যার-তার ঘরে ঢুকি না। ভগবান যাকে দরকারের চেয়ে বেশি দিয়েছেন, আমরা তার কাছ থেকে আর তার চোখের সামনে থেকে সেই বেশিটার কিছু নিয়ে পাঁচটা গরিব প্রতিপালন করি। ব্যারাম হ'লে লোকে পয়সা খরচ করে না? ভূমিকম্প হ'লে, ঘরে আগুন লাগলে লোকের ক্ষতি হয় না? ধ'রে নেন ডাকাতিও সেই রকম একটা দৈব দুর্ঘটনা,—কখনও কখনও কারুর ঘাড়ে পড়ে। একটা লোকের বাড়িতে কবার ডাকাতি হয়? কিন্তু আর পাঁচ রকম দুর্ঘটনা প্রত্যেক বাড়িতে তো লেগেই আছে। কেন শুধু শুধু আপনারা এত মাথা ঘামিয়ে মরেন?"

এ যুক্তির ভিতর যে কতখানি ভুল আছে তাহা শ্রীরামবাবু বিশ্বনাথকে বুঝাইতে পারিতেন; কিন্তু তাহার এ সময় নয়। ইহার উত্তর দিতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহার মুখে কিঞ্চিৎ বিরক্তির আভাস ফুটিয়া উঠিল। বিশ্বনাথ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "রাগ করবেন না

বাবু। আমি তো আগেই বলেছি। আচ্ছা, আমি ডাকাতি কেন করি শুনবেন? দেশের লোককে শিক্ষা দেবার জন্যে।”

এবার শ্রীরামবাবু হাসিলেন, বলিলেন, “শিক্ষা! ডাকাতি ক’রে কি শিক্ষা দাও হে বিশ্বনাথ?”

“হাসির কথা নয় বাবু। আচ্ছা, বলুন দেখি এ রকম ডাকাতি সাহেবদের দেশে হয় কি না?”

“না, তা হয় না।”

“কেন হয় না? তার কারণ তারা বিপদের সময় পরস্পরকে সাহায্য করে। তাদের শক্তি আছে, একতা আছে, তারা অস্ত্রশস্ত্র রাখে। কাজেই জোর ক’রে একটা লোকের বাড়িতে ঢুকে লুটপাট করা অসম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশের লোক পাশের বাড়িতে ডাকাতি হ’লে নিজের বাড়ির দরজায় খিল দেয়। বন্দুক থাকলে তখন তার টোটা খুঁজে পায় না—”

“ঠিক বলেছ বিশ্বনাথ।”

“তাই আমার মত ডাকাত দু-দশটা থাকা দরকার, যদি ডাকাতির ঘা খেয়েও লোকগুলোর একটু চৈতন্য হয়। আপনারাও এক কাজ করবেন। ডাকাতদের সাজা হ’লে তাদের তখুনি জেলে না পুরে তাদের নিয়ে গিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে দেখিয়ে আসবেন। লোকে বুঝুক যে, ডাকাত একটা বাঘ-ভালুকের মত ভয়ঙ্কর জানোয়ার নয়। তাদেরই মত পিলে-রোগা হাড়-ডিগডিগে মানুষ,—মুখে তেল কালি মাখলেই যাত্রার দলের ভীম। আমার মত ষণ্ডামার্কা আর কটা ডাকাত আছে?”

শ্রীরামবাবু বুঝিলেন যে, বিশ্বনাথের যুক্তি অকাট্য। কিন্তু তাহার সহিত এসব আলোচনা করিতে তিনি আজ আসেন নাই।

বলিলেন, "আচ্ছা বিশ্বনাথ, তুমি যে সব কথা বললে তা ভেবে দেখব ; কিন্তু আমার কথাটা চাপা প'ড়ে যাচ্ছে যে। সম্প্রতি আমি বলি কি, তুমি যা যা করেছ সমস্ত আমার কাছে অকপটে স্বীকার কর। তোমার ভাল হবে।"

"কিন্তু যদি স্বীকার না করি, তা হ'লে মন্দটা কি হবে শুনি ?"

"সাজা হবে,—জেল, দ্বীপান্তর।"

"প্রমাণ না হ'লেও সাজা হবে ?"

"প্রমাণ হবে না তুমি কেমন ক'রে জানলে ?"

"কতকটা জানি বইকি। আমি তো সাক্ষী ডেকে নিয়ে গিয়ে ডাকাতি করি নি, আর ডাকাতির সময় মুখোশটা খুলে পাঁচজনকে মুখটা দেখিয়েও রাখি নি। ডাকাতি মকদ্দমায় মাল না পাওয়া গেলে কি সাজা হয় ? যাক, সে পরে দেখা যাবে। সম্প্রতি আমায় কি করতে বলেন ?"

"কোথায় কি কাজ করেছ আমার কাছে কিছু বল।"

বিশ্বনাথের হাস্যমধুর মুখ নিমেষে কঠোর হইয়া উঠিল। বলিল, "ইন্সপেক্টরবাবু, আমাদের সন্ধির সীমানা আজ এই পর্যন্ত। যদি কিছু বলতে হয়, তা হ'লে আমার যখন ইচ্ছে হবে আমি বলব। সে পর্যন্ত আপনাকে সবুর করতে হবে।"

অভিজ্ঞ ডিটেকটিভ বুঝিলেন যে, এখন আর কথা বাড়াইয়া কোন ফল হইবে না। বলিলেন, "আচ্ছা, তা না হয় করলুম। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,—কথাটা বিশেষ গুরুতর নয়। নৌকোতে যে জিনিসটা আমার নাকে গুঁজে দিয়েছিলে, সেটা কি ?"

"সেটাও এখন বলব না।"

"কখন বলবে ?"

বিশ্বনাথ আবার হাসিল। বলিল, "যখন আমার ছেলের অন্নপ্রাশনে আপনাকে নেমন্তন্ন করব।" তাবপর পুনরায় গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমার ভালর জন্যে সম্প্রতি আপনার দুশ্চিন্তার দরকার নেই। তবে আপনার ভালর জন্যে একটা কথা আমি আপনাকে বলছি। যদি আর সাত দিন আমি জেলে থাকি, তা হ'লে তার মধ্যেই আপনার জীবন বিপন্ন হবে। সিকদারই আপনাকে খুন করবে। সাবধানে থাকবেন।"

৫

পবদিন নিমাই জেলখানায় বিশ্বনাথের সঙ্গে দেখা করিল।

জেলেব ওযার্ডার কাছে দাঁড়াইয়া এবং কেরানীও পাশের ঘবে, কাজেই বিশেষ কিছু কথাবার্তার উপায় নাই। দুই-চারিটা এ-কথা সে-কথার পর নিমাই বলিল, "বিশু, তোকে খালাস ক'রে নিয়ে যেতে না পারলে তোর সিকদাবদাদা বাঁচবে না।" এ কথার অর্থ বিশ্বনাথ বুঝিল। ওযার্ডারও এক রকম বুঝিল; বলিল, "উস্‌কা দাদাকা বেমার হুয়া, না, কেয়া?"

নিমাই বলিল, "হুঁ, বহুৎ বেমাব,—বাঁচে কি না-বাঁচে।"

বিশ্বনাথের সুন্দর বলিষ্ঠ গঠন দেখিয়া ওয়ার্ডার আগেই তাহার উপর একটু সদয় হইয়াছিল, এখন তাহার দাদার এইরূপ অসুখ শুনিয়া তাহার মনটা আরও নরম হইল। বলিল, "হাঁ হাঁ, আচ্ছা দেখকে উকিল দেও, খালাস হো যাযগা।"

নিমাই এই উপদেশের সমর্থন করিয়া ও তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিল, "সিপাহী-সাহেব, ওর দাদার জন্যে মহাদেওকা

পূজা হয়েছিল, সে এই ফুলটি পাঠিয়ে দিয়েছে। তার বিশ্বাস, এই ফুল মাথায় ঠেকালে ও খালাস হয়ে যাবে।"

ওয়ার্ডার দেখিল, নিমাইয়ের হাতে একটি শুকনা গাঁদা ফুল। ভাবিল, সেটা আসামীর মাথায় ঠেকাইতে কি আপত্তি হইতে পারে? বলিল, "আচ্ছা, চট্‌পট্ দেও।"

তখন নিমাই গরাদের ভিতর দিয়া হাত গলাইয়া ফুলটি ও তাহার নীচে গুপ্তভাবে রাখা একটি কাগজের পুরিয়া বিশ্বনাথের মাথায় ঠেকাইয়া, ওয়ার্ডারের অলক্ষ্যে পুরিয়াটি তাহার লম্বা চুলের মধ্যে গুঁজিয়া দিল। তাহার পর উকিল দেওয়া সম্বন্ধে ওয়ার্ডারের সহিত আরও দুই-চারিটা কথাবার্তা কহিয়া বিদায় হইল। ওয়ার্ডার বিশ্বনাথকে আনিয়া পুনরায় তাহার কামরায় বন্ধ করিল।

ওয়ার্ডার চলিয়া যাইবামাত্র বিশ্বনাথ মাথা হইতে পুরিয়াটি বাহির করিল ও তাহা খুলিয়া দেখিল, তাহার মধ্যে দুইটি ছোট ছোট পুরিয়া আছে।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় যখন কয়েদীদের গুন্‌তি হয় তখন ওয়ার্ডার দেখিল, বিশ্বনাথ কম্বল ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, কোন অসুখ হইয়াছে কি না, কিন্তু উত্তর পাইল না। সে চাবি খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া বিশ্বনাথের গায়ের কম্বল উঠাইয়া তাহাকে ডাকিল, হাত ধরিয়া নাড়া দিল; কিন্তু কোন উত্তর নাই। তখন সে গিয়া হেড-ওয়ার্ডারকে সংবাদ দিল।

সাব-জেলের স্থানীয় কর্তা ডাক্তারবাবু আসিলেন। বিশ্বনাথকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে সে মূর্ছিত, জ্ঞানের কোন লক্ষণ নাই, তবে দেহে প্রাণ আছে। তৎক্ষণাৎ ঔষধ দেওয়া হইল,

হাতে পায়ে গরম জলের উত্তাপ দেওয়া হইল, আরও অনেক প্রকার প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হইল ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

মহকুমার হাকিমবাবু আসিয়া ও রোগীর অবস্থা দেখিয়া-শুনিয়া ডাক্তারবাবুকে বলিলেন, "জেলখানায় আর মরে কেন ? হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন, পাহারার বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "সেই ভাল। বোধ হয় রাত্রের মধ্যেই মারা যাবে।"

নিকটবর্তী এক হোটেলে নিমাই ছিল। আত্মীয় হিসাবে তাহাকেও খবর দেওয়া হইল।

মধ্যরাত্রে ডাক্তারবাবু হাসপাতালে আসিয়া আর একবার বিশ্বনাথকে দেখিলেন। বুঝিলেন, তাহার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হইয়া আসিতেছে। কম্পাউণ্ডারবাবুকে ও পাহারায় নিযুক্ত সিপাহীদ্বয়কে তাহা জানাইয়া তিনি এক ঘণ্টা পরে আবার আসিবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন। কম্পাউণ্ডার নিজের বাড়িতে গেল, ও সিপাহীরা মুমূর্ষু আসামীর উপর সেরূপ কড়া নজরের বিশেষ আবশ্যকতা নাই বিবেচনা করিয়া ঘরের সংলগ্ন বারান্দায় বেঞ্চের উপর বসিয়া কিঞ্চিৎ তন্দ্রালস হইল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত একটি মনুষ্যমূর্তি পাশের ঘর হইতে বিশ্বনাথের ঘরে ঢুকিয়া তাহার নাকের উপর একটি ছোট কাপড়ের পুঁটলি টিপিয়া ধরিল।

যথাসময়ে ডাক্তারবাবু আসিলেন। সিপাহীরা তখনও বেঞ্চের উপর অর্ধ-নিদ্রিত। ডাক্তারবাবু ঘরে ঢুকিয়াই দেখিলেন, বিশ্বনাথের বিছানা শূন্য !

বিশ্বনাথ তখন গঙ্গাবক্ষে নৌকার ভিতর নিমাইদাদার কোলে মাথা রাখিয়া তাহার দোকানের মুড়ি-মুড়কি খাইবার পরামর্শে নিযুক্ত। সিকদার নৌকার দাঁড় বাহিতেছে।

৬

তারপর ছয় মাস গত হইয়াছে।

পুলিস বিশ্বনাথকে ধরিবার জন্য চারিদিকে গুপ্তচর নিযুক্ত করিল, পুরস্কার ঘোষণা করিল, গ্রামে গ্রামে কত বাড়ি খানাতল্লাশি করিল; কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাইল না। শ্রীরামবাবু সিকদারের আশায় রহিলেন। তিনি জানিতেন, সিকদার বিশ্বনাথকে সরাইতে পাইলে আর কিছুই চায় না। কারণ এতকাল কেদার ঘোষের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ থাকিয়া এখন এই বয়সে একটা যুবকের নেতৃত্বে কাজ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সিকদার আর শ্রীরামবাবুর আয়ত্তের মধ্যে আসিতে সাহস করিল না। সে জানিত যে, কেদার ঘোষের চর সর্বত্র, এবং তাহার উপর আবার কোনরূপ সন্দেহ হইলে তাহার আর নিস্তার নাই।

এদিকে ডাকাতির সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। শ্রীরামবাবু বুঝিলেন যে, বিশ্বনাথ এবার মরিয়া হইয়াছে।

পাণ্ডুয়ার শশধর চাটুজ্জের বাড়িতে ডাকাত পড়িল। শশধর যে ঘরে ছিল, দস্যুরা তাহার একখানা দরজা ঢেঁকি দিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। কিন্তু একজন দস্যু যেমন ঘরে ঢুকিতে যাইবে, ঘরের ভিতর দেওয়ালের আড়াল হইতে একখানা খাঁড়া বাহিরের মশালের আলোতে চকচক করিয়া উঠিল। বিশ্বনাথ উঠান হইতে ডাক ছাড়িল, “জোয়ান, হুঁশিয়ার!”

কিন্তু হুঁশিয়াব হইতে না হইতেই সেই খাঁড়াব ঘায়ে দস্যু ধরাশাযী হইল।

বিশ্বনাথ এক লাফে বারান্দায উঠিযা দবজাব সামনে আসিয়া হুঙ্কার ছাড়িল, "খববদার, খাঁড়া নামাও। নইলে আমি বর্শা ছাড়লুম।" বলিয়া হস্তস্থিত বর্শার অগ্রভাগ দবজাব মধ্যে ঢুকাইয়া দিল।

কিন্তু খাঁড়া নামিল না। বিশ্বনাথ বলিল, "ওঃ! একখানা দরজাব আড়াল পেয়ে সুবিধা পেযে গেছ, নয? আচ্ছা!" বলিয়া লাথি মাবিয়া দবজা ভাঙিযা ফেলিল।

"এইবাব নিজেকে বাঁচাও।" বলিযা বিশ্বনাথ বর্শা উঠাইয়া আক্রমণকাবীব দিকে লক্ষ্য কবিতেই যাহা দেখিল, তাহাতে স্তম্ভিত হইযা গেল। এক তেজস্বিনী সুন্দবী তরুণী মূর্তি, মাথাব চুল খোলা, লালপেড়ে শাড়িব আঁচল কোমবে জড়ানো,—বিশ্বনাথের উদ্যত বর্শাব সম্মুখে অবিচলিতভাবে খাঁড়া হাতে দাঁড়াইযা। দেখিযাই বিশ্বনাথেব চক্ষু ও তাহাব হাতেব বর্শা একসঙ্গে যেন আপনা হইতেই নত হইল।

বিশ্বনাথেব হুঙ্কাব শুনিযা কেদাব ঘোষ দবজাব সামনে আসিযা দাঁড়াইযাছে। তরুণীব দিকে চাহিযা বলিল, "মা, তোমাব মত মেযে যাব বাড়িতে আছে, তাব কোনও ভয নেই। খাঁড়া নামাও।"

খাঁড়া নামাইযা তরুণী বলিল, "আমাব বাবাব অসুখ। ঘবেব মধ্যে কেউ ঢুকো না। তোমাদেব কি চাই বল।"

তরুণীব মাথাব দিকে চাহিযা নিমেষে কেদাবেব মস্তিষ্কে একটা ভাব খেলিযা গেল। বলিল, "আমি কি চাই তোমাব বাবাকে বলব। আমাকে ঘবে ঢুকতে দাও; আমি শুধুহাতে যাচ্ছি।" বলিযা নির্ভীক বৃদ্ধ লাঠিটি বাহিবে রাখিযা ঘবের ভিতব ঢুকিল। তাহাকে

সেই অবস্থায় ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া বিশ্বনাথ কিঞ্চিৎ উদ্বেগের সঙ্কেত জানাইতেই কেদার বলিল, "তুই ভেতরে আসবি? আচ্ছা, আয়। একটা মশাল নিয়ে আর একজনকে আসতে বল্!"

রোগের প্রকোপ সত্ত্বেও শশধর সাময়িক উত্তেজনায় বিছানা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেই কেদার তাহার নিকটে গিয়া বলিল, "চাটুজ্জেমশাই, আপনি আর উঠবেন না। আপনার কোনও ভয় নেই।"

শশধর উঠিয়া বালিশে ঠেস দিয়া বসিয়া বলিল, "আমাদের রক্ষা কর বাবা। তোমরা যা চাও দিচ্ছি।"

কেদার আর একবার তরুণীর দিকে চাহিয়া বলিল, "যা চাই দেবেন?"

"হ্যাঁ বাবা।"

"দেখবেন, আমার সঙ্গে কথার নড়চড় করবেন না।"

"না, তা করব না।"

"আমি আপনার এই মেয়েটিকে চাই।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "কি বললে তুমি? মেয়েকে দোব কি? তুমি কি মানুষ? এ কথা বলতে তোমার মুখে বাধল না?"

"না, আমি আর কিছু নোব না। আপনি শুধু মুখে বললেই হবে যে, মেয়েটি তোমাকে দিয়ে দিলুম। তা হ'লেই আমরা খুশি হয়ে চ'লে যাব।"

অপমান, ক্রোধ, ভয় ও নিরাশা শশধরের মনে যেন এক আবর্তের সৃষ্টি করিয়া তাহার মুখে কোন উত্তর উঠিতে দিল না। সে শুধু কাঁপিতে লাগিল। তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া তরুণী কেদারের দিকে অগ্রসর

হইয়া বলিল, "সাবধান ডাকাত! যদি ও-কথা আবার মুখে আনবে তো—" বলিয়া খাঁড়া তুলিল। বিশ্বনাথও তখন বর্শা উঠাইয়া তরুণীর দিকে ধরিল।

অবস্থা দেখিয়া শশধর চীৎকার করিয়া উঠিল, "ঈশানী, তুই থাম্ মা, তুই থাম্। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলছি।" তারপর কেদারের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার মেয়েকে রক্ষা কর বাবা। আর যা চাও সব দিচ্ছি।"

কেদার বলিল, "আচ্ছা, যদি ওকে না দেন, তা হ'লে ওর মাথাটি দিন,—সামনেই কেটে নিয়ে যাব। ও আমাদের একজনকে ঘায়েল করেছে, তাই আমাদের দলের প্রথামত ওর মাথা কেটে নিয়ে গিয়ে মা-কালীর পায়ে দিতে হবে। কেমন, রাজী আছেন?"

শশধর চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "ভগবান আমার সবই নিয়েছেন। ছিল ওই একটা মেয়ে,—তাকে ডাকাতের হাতে দিতে হবে?"

"না, তা হবে না।" বলিয়াই তরুণী হাতে খাঁড়া উঠাইল। কেদার তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া গিয়া খাঁড়ার পশ্চাদ্ভাগ ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "ছিঃ মা! আত্মহত্যা করতে আছে?"

শশধর গর্জিয়া উঠিল, "তোমাদের হাতে অপমানের চেয়ে সে ভাল।"

ধীর প্রশান্ত ভাবে কেদার শশধরের আরও কাছে আসিয়া বলিল, "চাটুজ্জেমশাই, আপনার এ মেয়েকে অপমান করব এমন পাষণ্ড আমি নই। আমি ডাকাত হ'লেও মানুষ। শক্তির মর্যাদা বুঝি। আমি কোনও অসদুদ্দেশ্যে আপনার মেয়েকে চাই নি।"

অভিভূতের মত শশধর চীৎকার করিয়া উঠিল, "তবে কি উদ্দেশ্যে?"

"আমাদের দলের রাণী করব ব'লে।"

বিশ্বনাথ চমকিয়া উঠিল। তাহার হাতের বর্শা তাহাব কঠিন মুষ্টি হইতে প্রায়-স্খলিত হইল। বৃদ্ধ কেদার ঘোষ মনে মনে হাসিল।

শশধর বলিল, "সে তো একই কথা হ'ল, অপমান নয় তো কি ?"

"না, অপমান নয়। আমাদের রাজাকে দেখলে আপনি আব সে কথা বলবেন না।" বলিয়াই কেদাব বিশ্বনাথেব মুখোশ ও ফতুযা খুলিয়া লইল।

বিশ্বনাথের সুন্দর বলিষ্ঠ দেহের দিকে চাহিয়া শশধব আর চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। বক্ষে লম্বিত শুভ্র যজ্ঞোপবীতেব দিকে লক্ষ্য করিতেই কেদার বলিল, "আপনাব বাড়িতে ডাকাতি কবতে এসেছি; কিন্তু আপনাকে প্রতারণা করতে আসি নি। আমি ব্রাহ্মণ নই, কিন্তু আমার এই নাতিটি সদ্‌ব্রাহ্মণ,—জাত্যংশে আপনাব চেযে কোন রকমে ছোট নয়। ঘটনাচক্রে ডাকাত হয়েছে।" বলিয়া বিশ্বনাথকে আর একটু ঈশানীর দিকে ঠেলিযা দিয়া বলিল, "দেখুন দেখি, কেমন মানাবে! বিশ্বনাথের হাতে বর্শা, আব ঈশানীব হাতে খাঁড়া,—রাজযোটক। আপনি ব্রাহ্মণ, আশীর্বাদ করুন যেন বাঙালীব ঘবে ঘরে এমনি সুন্দর বলিষ্ঠ সাহসী স্ত্রী-পুরুষ হয়।"

তখন ঈশানী বিশ্বনাথের দিকে চাহিল। চারি চক্ষুব মিলন হইল। সঙ্গে সঙ্গে উভযের মধ্যে যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলিয়া গেল।

শশধর কি উত্তব দিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একমাত্র কন্যার শুভাশুভের মীমাংসা এত শীঘ্র হয় না। বলিল, "আমি এখন অসুস্থ। ভেবে দেখব।"

কেদার বলিল, "না, ভাববার সময় দিতে পারি না। আমাদের বিপদ পদে পদে। আপনাকে এই মুহূর্তেই সম্মতি দিতে হবে।"

শশধরের চক্ষু আবার জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। ঈশানীর দিকে চাহিতেই সে বুঝিল, সেই অশ্রুর অন্তরালে বিবেক ও স্নেহের কি মর্মঘাতী দ্বন্দ্ব,—একান্ত নিঃসহায়তার কি অসহনীয় বেদনা! পিতার এই অবস্থা দেখিয়া ঈশানী তৎক্ষণাৎ আপনার কর্তব্য স্থির করিয়া লইল। খাঁড়াটি রাখিয়া সে বিশ্বনাথের মুখের দিকে প্রীতিভরা নয়নে চাহিল। সে চাহনির অর্থ—স্বেচ্ছায় আনন্দের সহিত আত্মসমর্পণ। শশধর তাহা বুঝিল, সস্নেহে বিশ্বনাথের দিকে চাহিয়া সে তাহাকে ও ঈশানীকে কাছে আসিতে বলিল। উভয়ে গিয়া শশধরের চরণে প্রণত হইল।

শশধর তাহার কম্পিত হস্ত তাহাদের মাথায় রাখিল। তাহার নয়নে আবার অশ্রুধারা ছুটিল। কিন্তু এ বেদনার অশ্রু নয়,—সৌন্দর্যে, স্বাস্থ্যে, দেহের লাবণ্যে সত্যই রাজযোটক। ভাবিল, ডাকাত? তাহাতে কি? তাহার তো অর্থ আছে, সম্পত্তি আছে, মানুষ করিয়া লইবে।

ফিরিবার সময় বিশ্বনাথ কেদারকে বলিল, "দাদু, কাজটা ভাল করলে না।"

"কেন বল্ দেখি?"

"আমরা দু ভাই বেশ ছিলাম। কেন আবার একটা বাইরের লোক জোটালে?"

"বাইরের লোক নয় রে দাদু। দেখবি, দু দিনের মধ্যেই কেমন ঘরের লোক হয়ে যাবে।"

"ভুল করলে দাদু, এত বড একটা ডাকাতকে মাটি ক'রে দিলে।"

৭

ইহার পর কয়েক মাস অতীত হইয়াছে।

"চাই পটল"—বলিয়া এক ফেরিওয়ালা ডুমুরদহ গ্রামে সিকদারের বাড়ির দরজায় উপস্থিত হইল। একটি ছেলে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই ফেরিওয়ালা বাড়ির ভিতর গিয়া আপনার পণ্য নামাইল ও তাহার একটা খুব চড়া গোছের দাম হাঁকিল। মেয়েদের সঙ্গে যখন দর-কথাকষি হইতেছে, তখন সিকদার পাশের বাড়ি হইতে আসিয়া ফেরিওয়ালাকে দেখিয়া বিরক্তির স্বরে বলিল, "কেমন লোক হে তুমি? একেবারে বাড়ির ভেতর ঢুকেছ! যাও, আমরা পটল নোব না।"

"দেখুন না কর্তা—চাকদাব পটল। সুবিধে ক'রে দিচ্ছি।" বলিয়া ফেরিওয়ালা মুখে ও মাথায় জড়ানো কাপড়খানা খুলিয়া সিকদারের দিকে চাহিতেই সে চমকিয়া উঠিল ও ফেরিওয়ালাব কাছে আসিয়া বসিতেই সে তাড়াতাড়ি দুই সের পটল ওজন করিয়া দিয়া বলিল, "চল কর্তা, বাইরের ঘরেই চল, সেইখানেই দাম নোব।"

বাহিরের ঘরে আসিবামাত্র ফেরিওয়ালা একখানি পঞ্চাশ টাকার নোট সিকদারের হাতে গুঁজিয়া দিতেই সে বলিল, "আপনার টাকা নোব না বাবু, আর আমা থেকে কিছু হবে না।"

"কেন বল দেখি?"

"আমার ওপর কড়া পাহারা। যতক্ষণ বাড়িতে থাকব, কেউ এলে গেলে সে খবর সর্দারের কানে পৌছবেই। আপনি এ রকম ক'রে এসে বড়ই দুঃসাহসের কাজ করেছেন।"

"কই, তোমার বাড়ির আশেপাশে কাউকে তো দেখলুম না।"

"না, আপনাদের মত আমরা বাইরের লোককে গোয়েন্দা রাখি না।

তাতে আপনারা শুধু অর্থশ্রাদ্ধ করেন, কাজ কিছুই হয় না। এই যে আমার পাড়াপড়শী দেখছেন, এদেরই মধ্যে দু-চারজন সর্দারের টাকা খায় আর আমার ওপর নজর রাখে। যদি আপনি তাদের কারুর চোখে পড়েন, আর তার কোনও সন্দেহ হয়—"

"কেন? আমাকে দেখে সন্দেহের কিছু আছে ব'লে মনে হচ্ছে নাকি?"

"না, বেশভূষা দেখে কিছু মনে হচ্ছে না। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে তরকারি ফেরি করতে বড় একটা কেউ আসে না। যদি কোনও রকমে সন্দেহ হয়, তা হ'লে আমার দফা শেষ,—আর আপনিও নিরাপদে ফিরে যেতে পাবেন কি না সন্দেহ।"

শ্রীরামবাবু হাসিয়া বলিলেন, "যাক, আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না; কিন্তু তুমি এ রকম ক'রে কতদিন থাকবে?"

"তা ঠিক থাকব। আমি না হ'লে সর্দারের চলে না, তা সে বেশ জানে। সে যখন জেলে ছিল, আমিই দল চালিয়ে ছিলুম। আর সে এটাও জানে যে, আমা থেকে তার নিজের কিংবা তার দলের কোন অনিষ্ট হবে না।"

"তাই নাকি? তবে যে তুমি—"

"হ্যাঁ, আমি বিশ্বনাথের খবর দু-একটা আপনাকে দিয়েছি বটে; কিন্তু আমার সঙ্গে আপনার কারবার ঠিক সেই পর্যন্তই, সেটা জানবেন।" সিকদারের উজ্জ্বল চক্ষু আরও জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "আমি বিশেকে দল থেকে সরাতে চাই,—তা যেমন ক'রেই হোক। তবে আপনার টাকার লোভে আমি সর্দারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না, অন্তত যতদিন সে আমার কোন অনিষ্ট না করে।"

শ্রীরামবাবু মনে মনে হাসিলেন, ভাবিলেন, ডাকাতের আবার

ধর্মনিষ্ঠা! যে ডাকাত টাকা খাইয়া দলের একজনের খবর দেয়, সে আরও টাকা পাইলে সব খবরই দিবে। কিন্তু বাগ্‌বিতণ্ডার সময় নাই বিবেচনা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি সম্প্রতি তোমার কাছে আর কিছু চাই না। বিশ্বনাথের খবর বল। শুনলুম সে বিয়ে করেছে।"

"হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই বিয়ে। কার মেয়ে তাও বোধ হয় জানেন।"

"জানি। বিয়েব রাতে খবরটা দিলে না কেন? বরযাত্রী যেতুম।"

"খবর পেলে তো দোব। সন্ধ্যার পর সর্দার বিশুকে সঙ্গে নিয়ে এসে আমাদেব বললে, 'চল্, আজ বিশুর বিয়ে।' ঠিক ডাকাতি কবতে যাওয়ার মতই আমবা তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলুম, তবে ভদ্রলোকেব বেশে। ভোববেলায় সব ফিবে এলুম। কন্যাকর্তার দু-একজন প্রতিবেশী এসেছিল। তাদের বলা হ'ল, কুলীনেব ছেলেব বিয়ে, তাই কোন পক্ষ থেকেই কিছু বাহুল্য কি আড়ম্বব নেই।"

"তারপর? বউ কোথায় রইল?"

"বাপের বাড়িতে। কুলীনদের যেমন হয়।"

"তা বেশ হযেছে। বিশ্বনাথের ছেলেব অন্নপ্রাশনে আমি নেমন্তন্ন খেতে যাব। কিন্তু সম্প্রতি তার আব খবর কি বল, শ্বশুর-বাড়ি যায়-টায় না?"

"সে এ মুলুকেই নেই। সর্দাব তাকে পাবনা জেলাব দিকে পাঠিয়েছে।"

"কেন বল দেখি? আমাদের ভয়ে?"

"শুধু তাই নয়, আপনাদের চেয়েও তার নাতবউটির ভয়ে। বেশি কাছে পেলে সুবুদ্ধি নাতিটিকে পাছে বিগড়ে দেয়।"

"মাঝে মাঝে আসে না?"

"খুব কম। যখন আসে, শশুর-বাড়িতে একদিন থেকেই তার পরদিন স'রে পড়ে।"

"এবার এলে খবরটা পাব ?"

"দেখব, কিন্তু খবর দোব কেমন ক'রে ?"

শ্রীরামবাবু একটু ভাবিলেন, বলিলেন, "আচ্ছা, এবার যে দিন সে আসবে, তুমি তোমার রান্নাঘরখানায় দিনের বেলায় আগুন লাগিয়ে দেবে, তা হ'লেই আমি খবর পাব।"

তারপর একটু হাসিয়া বলিলেন, "ও-টাকাটা আমি আর ফেরত নোব না, তোমার রান্নাঘর মেরামতের খরচার জন্যে রেখে দাও।"

৮

"বড়ই শক্ত সমস্যা ঈশানী! যে শিক্ষা পেয়ে এসেছি, এতদিন যে পথে চলেছি, সেটা যেন এখন আজন্ম-সংস্কারের মতই হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি আর কি করব বল ?" বলিয়া বিশ্বনাথ ঈশানীর অশ্রুসিক্ত নয়নের দিকে কাতর নয়নে চাহিল। বলিল, "আমি জানি, আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে তুমি কত অসুখী। আর কি অবস্থায় বিয়ে হয়েছে তাও আমি ভুলি নি।"

"না, আমি অসুখী নই। সে কথা বললে মিথ্যা বলা হবে। তা ছাড়া বিয়ে যে অবস্থায় প'ড়েই হোক না কেন, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয় নি সেটাও ঠিক ; তা কখনও হতে পারত না। কিন্তু ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুখ-দুঃখের কথাই শেষ কথা নয়, তা ছাড়াও তো কিছু আছে।"

"হ্যাঁ, তা আছে বইকি।"

"আমাদের তো পাঁচজনের মধ্যে বাস করতে হয়। বাবা না হয় ব'লে বেড়ালেন যে, কুলীনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, তাই মেয়েকে

নিয়ে যায় না, জামাই কখন আসে কখন যায় তার ঠিক নেই। কিন্তু এসব কথা দু-দিন দশ-দিন চলতে পারে। তাব পরেই লোকে সন্দেহ কবতে আবম্ভ করে। আমাব ঠিক বিয়ে হয়েছে কি না, সেইটেই এখনও অনেকে সন্দেহ করে।” বলিযা ঈশানী অঞ্চল দিয়া অশ্রুরোধেব চেষ্টা করিল।

বিশ্বনাথেব দৃঢ় হৃদয় দোটানায পড়িযা টলটল কবিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, বুঝি তরুণীব অশ্রুতে এতকালেব বাঁধ ভাঙিয়া যায়। তাহার মায়ের কাছে সে তাহাব বাল্যজীবনের সব কথাই শুনিযাছিল। যে তাহাব প্রাণভিক্ষা দিয়া এতকাল তাহাকে পুত্রনির্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া আসিযাছে, তাহাকে এই বৃদ্ধবযসে বিপদেব মুখে রাখিয়া সবিয়া দাঁড়াইবার চিন্তাও তাহাব অত্যন্ত কষ্টকব বোধ হইতেছিল। সে তো কখনও ভাল-মন্দ কিছুই ভাবে নাই, বোঝে নাই। সে জানিত শুধু তাহার দাদুকে, আব বুঝিত তাহাব নিজেব সবল ও সবল প্রাণেব ঐকান্তিক প্রেরণা।

কিন্তু ঈশানী আজ সত্য সত্যই তাহাব ও তাহাব দাদুব মাঝখানে আসিযা দাঁড়াইযাছে। তাহাকে তো অবজ্ঞা কবা চলে না। সে যে ভালবাসে। দাদুও তো ভালবাসে। কোন্‌টা বেশি? একটা মিটমাট হয় না কি?

বিশ্বনাথকে চিন্তাকুল দেখিয়া ঈশানী বলিল, “যাক, আমাব কথা না হয় ছেড়ে দিলুম; কিন্তু তুমিই বা এমন ক'বে মাথাব ওপব খাঁড়া ঝুলিয়ে আব কতদিন থাকবে?”

“সেটা আমাদেব অভ্যস্ত হয়ে গেছে; তার জন্যে তো কই কখনও কোনও দুর্ভাবনা হয় না। আব তোমাবও দুর্ভাবনা কববাব দরকাব নেই। সে যা হয় হবে। কিন্তু তোমাব দিকটা ভাবতে গেলে

আমি তো কিছুই কূল-কিনারা পাচ্ছি না। তুমিই বল ঈশানী, আমি কি করব?"

"হ্যাঁ, সেইটাই আজ তোমাকে বলব মনে করেছি। আজ তোমাকে কাছে পেয়েছি, আর কতদিন পরে পাব জানি না,—তাই আমার যা বলবার আছে আজই ব'লে শেষ করব। তারপর তোমার যা ইচ্ছা হয় ক'রো।"

"আচ্ছা, বল।"

"তুমি এসব ছেড়ে দাও।"

বিশ্বনাথ হাসিল, বলিল, 'শ্রীরামবাবুও একদিন আমাকে ঠিক ঐ কথাই বলেছিল। কিন্তু বোঝাতে পারলে না।"

"না, আমার কাছে যুক্তিতর্কের আশা ক'রো না। ভাল-মন্দের বিচার আমি তোমার সঙ্গে করব না। আমার ইচ্ছা যে তুমি ছেড়ে দাও, তা হ'লেই আমি সুখী হব। তুমি সরল কথা ভালবাস, তাই তোমাকে সরল কথা বললুম।"

"বেশ, আমি না হয় ছেড়ে দিলুম; কিন্তু আমাকে ছাড়বে কেন?"

"কে ছাড়বে না? দাদু, না, পুলিস?"

"উভয়েই। তুমি দাদুকে এখনও চেন নি। আমি তার প্রাণ। কিন্তু তার কাছে তার দল আমার চেয়েও বেশি। আমি যা করব তাতে যদি দলের কোন ক্ষতি হয়, সে তা সহ্য করবে না। যদি আমি নিজে ধরা দি, তা হ'লেই সে আমাকে সন্দেহ করবে। তবে যদি ধরা না দিয়ে কোন দূরদেশে গিয়ে—এই রকম ফেরারী ভাবেই থাকি, তা হ'লে হয়তো সে কিছু মনে নাও করতে পারে। কেমন, তাতে রাজী আছ?"

"না, রাজী নই। কারণ বলবার বোধ হয় কোন দরকার নেই।"

"তা হ'লে তোমার ইচ্ছা যে, আমি ধরা দি।"

"না, ধরা দিতে হবে না। পুলিস তোমাকে ধরবার চেষ্টা করছে, তারাই তোমার সন্ধান নিয়ে ধরুক।"

"চেষ্টা তো অনেক দিন থেকেই করছে; কিন্তু ধরতে পারছে কই?"

"তুমি একটু আলগা দিলেই ধরতে পারবে।"

"তা হ'লে তো ধরা দেওয়াই হ'ল।"

ঈশানী ইহার আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। বুঝিল, কথাটা সে যতদূর সহজ ভাবিয়াছিল তাহা নহে। এ সমস্যার সমাধান যেন তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকেও অতিক্রম করিতেছে। সে শুধু হতাশভাবে বিশ্বনাথের দিকে চাহিল।

বিশ্বনাথ বলিল, "দু দিক রাখা যায় না ঈশানী। নিজের মনকে প্রতারণা করতে কখনও শিখি নি। আমার শেষ কথা শোন। আমার সন্ধান নিয়ে পুলিস আমাকে কলে ইঁদুর ধরার মত ধরবে, সে আমি সাধ্যমতে হতে দোব না। তবে আমি ইচ্ছা ক'রে ধরা দিতে পারি। কিন্তু যদি ধরা দি, তা হ'লে শুধু আমার দেহটাই ধরা দেবে না, আমার মনও ধরা দেবে। মনের মধ্যে কিছুই লুকিয়ে রাখব না।"

ঈশানী আবার আকুল চিন্তায় পড়িল। বলিল, "যদি ধরা না দাও, তা হ'লে কি হবে?"

"তা হ'লে যা হচ্ছে তাই হবে। এমনি ক'রেই অজ্ঞাতবাস,—যেখানে যাব, দল পাকিয়ে ডাকাতি—"

"কেন? ডাকাতিটা না হয় আর নাই করলে। সেটা ছেড়ে থাকতে পারবে না?"

"না, তা পারব না। আর তা থাকা নিরাপদও নয়। কতকগুলো

লোকজন হাতে থাকলে অনেক খবর পাওয়া যায়। নিজের জন্যে শুধু নিজেকেই ভাবতে হয় না,—ভাববার লোক আরও দু-পাঁচটা থাকে। তা ছাড়া, ওর মধ্যে একটা উদ্দীপনা আছে। আপনা হতেই সাহস আসে, বুদ্ধি আসে। সব ছেড়ে-ছুড়ে দিলে কি হয় জান? জল থেকে মাছকে ডাঙায় তুলে ফেললে যা হয়। যাক, এখন তো সব বুঝলে, কি করব বল?"

ঈশানী আবার কিছুক্ষণ ভাবিল। বলিল, "আমি তো আগেই বলেছি—তুমি এসব ছেড়ে দাও। তাতে যদি পুলিসের হাতে ধরা দিতে হয় তো দাও। তোমারও যেমন এক কথা, আমারও তাই। যদি আমার কথা রাখতে ইচ্ছা হয়, রেখো; আমি তাতে সুখী হব। যদি না রাখ, আমি তাতেও দুঃখিত হব না।"

বিশ্বনাথ যেন একটা অনিশ্চয়তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল। বলিল, "আচ্ছা, তোমার কথাই রাখব। কিন্তু তার পর কি হতে পারে তা ভেবেছ? সে কথাটাও তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভাল।"

"ভেবেছি। সেইটাই এখুনি ভাবছিলুম। ধরা দিলে তোমার জেল হবে, না হয় বড় জোর দ্বীপান্তর। তা হোক, আমি তার জন্যে প্রস্তুত।"

"কিন্তু সেইটাই সব নয়। যদি সমস্ত স্বীকার করি, তা হ'লে ওসব কিছু না হতেও পারে।"

"তা হ'লে সব স্বীকার কর। তুমি তো নিজেই বললে যে, ধরা দিলে মনে কিছু রাখবে না।"

"আচ্ছা, না হয় স্বীকার ক'রে খালাস হয়ে চ'লে এলুম। কিন্তু তারপর?"

"তারপর আবার কি?"

বিশ্বনাথ হাসিল। বলিল, "না. এমন কিছু নয়। তারপর কেদার ঘোষ আমাকে খুন করবে।"

বিস্ময়ে ঈশানী চীৎকার করিয়া উঠিল, "দাদু তোমাকে খুন করবে?"

"হ্যাঁ, আমাকে। যাকে আজ ষোল বৎসর ধ'রে বুকে ক'রে মানুষ করেছে তার প্রাণদণ্ডের হুকুম দিতে কেদার ঘোষের ষোল সেকেণ্ড সময়ও লাগবে না।"

ঈশানী শিহরিয়া উঠিল। নিমেষে যেন তাহার সমস্ত আগ্রহ, সমস্ত দৃঢ়তা বিলুপ্ত হইল। নয়নে আবার অশ্রুধারা ছুটিল। বিহ্বলভাবে বলিল, "তা হ'লে তুমি—তা হ'লে তুমি—"

কিন্তু তাহার কথা শেষ হইল না। সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পুলিসের বাঁশী বাজিয়া উঠিল, ও বিশ্বনাথের পরিচিত এক কণ্ঠস্বর গর্জিয়া উঠিল, "বাড়িতে কে আছ? দরজা খোল।"

৯

বিশ্বনাথ ও ঈশানী চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া বিশ্বনাথ বলিল, "ঈশানী! আমাদের কথাব আজ আর শেষ হ'ল না। শ্যামের বাঁশী বেজেছে। আমাকে যেতে হ'ল, আমার পিস্তলটা দাও।"

ঈশানী ব্যাকুলভাবে বিশ্বনাথের দিকে চাহিল। বিশ্বনাথ বলিল, "আর ভাববার সময় নেই। পিস্তল দাও। বলেছি তো, কলে পড়া ইঁদুরের মত পুলিসের হাতে ধরা দোব না।"

পিস্তল বাহির করিতে করিতে ঈশানী বলিল, "না, খুনোখুনি ক'রো

না। আমি পিস্তল নিয়ে দরজায় দাঁড়াচ্ছি। আমার হাতে যতক্ষণ পিস্তল থাকবে, কেউ ঘরে ঢুকতে পারবে না।"

"না, তা হয় না। স্ত্রীকে এগিয়ে দিয়ে বিশ্বনাথ ঘরের কোণে লুকোতে পারবে না। পিস্তল দাও।"

পিস্তল দিতে দিতে ঈশানী বলিল, "তবে ধরা দাও।"

"না, এখানে ধরা দোব না। তোমার ও-কথাটা আজ রাখতে পারলুম না, পরে রাখব। কিন্তু যদি শুধু খুনোখুনি করতে বারণ কর, তা হ'লে সেটা না হয় চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।" বলিতে বলিতে বিশ্বনাথ দ্রুতপদে দোতলার ছাদে গিয়া উঠিল।

"ছাদে যাচ্ছ কেন?" বলিয়া ঈশানী তাহার পিছনে ছুটিল ও ছাদে উঠিয়া সিঁড়ির দরজার শিকল লাগাইয়া দিল। বিশ্বনাথ ততক্ষণে ছাদের এক জায়গায় আলিসা ডিঙাইয়া কার্নিসের উপর দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া যাইতে যাইতে ঈশানী চীৎকার করিয়া উঠিল, "পুরনো কার্নিস, এখুনি ভেঙে পড়বে। ছাদের আলসের ওপর ভর দাও।"

"তাই নাকি?" বলিয়া বিশ্বনাথ আলিসার উপর ঝুঁকিয়া পড়িতেই তাহার পায়ের নিচের কার্নিস ভাঙিয়া হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে নীচে সিপাহীর বাঁশী বাজিয়া উঠিল ও দুই-তিনজন সিপাহী আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। একজন বন্দুক উঠাইয়া উপরের দিকে লক্ষ্য করিল।

বিশ্বনাথ তৎক্ষণাৎ ছাদের উপর লাফাইয়া পড়িয়া বলিল, "ঈশানী, তোমার কাপড়ের আঁচল ধ'রে ঝুলে পড়ব ভেবেছিলুম। কিন্তু শুভকার্যে বাধা পড়ল।" বলিয়াই আলিসা ধরিয়া ছাদের চারিদিকে দ্রুতপদে ঘুরিতে আরম্ভ করিল।

তখন পুলিস ছাদের দরজা ভাঙিতেছে। ঈশানী ব্যাকুলভাবে বলিল, "ওগো, ছাদ থেকে লাফিও না,—প্রাণ যাবে। পালাবার কোনও উপায় নেই, ধরা দাও।"

বিশ্বনাথ এক জায়গায় দাঁড়াইয়া বলিল, "এই দেখ, উপায় আছে। তোমার বাবা যখন ডাকাত জামাই করেছেন, তখন তার পালাবার ব্যবস্থাও ক'রে রেখে দিয়েছেন।" বলিয়া ঈশানীকে বাড়ির পিছনে গোয়ালঘরের উঠানে একটা খড়ের গাদা দেখাইয়া দিল। তারপর তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া বলিল, "আমার জন্যে ভেবো না, লক্ষ্মীটি। আমি দেখব যদি তোমার কথা রাখতে পারি।" বলিয়াই আলিসাতে উঠিয়া "জয় মা-কালী" বলিয়া খড়ের গাদায় লাফাইয়া পড়িল।

বাড়ির চারিদিক পর্যবেক্ষণ করিবার সময় শ্রীরামবাবু এই খড়েব গাদা দেখিয়াছিলেন, ও ছাদ হইতে তাহার উপর লাফাইয়া পড়া বিশ্বনাথের পক্ষে অসম্ভব নয় বিবেচনা করিয়া তিনি সেখানে একজন বন্দুকধারী সিপাহী রাখিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ পড়িবামাত্র সিপাহী বন্দুক উঠাইল। কিন্তু লক্ষ্য স্থির কবিতে না করিতেই বিশ্বনাথের পিস্তলের গুলি ছুটিল।

"আজ কিন্তু খুনোখুনি বারণ সিপাহীজী। তোমার বন্দুকটাই ওড়ালাম।" বলিয়া বিশ্বনাথ খড়ের গাদা হইতে অপর দিকে লাফাইয়া পড়িল। তাহার অব্যর্থ সন্ধানে বিদ্ধ হইয়া বন্দুক সিপাহীর হাত হইতে খসিয়া পড়িল।

বিশ্বনাথ ছাদের দিকে চাহিল। সেই শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে নীরব নিস্পন্দ ঈশানীকে মর্মরমূর্তির মত দেখাইতেছিল। তাহার পিছনে যে আর এক মনুষ্যমূর্তি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা তাহার জ্ঞান নাই।

বিশ্বনাথ চিনিল, সে মূর্তি কাহার। হাসিয়া বলিল, "ইন্সপেক্টরবাবু, আমাদের সন্ধি এখনও বিচ্ছেদ হয় নি। দেখবেন যেন আমার গিন্নীটির কোন অমর্যাদা না হয়।" বলিয়াই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল।

১০

বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া শ্রীরামবাবু গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। বিশ্বনাথকে হাতে পাইয়া ধরিতে পারিলেন না। এরূপ ব্যর্থতার আস্বাদ তিনি যে জীবনে আর কখনও পান নাই এমন নহে। কিন্তু বিশ্বনাথ সম্বন্ধে সমস্তই যেন তাঁহার কাছে অপরূপ মনে হইতে লাগিল। কেন এমন হইল? তাঁহার নিজের কি কোথাও ত্রুটি ছিল? তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠ অন্তরের কোন এক নিভৃত কোণে কি একটু দুর্বলতা প্রচ্ছন্ন ছিল? তিনি যেখানে একজন সিপাহী রাখিয়াছিলেন সেখানে তিনজন রাখেন নাই কেন? ছাদ হইতে যখন তিনি বিশ্বনাথকে লাফাইতে দেখিলেন, তখন তাহার পা লক্ষ্য করিয়া তিনি পিস্তল ছুঁড়িলেন না কেন? তিনি নিজে ছাদ হইতে খড়ের গাদায় লাফাইয়া পড়িলেন না কেন? মনের মধ্যে এ সবের উত্তর খুঁজিলেন, কিন্তু সন্তোষজনক কোন উত্তর পাইলেন না।

উপরওয়ালা পুলিস-সাহেবের সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, "সাহেব, আমি জীবনে আমার ওপরওয়ালাকে যা কখনও বলি নি, আজ তাই বলতে এসেছি। বিশ্বনাথের গ্রেপ্তার আমার দ্বারা হবে না। আপনি আর কোন অফিসারকে এ কাজের ভার দিন।"

সাহেব অবাক হইলেন। শ্রীরামবাবুর কার্যকুশলতা, সাহস ও দৃঢ়তা সম্বন্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। বললেন, "কি বলছেন

আপনি? কত বড় বড় ডাকাতের দল ধরলেন। আর এই একটা ছোকরাকে ধরতে পারবেন না? আমি এ বিশ্বাসই করতে পারি না। আপনার হ'ল কি?"

"আপনি ওপরওয়ালা। আপনার কাছে কিছুই গোপন করব না। আপনি জানেন, আমি একবার বিশ্বনাথকে ধরতে গিয়ে তারই হাতে পড়েছিলুম। তখন ইচ্ছে করলে সে আমাকে মেরে ফেলতে পারত, কিন্তু সে তা করে নি। যা হোক, সে জন্যে আমি কখনও তার সম্বন্ধে আমার কর্তব্যের বিন্দুমাত্র শিথিলতা করি নে।"

"আপনি তা করবেন না, সেটা আমি বেশ জানি।"

"হ্যাঁ, আমি ইচ্ছে ক'রে তা করব না। কিন্তু আমার অজ্ঞাতসারে বোধ হয় কিছু শিথিলতা এসে পড়েছে।"

"কেমন ক'রে বুঝলেন?"

"তা আমি ঠিক আপনাকে বোঝাতে পারব না; কেননা আমি নিজেই সেটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে যেন আমার কাজে ভুল হচ্ছে। হয়তো অন্য কেউ সেটাকে ভুল বলবে না; কিন্তু কাজের ব্যর্থতা ভেবে দেখতে গেলে আমি নিজেকেই বোঝাতে পারছি না যে, কোথাও ভুল বা শিথিলতা হয় নি।"

সাহেব কিছুক্ষণ ভাবিলেন। বলিলেন, "আমি বুঝেছি শ্রীরামবাবু। ভুল অনেক সময়েই হয়, আর সে ভুলটা পরে ধরা পড়ে। ভুলের সম্ভাবনা বাঁচিয়ে কাজ করা খুবই শক্ত, কিন্তু আপনার অজ্ঞাতসারে যদি কখনও কিছু শিথিলতা এসে পড়ে, আপনি তার জন্য বিব্রত হবেন না। হয়তো এই শিথিলতা থেকেই শেষ পর্যন্ত কাজ হবে। হয়তো তা থেকে এমন একটা কিছু হতে পারে, যাতে আমাদের উপকার হবে। হয়তো

বিশ্বনাথেরও উপকার হবে। আপনি ও-সব কিছু মনে করবেন না। কাজ ক'রে যান।"

শ্রীরামবাবু ইহার আর কোন প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। বরং অকারণে নিজের দুর্বলতা প্রকাশের জন্য ক্ষুব্ধ হইলেন। বলিলেন, "আপনার আদেশ শিরোধার্য। আমি আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি যে, বিশ্বনাথকে ধরবার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব;—কার্যসিদ্ধির কোন সুযোগই ছাড়ব না।"

১১

আপনার কার্যস্থানে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীরামবাবু বিশ্বনাথকে ধরিবার জন্য খুব পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিলেন। হুগলী, বর্ধমান ও পাবনা জেলার পুলিস ও চৌকিদারদের মধ্যে অসাধারণ রকমের সাড়া পড়িয়া গেল। গ্রামে গ্রামে গোয়েন্দা ও গুপ্ত পুলিস ছুটাছুটি করিতে লাগিল। রেলওয়ে ও স্টীমার স্টেশনে কড়া নজরের ব্যবস্থা হইল। তাহাকে ধরিতে পারিলে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া হইবে ঘোষণা করা হইল।

কিন্তু কোন ফল হইল না। শ্রীরামবাবু ভাবিলেন যে, এবার কেদার ঘোষ তাহাকে এমনভাবে লুকাইতেছে যে, সে আবরণীর ভিতর দৃষ্টিক্ষেপ করাও শক্ত। ব্যর্থতার অবসাদে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

একদিন প্রায় হতাশভাবেই তিনি নিজের অফিস-ঘরে বসিয়া ভাবিতেছেন, এমন সময় ডাকপিয়ন একখানি চিঠি দিয়া গেল। খামের উপরে পরিষ্কার ইংরেজীতে শ্রীরামবাবুর নাম ও ঠিকানা লেখা। পত্রখানি বাহির করিয়া পড়িবামাত্র শ্রীরামবাবু চমকিয়া উঠিলেন।

তাঁহার মুখে বিস্ময়, আনন্দ ও চিন্তার রেখা দ্রুত পরম্পরায় ফুটিয়া উঠিল।

চিঠিখানিও ইংরেজীতে লেখা। তাহার ভাবার্থ এই—

"আপনি আগামী শনিবার রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় বাঁশবেড়ের হংসেশ্বরী-মন্দিরের পিছনে আমার সহিত দেখা করিবেন। সঙ্গে কাহাকেও আনিবেন না,—প্রকাশ্যে কিংবা গুপ্তভাবে। তাহার কারণ, আমি সাক্ষী রাখিয়া আপনার সহিত দেখা করিব না। যদি ইহার ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলে আমার সহিত দেখা হইবে না। আপনার কোন ভয় নাই। আমাকে বিশ্বাস করিতে পারেন। দেখা হইলে আপনার উপকার হইবে।"

চিঠির শেষে নাম সহির স্থলে একটি অঙ্গুলির ছাপ।

শ্রীরামবাবু জানিতেন যে, কেদার ঘোষ বিশ্বনাথকে ইংরেজী লেখাপড়া শিখাইয়াছিল। সেকালে পল্লীগ্রামে ইংরেজী লেখাপড়ার বড় একটা প্রচলন ছিল না। তাই এই পত্র যে বিশ্বনাথ লিখিয়াছে তাহা তাঁহার প্রথমেই মনে হইল। কিন্তু নাম সহি না করিয়া অঙ্গুলির ছাপ দিল কেন? যাহারা লিখিতে জানে না তাহারাই তো নাম সহি করার পরিবর্তে ঐরূপ নিদর্শন দেয়। একটু ভাবিতেই তাঁহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

অবিলম্বে কালনার কোর্টবাবুর অফিসে গিয়া তিনি হাজতের আসামীদের আঙুলের ছাপের কাগজ (Finger-impression slip) দেখিতে আরম্ভ করিলেন। বিশ্বনাথ যখন হাজতে আসিয়াছিল তখন তাহার আঙুলের ছাপ লওয়া হইয়াছিল। বিশ্বনাথের স্লিপ বাহির করিয়া দেখিতেই তাহার আঙুলের ছাপের সহিত পত্রের আঙুলের ছাপ মিলিয়া গেল।

বিশ্বনাথের বুদ্ধির প্রখরতা দেখিয়া শ্রীরামবাবু বিস্মিত হইলেন। চিঠিতে নাম সহি করিলে কি লেখক ঠিক কোন্ ব্যক্তি সে সম্বন্ধে এতদূর নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেন?

বাড়িতে আসিয়া শ্রীরামবাবু পুনরায় চিন্তামগ্ন হইলেন। তিনি বিশ্বনাথের সন্ধানের জন্য এবার যেরূপ ব্যাপকভাবে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহাতে আর বেশিদিন ফেরার থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। তবে কি বিশ্বনাথ তাঁহাকে বিপদে ফেলিবার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছে? সে তো ডাকাত,—বিশ্বাস কি?

কিন্তু তাহাকে একেবারে অবিশ্বাস করিতেও তো মন চায় না। হয়তো ইহাই উৎকৃষ্ট সুযোগ। তিনি তো সাহেবের কাছে অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, কোন সুযোগই ছাড়িবেন না। কাজ করিয়া যাইতে হইবে,—অদৃষ্টে যাহাই থাক্। ভাবিবারও বেশি সময় নাই।

নির্ভীক ডিটেকটিভ পত্রের নির্দেশমত হংসেশ্বরীর মন্দিরে যাওয়াই স্থির করিলেন।

১২

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপে হুগলী জেলার গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চল লোকাভাবে জঙ্গলে পরিণত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। পরিত্যক্ত বাস্তুভিটা, দেবালয়, পুকুর, বাগান ইত্যাদি আগাছায় ও বন্যলতায় ভরিয়া গিয়া বন্যপশুদের আবাসস্থল হইয়া উঠিতেছিল। অনেক গ্রামেই বাঘের ভয়ে কেহ সন্ধ্যার পর একাকী বাহির হইতে সাহস করিত না। এমন কি, কেহ বিপদে আপদে পড়িয়া চীৎকার করিলেও কাহারও উত্তর পাইত না।

বাঁশবেড়ের হংসেশ্বরী-মন্দিরের পিছনে এইরূপ এক জঙ্গলের মধ্য দিয়া একটি সরু পথ মন্দিরের দিকে গিয়াছে। জ্যোৎস্না সত্ত্বেও গাছের ছায়ায় পথের রেখা প্রায় অদৃশ্য। মধ্যরাত্রে চারিদিক নিস্তব্ধ,—কেবল মাঝে মাঝে মন্দির-শীর্ষস্থ পেচকের কলরব সেই নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল।

সেই পথের এক ধারে দাঁড়াইয়া শ্রীরামবাবু বিশ্বনাথের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সে অবস্থায় ভয়ের যথেষ্ট কারণ থাকিলেও তাঁহার মুখে ভয় বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নাই,—আছে শুধু দৃঢ়তা ও সাময়িক উত্তেজনার ঈষৎ আভাস। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি বিশেষ সতর্ক।

প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর তিনি কিছু দূরে এক অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্তি দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, মূর্তি তাঁহারই দিকে আসিতেছে। তখন তিনি ঝোপের আড়ালে বসিয়া পড়িলেন। মূর্তি আরও নিকটে আসিলে তিনি তাঁহার হাতের লাঠির হাতলে সংলগ্ন একটি বোতাম টিপিয়া সরাইয়া দিলেন ও আগন্তুককে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। মূর্তির মুখ ও সর্বাঙ্গ কাপড়ে ঢাকা ;—স্ত্রীলোক বলিয়া মনে হয়। গতিভঙ্গিও স্ত্রীলোকের মত ধীর ও সংযত।

আগন্তুক ঝোপের নিকটে আসিলে শ্রীরামবাবু অনুচ্চ স্বরে ডাকিলেন, "বিশ্বনাথ !"

আগন্তুক উত্তর দিল। তখন শ্রীরামবাবু বাহির হইয়া বলিলেন, "তুমি যে বেশে এসেছ, চেনাই শক্ত। আমি তো প্রথম মনে করেছিলুম যে, মন্দিরের পাশে বুঝি ডাকিনী ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"কি আর করি বলুন, আপনাদের জ্বালায় ডাকিনীই সাজতে হয়েছে। যা হোক, আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল, আমার সৌভাগ্য। মনে করেছিলুম, আমাকে হয়তো বিশ্বাস করতে পারবেন না।"

"তা কতকটা করেছি বইকি।"

বিশ্বনাথ শ্রীরামবাবুর লাঠির হাতলের দিকে তাকাইয়া বলিল, "হ্যাঁ, কতকটা করেছেন। কিন্তু সবটা বোধ হয় এখনও পারেন নি।" বলিয়াই ক্ষিপ্রহস্তে লাঠিটা চাপিয়া ধরিল। এ আক্রমণ শ্রীরামবাবু প্রত্যাশা করেন নাই। তিনিও দুই হাতে লাঠি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "লাঠি ছেড়ে দাও বিশ্বনাথ, বিপদে পড়বে।"

"আজ তো কারুর কোন বিপদের কথা নেই ইন্সপেক্টরবাবু। আমার ডাকে আপনি এসেছেন, কাজেই আমা হতে আপনার কোন বিপদ হবে না। তবে আজ আমাদের মাঝখানে পিস্তল কেন?"

"কিন্তু, আমি যে আজ তোমাকে ধরব মনে ক'রে এসেছি।"

"আমিও যে আজ ধরা দোব মনে ক'রে এসেছি।" বলিয়াই বিশ্বনাথ লাঠিগাছটা এক রকম জোর করিয়াই কাড়িয়া লইল। বলিল, "আপনার লাঠির মধ্যে পিস্তল আছে। আমাদের কথাবার্তার মাঝখানে হয়তো কখন ছুটে গিয়ে কার বুকে লাগবে। তার চেয়ে ও দূরে থাকাই ভাল।" বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া খানিকটা দূরে লাঠিটা রাখিয়া আসিল।

শ্রীরামবাবু একটু আপত্তি করিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল, "ইন্সপেক্টরবাবু, আপনি আমার জন্যে পিস্তল এনেছেন; কিন্তু আমি আপনার জন্যে কি এনেছি দেখুন।" বলিয়াই কোমরে বাঁধা একটি পুঁটলি দেখাইয়া দিল। শ্রীরামবাবু ঈষৎ চমকিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, বিশ্বনাথ বুঝি তাহার নাকে আবার সেই বিষাক্ত দ্রব্য চাপিয়া ধরিবে। কিন্তু বিশ্বনাথ পুঁটলিটি বাহির করিয়া তাহা না খুলিয়াই শ্রীরামবাবুর হাতে দিল। বলিল, "সোনার গয়না এতে আছে;—সবই ডাকাতির মাল। খুলে দেখতে পারেন,—বিষ নয়।"

শ্রীরামবাবু পুঁটলিটা খুলিয়া দেখিলেন, তাহাতে অনেকগুলি সোনার

যদি কিছু বলতে হয়, দেবতার স্থানেই বলব। আপনারও কাজ হবে, আমারও মনটা হাল্‌কা হয়ে যাবে। চলুন, মন্দিরে চলুন।”

১৩

ডুমুরদহের পূর্বোক্ত জঙ্গলে আবার কেদার ঘোষের দলের প্রধানদের বৈঠক বসিয়াছে। প্রায় বিশজন প্রধান নির্বাক নিশ্চল ভাবে কেদার ঘোষের দুই পাশে সারি দিয়া উপবিষ্ট। কেদারের সম্মুখে কালীমূর্তি, সকলেরই মুখে গভীর বিষাদের চিহ্ন। কেদারের উজ্জ্বল চক্ষু বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় জলভারে নিষ্প্রভ। কালী-প্রতিমার সম্মুখস্থ ম্রিয়মাণ দীপশিখার ক্ষীণ আলোকও যেন বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি!

কেদার সজলনয়নে কালী-প্রতিমার দিকে চাহিয়া বলিল, “মা, এই বুঝি আমার শেষ পূজা। জীবনে যা-ই কিছু ক'রে থাকি না কেন, কখনও শক্তির অপমান করি নি। তবু যদি জ্ঞানে কি অজ্ঞানে কোনও অপরাধ ক'রে থাকি, তোর অধম সন্তানকে ক্ষমা করিস মা।” বলিয়াই মূর্তির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল। প্রধানরাও সকলে মূর্তিকে প্রণাম করিল। তারপর প্রতিমা লইয়া কেদার মাথায় উঠাইল, ও সকলে নিঃশব্দে গিয়া নিকটবর্তী গঙ্গার জলে প্রতিমা বিসর্জন করিল।

দস্যুদল আবার সেই স্থানে ফিরিয়া আসিয়া সর্দারকে ঘেরিয়া বসিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। সকলেই যেন একটা আশু বিপদের সম্ভাবনায় অবসন্ন। আজ সর্দার কিছু একটা ভয়ানক কাণ্ড করিয়া বসিবে, ইহা সকলেই আশঙ্কা করিতেছিল।

প্রধানদের দিকে চাহিয়া কেদার বলিল, “ভাই সকল, আমরা এতদিন ধ'রে সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে পরস্পরের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ ক'রে

এসেছি। তোমরা কোনদিন আমার পদের অমর্যাদা কর নি। আমি যখন যা বলেছি, অম্লানবদনে তা করেছ। সব বিষয়েই প্রাণপণে আমার সহায়তা ক'রে এসেছ। আজ আমি তোমাদের কাছে বিদায় ভিক্ষা করছি। তোমাদেরই মধ্যে যাকে তোমরা উপযুক্ত মনে কর, তাকে আজ আমার জায়গায় সর্দার মনোনীত কর।"

প্রধানের দল ঈষৎ বিচলিত হইল, ও সর্দারের প্রস্তাবে আপত্তি-সূচক দুই-একটা মৃদু মন্তব্যও গুঞ্জরিত হইল। একজন প্রধান বলিয়া উঠিল, "কেন সর্দার, আমরা কি দোষ করলাম যে তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে? তুমি থাকতে আমাদের কেউ তোমার জায়গায় দাঁড়াবে না।"

"তোমরা কোন দোষ কর নি। আমিই দোষ করেছি।"

"তুমি কোন দোষ কর নি সর্দার। আমরা বুঝতে পেরেছি, তুমি কেন নিজেকে দোষী মনে করছ। কিন্তু তুমি এটা ভাবছ না সর্দার, যে আমরা কেউ বিশ্বনাথের বিচার চাই না।"

কেদারের চক্ষু ক্ষণতরে জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "হ্যাঁ, তোমরা চাও না, কিন্তু আমি চাই। আমি দলপতি,—আমার কাছে দুই দুই থাকবে কেন? বিশ্বনাথ পুলিসের কাছে ধরা দিয়ে সমস্ত স্বীকার করেছে, তার একমাত্র শাস্তি প্রাণদণ্ড।"

দস্যুদল শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু পর-মুহূর্তেই সকলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "না না, আমরা তার প্রাণদণ্ড চাই না।"

"তোমরা না চাইলেও তার সে দণ্ড হওয়া উচিত; কিন্তু—" বলিয়াই কেদার অধোবদন হইল। তাহার সমস্ত শক্তি যেন নিমেষে লুপ্ত হইল, সর্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল। "কিন্তু আমি তাকে সে দণ্ড দিতে পারব না। আমি যে তাকে সাত বছর থেকে বুকে ক'রে মানুষ করেছি। আমি পারব না—পারব না, আমার মনে দুর্বলতা এসেছে। তোমরা

আমাকে নিষ্কৃতি দাও।” বলিয়া কেদার তাহার বিশাল বক্ষ দুই হাতে চাপিয়া ধরিল। বলিল, “আমি এই বুক পেতে দিচ্ছি, তোমাদের বর্শা আমার বুকে চালিয়ে দাও।”

প্রধানের দল অধোবদন হইল। ইহার উত্তরে যে কে কি বলিবে তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না। সকলেই দ্বিতীয় নায়ক সিকদারের দিকে চাহিল।

সিকদার বলিল, “সর্দার, কেন শুধু শুধু মন খারাপ করছ? আমরা আদালত থেকে বিশুকে খালাস ক’রে আনব। তারপর সে যদি দলে থাকতে না চায়, তা হ’লে তার যা-ইচ্ছা তাই করবে।”

কেদারের চক্ষু আবার জ্বলিয়া উঠিল। সে গর্জিয়া বলিল, “সিকদার, এতদিনে তুমি তোমার মনের কথা বলেছ। এর জবাব একদিন না একদিন তোমাকে আমি দিতুম, কিন্তু—। যাক, আজ তার সময় নয়, যদি আবার কখনও—”

কিন্তু কেদারের কথা শেষ হইল না। সেই বনভূমি কম্পিত করিয়া পুলিসের বিউগল বাজিয়া উঠিল।

দস্যুদল চমকিত হইয়া দেখিল, সশস্ত্র পুলিস-বাহিনী তাহাদিগকে ঘেরাও করিয়াছে। আর পলাইবার পথ নাই।

তৎক্ষণাৎ তাঁহারা সর্দারকে মধ্যে রাখিয়া বর্শাহস্তে বৃত্তাকারে দাঁড়াইল। একজন বলিল, “চল সর্দার, আমরা এক দিক ফাঁক ক’রে বেরিয়ে পড়ি। গুলি চালালেও তোমার গায়ে গুলি লাগতে দোব না। আমরা মরতে মরতে তুমি ঠিক বেরিয়ে পড়তে পারবে।”

কেদার দৃঢ়স্বরে বলিল, “ভাই সকল, আজ আমাকে বাঁচাতে চেষ্টা ক’রো না। কেন অনর্থক কতকগুলো প্রাণ দেবে? আমি ধরা দোব।”

একজন বলিল, "আমরা আগে লড়াই করি, তারপর দরকার হয় তো ধরা দিও।"

কেদার বলিল, "তোমরা যদি নিজেদের জন্যে লড়াই কর তো করতে পার। কিন্তু আমি যদি দেখি যে আমাকে বাঁচাবার জন্যে লড়াই করছ, তা হ'লে তোমাদের সামনেই আমি—, বুঝতেই তো পারছ।"

প্রধানের দল চমকিয়া উঠিল। তাহারা জানিত, কেদারের সঙ্গে সর্বদা কি তীব্র বিষ থাকে ও তাহার ক্রিয়া কি। বর্শা নামাইয়া তাহারা অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন পুলিস-বাহিনী মশাল জ্বালাইয়া চারিদিক হইতে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা আরও নিকটে আসিলে শ্রীরামবাবুর সঙ্গে সিকদারের এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় হইল। কেদার ঘোষ তাহা লক্ষ্য করিল ও দন্তে দন্ত চাপিয়া সিকদারের উপর এক অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কিন্তু আজ আর তাহার প্রতিশোধ লইবার মত প্রবৃত্তি বা শক্তি নাই, আজ যে সে ধরা দিবে। নতুবা সন্ধান পাইলেও কাহার সাধ্য তাহাকে সহজে ধরে? আজ না ধরিলে হয়তো কাল সে নিজেই গিয়া পুলিসের হাতে ধরা দিত। ধরিলে তো তাহাকে জেলখানাতেই লইয়া যাইবে? সে যে তাহাই চায়।

১৪

শ্রীরামবাবুর নিকট বিশ্বনাথের স্বীকারোক্তি অনুসারে আসামী গ্রেপ্তার, খানাতল্লাশি ও তৎসংক্রান্ত নানারূপ তদন্তের ফলে হুগলীর ও কয়েকটি জেলার অনেকগুলি ডাকাতির কিনারা হইল। সিকদারও জেলখানায় আসিয়া সমস্ত স্বীকার করিয়াছিল, এবং তাহার স্বীকারোক্তি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। শ্রীরামবাবু বিশ্বনাথকে

ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করিতে বলিলে সে বলিল, "আমার যা বলবার ছিল দেবতার মন্দিরে আপনাকে সব বলেছি; আর বেশি বাঁধাবাঁধি কেন?" তিনি আর তাহাকে এ বিষয়ে কিছু বলিলেন না।

যথানিয়মে ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে মকদ্দমার শুনানির পর কেদার ঘোষ, বিশ্বনাথ, সিকদার ও আরও বাইশ জন আসামী গ্যাঙ্ কেসে দায়রা আদালতে সোপর্দ হইল।

এত বড় ডাকাতি মকদ্দমা সেই আদালতে আর কখনও হয় নাই। কেদার ঘোষ ও বিশ্বনাথকে দেখিবার জন্য আদালত-গৃহে বহু লোকের সমাগম হইল।

আসামীদের জন্য লোহার পাত দিয়া মজবুত করিয়া কাঠগড়া তৈয়ার করা হইয়াছিল। তাহার চারিদিকে পুলিস-প্রহরী। বিশ্বনাথ ও সিকদারকে অন্য আসামীদের সঙ্গে রাখা যুক্তিসঙ্গত ও নিরাপদ নয় বিবেচনা করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র কাঠগড়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কাঠগড়ার ভিতর কেদার ঘোষকে সম্মুখে রাখিয়া অন্য আসামীরা তাহার পশ্চাতে দুই সারি দিয়া দণ্ডায়মান। এই কয় মাসের মধ্যেই কেদারের অসাধারণ পরিবর্তন হইয়াছে। যেন কোন যাদুমন্ত্রবলে তাহার সমস্ত শক্তি, সমস্ত গৌরব লুপ্ত হইয়াছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তেজের সে স্পন্দন নাই, চক্ষুতে সে জ্যোতি নাই, মুখে সে প্রভুত্বব্যঞ্জক গাম্ভীর্য নাই। এখন সে যেন তাহার পূর্বমূর্তির জীবন্মৃত প্রতিকৃতি। দৃষ্টি নিম্নে নিবদ্ধ, কেবল মাঝে মাঝে যেন তাহা তাহার অজ্ঞাতসারেই অন্য কাঠগড়ার দিকে ছুটিতেছিল।

সরকারী উকিল মকদ্দমা আরম্ভ করিয়াই সিকদারকে সাক্ষীরূপে ডাকিলেন। সে নিম্ন আদালতেও ক্ষমা পাইবার শর্তে সাক্ষী দিয়াছিল।

তাহাকে সাক্ষীব কাঠগডাষ উঠিতে দেখিষাই কেদাব ঘোষেব চক্ষু নিমেষেব জন্য ক্রোধে জ্বলিযা উঠিল; কিন্তু পবক্ষণেই সে ঘৃণায মুখ ফিবাইল। যতক্ষণ তাহাব জবানবন্দী হইল, কেদাব একবাবও তাহাব দিকে চাহিল না। মনে হইল, তাহাব কথাব একটা বর্ণও যেন কেদাবেব কানে ঢুকিতেছে না।

তাহাব পব সাক্ষীরূপে বিশ্বনাথেব ডাক হইল। বিশ্বনাথ দৃঢ অথচ সংযত পদক্ষেপে সাক্ষীব কাঠগডাষ উঠিযা জজ-সাহেবকে অভিবাদন কবিযা কেদাবেব দিকে চাহিল। কেদাবেব দৃষ্টি তখনও অন্য দিকে। অশ্রুভাবাক্রান্ত সে নযনে যেন আব দৃষ্টিশক্তি নাই। বিশু তাহাব বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, তাহা সে কেমন কবিযা দেখিবে? সে তখন তাহাব হৃদযেব বেদনা চাপিবাব জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কবিতেছে। সে দৃশ্য দেখিযা সমস্ত আদালত নিস্তব্ধ।

বিশ্বনাথকে সম্বোধন কবিযা সবকাবী উকিল বলিলেন. "বিশ্বনাথ, তুমি পুলিসেব কাছে সমস্ত স্বীকাব কবিযাছ, কিন্তু নিম্ন আদালতে সাক্ষ্য দাও নাই। এখনও তোমাব সে সুযোগ আছে। এই সব ডাকাতিব সম্বন্ধে তুমি যাহা কিছু জান, তাহা এই মকদ্দমায সাক্ষীরূপে সত্য ও সম্পূর্ণভাবে এই আদালতে বলিতে পাব, তাহা হইলে বিচাবপতি তোমাব সমস্ত অপবাধ ক্ষমা কবিবেন।"

বিশ্বনাথ আবাব কেদাবেব মুখেব দিকে চাহিল। তাবপব বলিল, "আমি যা জানতুম সব ব'লে ফেলেছি। এখন আমাব মনে আব কিছুই নেই। কি বলব?"

কেদাব ঘোষ বিদ্যুৎস্পৃষ্টেব ন্যায চমকিয়া উঠিযা বিশ্বনাথেব দিকে চাহিল। তাহাব দেহ ঋজু হইযা উঠিল, মাংসপেশী সমস্ত ফুলিযা উঠিল, হস্তদ্বয মুষ্টিবদ্ধ হইল।

সরকারী উকিল বিস্ময়ে বিশ্বনাথের মুখের দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "বিশ্বনাথ, তুমি বোধ হয় এ সম্বন্ধে কি আইন, তা ঠিক জান না। তুমি পুলিসের কাছে যা বলেছ, এ দেশের আইন অনুসারে সেটা আদালতে গ্রাহ্য হবে না।"

বিশ্বনাথ একটু হাসিল। বলিল, "আইন আমি সামান্য কিছু জানি। পুলিসের কাছে যা বলেছি, আইন অনুসাবে তার যদি কোন মূল্যই না থাকে, তা হ'লে সে দোষ আমার নয়, আপনাদের আইনের। আমি এক কথা দুবার বলব না।"

"তা হ'লে তোমাকে মাপ করা যেতে পারবে না। অন্য আসামীদের সঙ্গে তোমার বিচার হবে।"

"বেশ, তাই হোক।" বলিয়া বিশ্বনাথ কেদাব ঘোষের দিকে চাহিতেই সে জলদগম্ভীরস্বরে আদালত-গৃহ কম্পিত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "দাদু—দাদু—তুই সাক্ষী দিলি না? তা হ'লে দেখ্ এই বুড়ো হাড়ে এখনও কত জোর ধরি?" বলিয়াই কাঠগড়ার গরাদে ধবিয়া সবলে টান দিল। তখন অন্য সব আসামীও "জয় কালী মায়ি-কি জয়" হাঁকিয়া একসঙ্গে কাঠগড়ার রেলিংএর উপব চাপ দিতেই তাহার উপরের কাঠের বাঁধন খসিয়া পড়িল। পুলিস-প্রহরীবা আসামীদিগকে আটকাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু দুই-তিন জন ব্যতীত সকলেই বাহিব হইয়া পড়িল। কেদার ঘোষ সিকদারকে লক্ষ্য করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইবামাত্র কয়েকজন পুলিস-প্রহরী তাহাকে আক্রমণ করিল। তখন বিশ্বনাথ কাঠগড়া হইতে বাঘের মত লাফাইয়া পড়িয়া তাহাদের দিকে ছুটিল। সিকদার সেই সুযোগে নিকটবর্তী দরজা দিয়া বাহির হইয়া উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

তখন দর্শকেরা হুড়াহুড়ি করিয়া আদালত-গৃহ হইতে বাহির হইতেছে।

সুতরাং পুলিস-প্রহরীরা বন্দুক চালাইবার সুবিধা পাইল না, কিংবা বন্দুক রাখিয়া হাত চালাইবে কি না তাহাও স্থির করিতে পারিল না। বেগতিক দেখিয়া বৃদ্ধ জজ-সাহেব দুর্গানাম স্মরণ করিতে করিতে খাস-কামরায় ঢুকিলেন। জুরিরা যে যে দিকে পারিল ছুটিল। কেবল শ্রীরামবাবু দৃঢ়পদক্ষেপে কেদার ঘোষের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া কেদার গর্জিয়া উঠিল, "তবে রে কলকাতার বজ্জাত!" বলিয়াই এক সিপাহীর হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়া তাঁহার মাথা লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল। বিশ্বনাথ কেদারের উদ্যত হস্ত ধরিয়া ফেলিয়া শ্রীরামবাবুকে বলিল, "বাবু, এখানে আমাদের ধরবার চেষ্টা করবেন না। স'রে যান।" বলিয়া একরকম জোর করিয়াই তাঁহাকে ঠেলিয়া আদালত-গৃহের বাহির করিয়া দিল।

কেদার ও বিশ্বনাথকে অগ্রে রাখিয়া দস্যুদল একসঙ্গে আদালত-গৃহ হইতে ছুটিল। সমবেত জনতা ও পুলিস তাহাদের পিছনে ও দুই পাশে ছুটিল ও ইট-পাটকেল যে যাহা পাইল তাহা আসামীদের উপর ছুঁড়িতে লাগিল। পুলিস ভয় দেখাইবার জন্য দুই-চারিটা গুলি উপর দিকে ছুঁড়িল। কিন্তু দস্যুদল ছত্রভঙ্গ হইয়া এ-দিকে ও-দিকে পলাইবার চেষ্টা করিল না। তাহারা সংযতভাবে একসঙ্গে ছুটিয়া চলিল।

সম্মুখে ছোট নদী,—বর্ষায় খরস্রোতা। গত্যন্তর না দেখিয়া দস্যুদল নদীর জলে লাফাইয়া পড়িল। কিন্তু পরক্ষণেই সভয়ে দেখিল যে, নদীর অপর পারে লোক-বোঝাই-করা কয়েকখানি ঘোড়ার গাড়ি তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রীরামবাবু পুলিস-লাইন হইতে সিপাহী লইয়া কাছারির ঘাটের অপর পারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বিশ্বনাথ বুঝিল, আর রক্ষা নাই।

দস্যুদল নদীর স্রোতে ভাসিয়া চলিল। জনতাও নদীর কূলে কূলে তাহাদের সঙ্গে ছুটিল।

সংবাদ পাইয়া ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব তাঁহার সপ্তদশবর্ষীয়া কন্যা সহ নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের উভয়েরই হাতে বন্দুক।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তোমরা ধরা দাও, নইলে গুলি করব।" কিন্তু তখন কে কাহার কথা শুনে! অগত্যা তিনি নদীগর্ভে গুলি ছুঁড়িলেন। বালিকাও গুলি চালাইবার উপক্রম করিতেই তিনি বলিলেন, "Shoot but do not kill" দুই-তিন জন সিপাহীকেও এরূপ আদেশ দিলেন। তখন তাহারা সকলেই মাঝে মাঝে গুলি করিতে করিতে নদীর কিনারা দিয়া ছুটিল।

ইতিমধ্যে দুই-তিনখানা নৌকাতে সিপাহী লইয়া 'ছোট বাবাজী' আসামীদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

একটা গুলি বিশ্বনাথের খুব কাছে গিয়াই পড়িল। বিশ্বনাথ হাঁকিল, "দাদু, তোমরা ধরা দাও।"

কেদার হাঁকিল, "আর তুমি?"

"আমাকে ধরে কে?"

কিন্তু ধরা দিবার বড় আবশ্যক হইল না। ছোট বাবাজীর নৌকা নিকটে আসিতেই গুলি চালানো বন্ধ হইল। তখন আসামীরা ক্লান্ত,—দুই-চার জন জখমও হইয়াছে। একে একে আসামীদিগকে ধরিয়া নৌকাতে তোলা হইল।

বিশ্বনাথ অন্য আসামীদের কিছু আগে ছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামবাবু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই কিনারা দিয়া ছুটিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, বিশ্বনাথ চিৎ হইয়া ভাসিতেছে ও এক হাতে জল

কাটিতেছে। দেখিয়াই তিনি নদীতে লাফাইয়া পড়িলেন ও বিশ্বনাথের দিকে অগ্রসর হইলেন।

তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া বিশ্বনাথ হাত তুলিল, ও সেই এক হাত দিয়াই যেন কাহার উদ্দেশে প্রণাম করিল। শ্রীবামবাবু বুঝিলেন যে, সে তাহার মাকে উদ্দেশে প্রণাম করিতেছে। চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ডুবো না বিশ্বনাথ, ডুবো না।"

বিশ্বনাথেব যাতনাক্লিষ্ট অধরে তাহার চিরাভ্যস্ত হাসি মেঘান্তরে অস্তগামী সূর্যের শেষরশ্মির মত ক্ষণতরে ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। বলিল, "আব ডোববার বাকি কি আছে ইন্সপেক্টরবাবু? আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। ক্ষমা করুন।"

ততক্ষণে শ্রীরামবাবু তাঁহাব সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া দ্রুতবেগে বিশ্বনাথেব প্রায় কাছে গিযাই পড়িয়াছেন। উচ্চৈস্বরে বলিলেন, "বিশ্বনাথ, ডুবো না, ডুবো না। তোমার হাতে গুলি লেগেছে,—সেবে যাবে। আত্মহত্যা ক'রো না। তুমি আব একজনের জীবন-মরণেব জন্য দায়ী, সেটা মনে কব।"

"আজ আমি সব বন্ধন থেকে মুক্তি চাই ইন্সপেক্টরবাবু।"

"কিন্তু তা হবে না বিশ্বনাথ। তুমি যে আমাকে তোমার ছেলের অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন করেছ, সন্ধি ভঙ্গ ক'রো না।" বলিয়াই শ্রীরামবাবু বিশ্বনাথের মূর্ছিতপ্রায় দেহ সবলে জড়াইয়া ধরিলেন।

১৫

যে সমস্ত আসামী ধরা পড়িয়াছিল, তাহাদের বিচার শেষ হইল। ইতিহাস বলে যে, কেদার ঘোষের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইয়াছিল; কিন্তু

কিম্বদন্তী বলে অন্যরূপ। বিশ্বনাথের দশ বৎসর জেলের হুকুম হইল। অন্যান্য আসামীদেরও যথোপযুক্ত দণ্ড হইল।

বিশ্বনাথের স্বীকারোক্তি হইতেই অনেকগুলি ডাকাতির কিনারা হইয়াছিল—এই কারণ দেখাইয়া শ্রীরামবাবু গভর্মেণ্টের নিকট তাহার দণ্ডলাঘবের প্রার্থনা করিলেন, ও যথাসময়ে তাহা মঞ্জুর হইল। আর কখনও কোন অসৎ কার্য করিবে না—এই শর্তে বিশ্বনাথ মুক্তি পাইল।

বাবু—ড্রাইভার

পূজাব ছুটি। পাটনাব প্রসিদ্ধ ডিটেকটিভ তাবিণীবাবু সেই সঙ্গে আব কযেক দিনেব ছুটি লইযা দেওঘব আসিযাছেন। উদ্দেশ্য—বিশ্রাম, বায়ুপবিবর্তন, দেবদর্শন, দেওঘবে একটি ছোট বকমেব বাডি কবিবাব জন্য স্থান-অন্বেষণ ও কন্যাব বিবাহেব জন্য পাত্র-পবিদর্শন। বাঙালীব ছুটিব এই দশা,—অর্থাৎ চাকবিতে থাকিলে যত খাটুনি, ছুটি লইলে তাহাব সাত গুণ।

তাবিণীবাবুব সঙ্গে তাঁহাব বন্ধু নগেনবাবু উকিলও আসিযাছেন। উভযে বৈদ্যনাথেব মন্দিব হইতে পূজা করিযা বাহিব হইবাব সময় নগেনবাবু বলিলেন, "ভাই তাবিণী, দেবতাব কাছে কি প্রার্থনা কবলে বল? প্রকাশ্যে চক্ষুলজ্জাব খাতিবে কিছু না বললেও মনে মনে সকলেই দেবতাব নিকট একটা আবেদন কবে তো, তা তোমাব সম্প্রতি আকাঙ্ক্ষাটা কি?"

"আকাঙ্ক্ষাব তো শেষ নেই ভাই, যত দিন একবাবে ছাডচিঠি না পাই। তবে উপস্থিত দেবতাকে ব'লে এলুম, 'বাবা বৈদ্যনাথ, যদি পাব, তা হ'লে অন্তত এই ক'টা দিন আমাব মস্তিষ্কটি পুলিসতত্ত্ব থেকে মুক্ত ক'বে বাখ।' এখন দেখা যাক, দেবতা কথাটা বাখেন কি না।"

বাসায ফিবিবামাত্র ভৃত্য একখানি টেলিগ্রাম তাবিণীবাবুব হাতে দিল। টেলিগ্রামের ওজনটা অনুভব কবিযাই তাহা খুলিতে খুলিতে তাবিণীবাবু বলিলেন, "দেবতা বোধ হয প্রার্থনাটা নামঞ্জুব কবলেন হে নগেন, পাটনায ফিবতে হয বুঝি।" পডিযা নগেনবাবুব হাতে দিযা বলিলেন, "এই দেখ, যা বলেছি তাই। তবে দেবতা এইটুকু কৃপা কবেছেন যে, কাজটা এইখানেই, আর দায়িত্বটাও পুরো মাত্রায় নয়।"

নগেনবাবু টেলিগ্রাম পড়িয়াই বলিলেন, "তাই তো, ছুটিতেও কাজ? আচ্ছা চাকরি ভাই তোমার!"

"বরাত ভাই, বরাত; ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।—চল, একবার থানাটা ঘুরে আসি। ব্যাপারটা কি বোঝাই যাক।'

"আমাকেও যেতে হবে নাকি?"

"তা ছাড়া আব উপায় কি বল? তিন রাত্রি পুলিসের সঙ্গে বাস করেছ, এখন তেরো রাত্রি তার ধাক্কা সামলাও।"

দুই বন্ধু থানায় উপস্থিত হইলেন। দারোগাবাবু তখন নিবিষ্ট মনে ডাইরি লিখিতেছিলেন। তারিণীবাবুকে দেখিয়াই একটু চমকিয়া উঠিলেন ও হাসিয়া বলিলেন, "আসুন তারিণীবাবু, বসুন। একটা বেয়াড়া কেস নিয়ে পড়েছি পরশু রাত্রি থেকে। ইনি কে?"

"আমার বন্ধু নগেনবাবু—উকিল। আমরা একসঙ্গে পাটনা থেকে এসেছি।"

"বসুন, বসুন। তারপর ছুটি ভোগ করছেন কেমন বলুন?"

"এই দেখুন ছুটির নমুনা।"—এই বলিয়া তারিণীবাবু টেলিগ্রামটি দারোগাবাবুর হাতে দিলেন। পড়িতে পড়িতে দারোগাবাবুর বদন-মণ্ডল ঈষৎ গম্ভীর হইল, কিন্তু অন্তরের ভাব চাপিয়া রাখিয়া মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন, "তা বেশ তো; আমার সৌভাগ্য যে আপনার সাহায্য পাব। কিন্তু তদন্ত প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আর বিশেষ কিছু করবার নেই, বোধ হয় দুই-একদিনের মধ্যে মকদ্দমা আদালতে চালান দিতে পারা যাবে।"

"শুভ শুভ! তা হ'লে তো বেঁচে যাই মশাই। যা হোক, মকদ্দমাটা কি বলুন দেখি? এমন কি গুরুতর ব্যাপার যে আপনার

টেলিগ্রাম যেতে না যেতেই হেড অফিস থেকে এই গরিব বেচারার ওপর এমন জরুরী হুকুম এসে পড়ল ?"

"এই দেখুন সেই মকদ্দমার ডাইরি লিখছি।" এই বলিয়া দারোগা-বাবু তাঁহার কাগজপত্র আগাইয়া দিলেন।

"থাক্ থাক্, ও পরে দেখব এখন। ঘটনাটা মোটামুটি বলুন। আমার আর কিছু করবার আছে কি না তাই আগে দেখি।"

দারোগাবাবু একটু নগেনবাবুর মুখের পানে তাকাইলেন। তারিণীবাবু তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ওঁর কাছে বলতে পারেন; উনি আর এখন উকিল নন—দেওঘরের চেঞ্জার। কি বল হে নগেন ?" বলিয়া আর একটু হাসিলেন।

দারোগাবাবু বলিলেন "প্রায় এক বৎসর মহেন্দ্র চৌধুরী নামে পূর্ব-বঙ্গের এক জমিদার বম্পাস টাউনে একটি বাড়িতে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্যে বাস করছেন। তাঁর কর্মচারী রমেশও সেই বাড়িতে থাকত। সেই রমেশটি পরশু রাত্রে তার নিজের ঘরে খুন হয়েছে।"

"কেমন ক'রে খুন হ'ল ?"

"ছুরির আঘাতে। রাত্রি নটার সময় সেই ঘরে সে চীৎকার ক'রে ওঠে। তা শুনে একটা চাকর ছুটে গিয়ে দেখে যে, সে মেঝেতে প'ড়ে ছটফট করছে ও একটা রক্তমাখা ছুরি একটু দূরে প'ড়ে রয়েছে। তাকে ওঠাতে গিয়ে দেখে যে গলা দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে,—আর কোথাও জখম নেই। তারপর সে মনে করে যে ম'রে গেছে; কিন্তু মুখে একটু জল দিতেই সে একবার মাত্র একটু চেয়ে বলেছিল, 'বাবু—ড্রাইভার'। তার একটু পরেই মারা যায়, আমি গিয়ে জীবিত পাই নি।"

তা। বাড়িতে আর কে কে থাকে ?

দা। কেবল মাত্র দুজন চাকর ও একজন দরোয়ান মহেন্দ্রবাবুর পরিবারবর্গ কলকাতায় থাকে।

তা। আর কেউ কিছু বলতে পারে?

দা। কিছু না।

তা। বাবু?

দা। তিনি তো সদাই অসুস্থ। বলেন, তিনি তখন নিজের ঘরে ঘুমুচ্ছিলেন। একটা চাকর গিয়ে ডাকতেই বেরিয়ে এসে এই কাণ্ড দেখলেন, আর তখনই থানায় খবর পাঠিযে দিলেন।

তা। ড্রাইভারটি কে, কিছু খোঁজ পেয়েছেন?

দা। হঁ্যা, মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে এসেছিল। রমেশ তাকে দেখতে পারত না,—কেন, তা কেউ বলতে পাবে না; দুজনে মাঝে মাঝে খুব ঝগড়া করত সামান্য ছোটখাট ব্যাপাব নিয়ে। রমেশের কথাতেই প্রায় পনরো দিন আগে মহেন্দ্রবাবু তাকে জবাব দেন। রমেশের কাছে কিছু টাকা পাওনা আছে ব'লে সে তার চাকরি যাবার পরেও দু-তিন দিন এখানে এসেছিল। কিন্তু রমেশ তাকে বকাবকি ক'রে তাড়িয়ে দিত। খুনের দিনও সন্ধ্যাবেলায় সে এসেছিল, আব রমেশ তাকে সেই রকম বকাবকি করেছিল।

তা। ড্রাইভারটিকে কি পেয়েছেন?

দা। হঁ্যা, সে এখন হাজতে।

তা। কি বলে?

দা। কিছু না,—সব অস্বীকার। তবে সেদিন ওখানে যাওযাটা স্বীকার করে। যাক, মোটের উপর প্রমাণ মন্দ নয়, এতেই তাকে দায়রা পর্য্যন্ত যেতে হবে,—কি বলেন?

তারিণীবাবু কি যেন একটু ভাবিয়া বলিলেন, "যদি আপনার তদন্ত

শেষই হয়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে বোধ হয় আর আমার সাহায্যের দরকার নেই। আপনি যদি সেই ব'লে আপনার সাহেবকে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দেন, তা হ'লে আমি আর এতে হাত দিই না। নগেন ভায়ার সঙ্গে দুদিন নিশ্চিন্ত মনে হাওয়া খেয়ে বেড়াই।"

দারোগাবাবুরও তাই ইচ্ছা, কিন্তু এ প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইতে পারিলেন না। বলিলেন, "তা কেমন ক'রে হবে তারিণীবাবু? বুঝতে পারছেন তো,—বড়লোকের বাড়িতে খুন, কাজেই মকদ্দমাটার একটু বিশেষত্ব আছে, তা না হ'লে আর হেড অফিস থেকে আপনার ওপর এ হুকুম আসে? আপনি যখন এখানে আছেন তখন একবার দেখুন, যদি আসামীর বিরুদ্ধে আর কোনও প্রমাণ বের করতে পারেন।"

তারিণীবাবু প্রত্যুত্তরে একটি লম্বা রকমের "হুঁ" দিয়া বলিলেন, "তা হ'লে একবার আপনার আসামীটির সঙ্গে জেলখানায় দেখা করতে হয়। যখন বলছেন তাকে দায়রা পর্যন্ত যেতেই হবে, তখন দেখি যদি বেচারাকে আর ফিরে এসে কষ্ট ক'রে ড্রাইভারি করতে না হয় তার কোন ব্যবস্থা করতে পারি কি না। আপনি ততক্ষণ ডাইরিটা শেষ ক'রে ফেলুন। আমি জেলখানা থেকে এসে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে একবার মহেন্দ্রবাবুর বাড়িটা দেখে আসব। কি বলেন?" তারপর নগেনবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি এইখানেই একটু থাক হে ভায়া। আমাদের সঙ্গে আজ না হয় কিছু তদন্তই করলে।" এই বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে তারিণীবাবু যখন থানায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার ভাবটা যেন একটু গম্ভীর।

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কিছু বললে?"

"না, নতুন এমন কিছুই নয়। চলুন, একবার ঘটনাস্থলটা দেখে আসি।" এই বলিয়া তিন জনে বাহির হইয়া গেলেন।

মহেন্দ্রবাবুর বাড়িটি একতলা, দক্ষিণদ্বারী, বেশ উঁচু, সামনের বারান্দার পিছনেই হল্, তাহার প্রত্যেক পাশে দুইখানি করিয়া ঘর ও পিছনে ঘেরা বারান্দা, অতএব সেটিও একটি ঘরের মত। পশ্চিম দিকে যে দুইখানি ঘর, তাহার একটিতে মহেন্দ্রবাবু জমিদারি-সংক্রান্ত কাজকর্ম করিতেন ও অন্যটিতে রমেশ এবং জমিদারির কাগজপত্র থাকিত। হলের পূর্ব দিকের ঘর দুইখানি মহেন্দ্রবাবুর বসিবার ও শুইবার ঘর। বাড়ির উত্তরে ও পশ্চিমে প্রায় দেওয়ালের কাছ পর্যন্ত সব্‌জির বাগান। মহেন্দ্রবাবুর কাজ করিবার ঘর সন্ধ্যা হইতে বন্ধ থাকে, সুতরাং রমেশের ঘরে সন্ধ্যার পর যাইতে হইলে হলের ভিতর দিয়া কিংবা মহেন্দ্রবাবুর শুইবার ঘর ও উত্তরের বারান্দা দিয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই ; তবে জানালার গরাদে নাই, সেই জন্য জানালা দিয়া রমেশের ঘরে ঢোকা কিংবা ঘর হইতে বাহির হওয়া অসম্ভব নয়।

রমেশের চীৎকার শুনিয়া যে চাকর হলের ভিতর দিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার ঘরে আসে, সে কাহাকেও বাহির হইয়া যাইতে দেখে নাই। এবং সামনের উঠানে আর একজন চাকর ও দারোয়ান বসিয়া গল্প করিতেছিল, তাহারাও কাহাকেও বাড়িতে ঢুকিতে কিংবা বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাইতে দেখে নাই। সুতরাং দারোগাবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হত্যাকারী জানালার ভিতর দিয়া আসিয়াছিল ও সেই দিকেই বাহির হইয়া গিয়াছে।

ঘরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া এবং রমেশ কোথায় পড়িয়া ছিল ও ছুরিখানা কোথায় ছিল ইত্যাদি দারোগাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া তারিণীবাবু প্রথমেই সেই চাকরকে ডাকিলেন। তাহাকে কিছু

জিজ্ঞাসা করিবার আগেই সে নয়ন দুইটি রীতিমত অশ্রুসিক্ত করিয়া ও দুই-একটা দীর্ঘশ্বাসমিশ্রিত খেদোক্তির ভূমিকা করিয়া রমেশের গুণকীর্তন আরম্ভ করিলে তারিণীবাবু ধীরভাবে বলিলেন, "বাপু, সে তো আর ফিরবে না। এখন তুমি এসে কি দেখলে আর শুনলে তাই বল।"

তখন সে বলিল, "বাবু, আমি বাবুর বসবার ঘরের দরজা বন্ধ করতে আসছিলুম। বারেন্দায় ওঠবার সময় রমেশবাবুর চীৎকার শুনতে পেলুম, আর তখনই হলের ভিতর দিয়ে ছুটে তার ঘরে গিয়ে দেখলুম যে, সে মেঝেতে প'ড়ে ছট্‌ফট্ করছে। আমি তার মুখে একটু জল দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'বাবু, কি হয়েছে?' বললে, 'বাবু—ড্রাইভার।' আর কিছু বলতে পারলে না।"

তারিণীবাবু বলিলেন, "থাম, থাম। সে এই ব'লেই চুপ করলে, না, তার আরও কিছু বলবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বলতে পারলে না—এই রকম মনে হ'ল?"

"হ্যাঁ বাবু, আরও কিছু যেন বলতে যাচ্ছিল; কিন্তু বলতে পারলে না।"

"আচ্ছা, তারপর?"

"তখন তাকে তুলতে গিয়ে দেখলুম, তার গলা দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে,—আর ছুরিখানা ঐখানে প'ড়ে আছে। এই দেখে আমার বড় ভয় হ'ল। আমি আর কিছু না ক'রে তখনই বাবুর ঘরে ছুটে গিয়ে তাঁকে খবর দিলুম।"

তা। বাবুর ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, না, খোলা ছিল?

চা। বন্ধ ছিল, বাবু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তিন-চার ডাকের পরে উত্তর দিলেন।

তা। তিনি কি রোজই ঐ সময় ঘুমোন?

চা। তার কিছু ঠিক নেই। কোন কোন দিন দশটার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েন; আবার কোন কোন দিন দেরিও হয়।

তা। ড্রাইভার সেদিন কখন এসেছিল ?

চা। সন্ধ্যের একটু পরেই। রমেশবাবুর সঙ্গে খুব বকাবকি হয়। তারপর সে বাবুর ঘরে গিয়ে তাঁকে অনেকক্ষণ ধ'রে কি সব বলেছিল।

তা। কি বলেছে তুমি শুনতে পেয়েছিলে ?

চা। ঠিক শুনতে পাই নি। কারণ আমি তখন রান্নাঘরে ছিলুম। কিন্তু বুঝতে পারলুম যে রমেশবাবুর কথাই বলছে।

তা। রমেশ তখন বাবুর ঘরে আসে নি ?

চা। না। ড্রাইভারের সঙ্গে বকাবকি ক'রেই রমেশবাবু বেরিয়ে গেলেন, আর ফিরে আসার প্রায় পনরো মিনিট পরেই এই কাণ্ড।

তা। ড্রাইভারকে তোমরা বেরিয়ে যেতে দেখেছিলে ?

চা। হ্যাঁ বাবু, আমরা সকলে তাকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি,—আর আসতে দেখি নি।

তা। ছুরিখানা কোথায় থাকত ?

চা। রমেশবাবুর এই টেবিলের ওপর।

তা। আচ্ছা, তুমি যাও। বাবুকে খবর দাওগে যে, আমরা এসেছি। শুনলুম; তাঁর শরীর ভাল নেই,—আমরা তাঁর ঘরে গিয়েই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করি।

চাকর চলিয়া গেলে তারিণীবাবু দারোগাবাবুকে বলিলেন, "দেখুন, 'ড্রাইভার' তো এক রকম বোঝা গেছে। কিন্তু ঐ যে 'বাবু' কথাটা বলেছে, তার কোনও একটা অর্থ কিছু ধরতে পেরেছেন কি ?"

দারোগাবাবু যেন একটু গোলমালে পড়িলেন। এটা যে তাঁহার মনে উদয় হয় নাই তাহা নহে; কিন্তু তিনি ইহার মীমাংসা কিছুই করিতে

পারেন নাই। সুতরাং উদয় হইবামাত্র চাপা দিয়াছিলেন। নগেন্দ্রবাবু আইন-ব্যবসায়ী, অতএব কোন একটা জটিল প্রশ্ন হঠাৎ উপস্থিত হইলে অবিলম্বে তাহার কৈফিয়ৎ দেওয়া তাঁহার অভ্যাস আছে। তিনি বলিলেন, "এটা এমন কিছু অসাধাবণ নয়। রমেশ তো তখন প্রায় অজ্ঞান অবস্থায়, তার এটা মনে করা অসম্ভব নয যে বাবুই তার চীৎকাব শুনে তার ঘরে এসেছেন।"

দাবোগাবাবু যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বলিলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো ঠিক, তাই-ই।"

তারিণীবাবু ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার অভ্যাসমত একটি হুঁ দিলেন ও বলিলেন, "তা হ'লে, মৃত্যুকালেও যদি একটা লোকের মনে হয় যে, বাবুবই সকলের আগে আসা সম্ভব, তখন আমরা এতগুলো সজীব লোক খুব ক'রে ভেবে-চিন্তে বোধ হয় সে অনুমানটা করতে পারি।"

দারোগাবাবু একটু জোরেব সহিতই বলিলেন, "হ্যাঁ, সে অনুমানটা ঠিক হ'ত যদি বাবু জেগে থাকতেন। কিন্তু ঐ তো শুনলেন তিনি ঘুমুচ্ছিলেন। তিনি নিজেও তাই বলেন।"

তারিণীবাবু আর একটি হুঁ দিলেন।

ঘরের জানালাটি বেশ করিয়া দেখিয়া তারিণীবাবু বাহিরে আসিলেন ও বাড়ির পশ্চিম ও উত্তর প্রান্ত সংলগ্ন সব্জীর বাগান দেখিলেন। বাগানের মাটি আলগা ছিল ও ঘটনার দিন বৃষ্টি হইয়াছিল। দারোগাবাবুর নিকট শুনিলেন যে, কোথাও পদচিহ্ন পাওয়া যায় নাই। দারোগাবাবুর বিশ্বাস, হত্যাকারী বাগানের মধ্য দিয়া যাতায়াত না করিয়া বাটির প্রাচীরের ধারে ধারে গিয়া পূর্ব দিকের দেওয়াল টপকাইয়া পলাইয়াছে। তারিণীবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তা হ'লে দেখছি, সে আপনার-আমার চেয়েও বড ডিটেকটিভ। ড্রাইভারি না

ক'রে যদি আমাদের লাইনে আসত, তা হ'লে আজ আসামী না হয়ে রায় বাহাদুর হয়ে যেত। চলুন, একবার গৃহস্বামীকে দর্শন করা যাক।" তারপর নগেনবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার আর আমাদের সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই হে নগেন। তুমি ততক্ষণ বারান্দায় ব'সে দেওঘরের হাওয়া খাও।"

মহেন্দ্রবাবুর ঘরে ঢুকিয়াই সুদক্ষ ডিটেকটিভ যেন কোন মন্ত্রবলে নিজের সমস্ত ভাবভঙ্গী বদলাইয়া ফেলিলেন। আর চক্ষুর সে জ্যোতি নাই, মুখে সে বুদ্ধিমত্তার বিকাশ নাই, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন নড়িতেই চায় না। দারোগাবাবু তারিণীবাবুর পরিচয় দিলেন। মহেন্দ্রবাবু একখানা চাদর গায়ে ঢাকা দিয়া শুইয়া ছিলেন। তিনি তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলেন ও শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি এতক্ষণ তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বসিবার চেয়ার দুইটি মহেন্দ্রবাবুব বিছানা হইতে কিছু অস্বাভাবিক রকমের দূরে রাখা হইয়াছিল। দাবোগাবাবু একখানা চেয়ার টানিয়া বিছানার আরও কাছে লইবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু তখনই তারিণীবাবু থপ করিয়া অন্যটাতে বসিয়া পড়িলেন; অগত্যা দারোগাবাবুকেও সেইখানেই বসিতে হইল।

মহেন্দ্রবাবুর বেশ সুগঠিত দেহ, বয়স অনুমান পঁয়তাল্লিশ বৎসর। দেশে প্রায় যান না, কলিকাতাতেই থাকেন; কিন্তু সম্প্রতি সেখানে শরীর ভাল না থাকায় প্রায় এক বৎসর দেওঘরে আছেন। রমেশ তাঁর এস্টেটে চার-পাচ বৎসর কাজ করিতেছিল, এবং ড্রাইভারকে তিনি কলিকাতা হইতে আনিয়াছিলেন। দুইজনে প্রায়ই ঝগড়া করিত। শেষে বিরক্ত হইয়া তিনি ড্রাইভারকে কিছুদিন পূর্বে জবাব দিয়াছেন।

তারিণীবাবু শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্কভাবে নিজের মনে মনেই যেন বলিলেন, "তা হ'লে ড্রাইভারটা বড় বদ লোক।"

"না না, আমার তো তাকে বদ লোক ব'লে মনে হ'ত না, রমেশই যখন-তখন খিটিমিটি করত। আমি তাকে ছাড়াতাম না, কিন্তু সম্প্রতি এমন বাড়াবাড়ি হয়ে উঠেছিল যে নিতান্ত বিরক্ত হয়েই আমি একজনকে সরালাম।"

তারিণীবাবু সেইভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার ওপর বিরক্ত হয়ে? ড্রাইভারের ওপর?"

মহেন্দ্রবাবু একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, "না, ঠিক তা নয়,—তবে হ্যাঁ, তা বই আর কি?"

তারিণীবাবু বলিলেন, "তা যাক, আপনার শরীর খারাপ, আপনাকে আর বিরক্ত করব না। আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। রমেশ মারা যাবার আগে 'বাবু—ড্রাইভার' এই কথাটা বলেছিল। সে সম্বন্ধে আপনার কিছু মনে হয় কি?"

"দেখুন, ওটা আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না। ও চাকর ব্যাটা পাড়াগেঁয়ে লোক, কি শুনতে কি শুনেছে; হঠাৎ এই কাণ্ড দেখে-শুনে তার কি আর মাথার ঠিক ছিল?"

"হ্যাঁ, তা তো ঠিকই।"

"দেখুন, আমার তো মনে হয়—" বলিয়াই মহেন্দ্রবাবু চুপ করিলেন।

"কি মনে হয়?"

"না না, সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। আপনারা কেস দেখছেন, আমার কিছু বলা উচিত নয়।"

"বলুনই না। তাতে আর দোষ কি?"

"আচ্ছা, আপনি যখন বলছেন, তখন বলি। আমার মনে হয়, রমেশকে কেউ মারে নি। সে নিজেই গলায় ছুরি মেরেছে।"

শুনিয়া দারোগাবাবু গর্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বলেন কি মশাই! নিজেই ছুরি মারলে ছুরিখানা কখনও অত দূরে গিয়ে পড়তে পারে?"

তারিণীবাবু বিশেষ কোন আগ্রহ না দেখাইয়া বলিলেন, "তা না হয় পড়ল। আচ্ছা, রমেশ আত্মহত্যা করবে কেন? কিছু কারণ ছিল কি?"

"তা তো কিছু বলতে পারি না। তবে আজকাল যুবকদের মনে কখন কি ভাব উদয় হয় তা তো বলা যায় না,—নানারকম কারণ অনুমান করা যেতে পারে।"

দারোগাবাবু বলিলেন, "কেন ওসব বাজে কথা বলছেন মশাই? ডাক্তারী পরীক্ষায় স্পষ্ট বলছে যে, আত্মহত্যা নয়। আপনি আমি আত্মহত্যা বললেই তো হবে না।"

তারিণীবাবু একটু অলসভাবে কড়ির পানে তাকাইয়া বলিলেন, "তা আত্মহত্যাও হতে পারে,—কার মনে কখন কি ভাব ওঠে তা তো বলা যায় না।" তারপর একটা হাই তুলিয়া বলিলেন, "ঘুম পাচ্ছে যেন।" এবং মহেন্দ্রবাবুর শয্যার উপর রক্ষিত পানের ডিবার পানে তাকাইয়া বলিলেন, "একটা পান খেয়ে ঘুমটা ছাড়িয়ে নিলে হ'ত।"

"নিন না, নিন না।" বলিয়া মহেন্দ্রবাবু তারিণীবাবুর মুখের দিকে তাকাইলেন। কিন্তু তাঁহার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিবার কোন উদ্যম না দেখিয়া অগত্যা নিজে উঠিয়া বসিয়া ডিবাটা শয্যাপার্শ্বস্থ টিপয়ের দিকে বাড়াইয়া দিলেন। তারিণীবাবু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া "আহা! আপনি কেন উঠলেন?" ইত্যাদি বলিতে বলিতে তাঁহার হাত হইতে ডিবাটি লইলেন।

মহেন্দ্রবাবুর হাতের দিকে তাকাইয়াই তারিণীবাবু চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু তাহা ক্ষণিক মাত্র। সে দিকে আর দৃষ্টি না দিয়া মহেন্দ্র-বাবুর গলায় জড়ানো কম্ফার্টারের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "গলায় ব্যথা হয়েছে বুঝি ?"

"হ্যাঁ, ঠাণ্ডাটা বেশই লেগেছে।" এই বলিয়া মহেন্দ্রবাবু মৃদু রকমের দুই-একটা কাশি ছাড়িলেন। কাশিতে কিন্তু সর্দির ভাব বিশেষ কিছু বোঝা গেল না।

তারিণীবাবু পান খাইয়া ঘুম তাড়াইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, তখন গৃহস্বামী যেন ঈষৎ উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে কেসটা কি রকম বুঝছেন ?"

"ঠিক ক'রে তো এখনও কিছু বুঝি নি। তবে দেখি সব ভেবে-চিন্তে।"

"দেখুন। আমার তো মশাই হাত-পা আসছে না। একে শরীর খারাপ, তার ওপর এই বিপদ। আহা! ছোঁড়াটা যেমন ভাল ছিল মশাই, বড় কাজের লোকও ছিল—"

তারিণীবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "তাই নাকি ? খুব কাজের লোক ছিল ?"

"হ্যাঁ মশাই, কাজকর্ম খুব ভালই করত,—আমার ডান হাত ছিল। মেজাজটা কিছু উগ্র ছিল, হঠাৎ খুব রেগে উঠত।"

"ঐ রকম মেজাজের লোকই ছুরি চালায়,—তা অন্যের গলাতেই হোক, কি নিজের গলাতেই হোক।" এই বলিয়া তারিণীবাবু আর একটা পান খাইলেন। দারোগাবাবু মনে মনে বিরক্ত হইতেছিলেন ও ভাবিতেছিলেন, ইনিই পাটনার নামজাদা ডিটেকটিভ! এতক্ষণ বাজে ব'কে, হাই তুলে আর পান খেয়ে সময়টা নষ্ট করলে! বলিলেন,

"চলুন তারিণীবাবু, তা হ'লে আমরা বাকি ছুজন চাকরকে জিজ্ঞাসাবাদ করাটা সেরে ফেলি।"

আসিতে আসিতে তারিণীবাবু দারোগাবাবুকে বলিলেন, "অন্য চাকর-বাকরকে জিজ্ঞাসা করবার বিশেষ আবশ্যক দেখি না। তারা আর নতুন কি বলবে? আচ্ছা, আপনি এখানে আসার পর থেকে রমেশের ঘরটায় কি বরাবর পাহারা রেখেছেন?"

"হ্যাঁ, কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় নি; ছুজন কন্স্টেব্‌ল পালা ক'রে পাহারায় আছে।"

"ডাকুন তো একবার সেই কন্স্টেব্‌ল ছুটিকে।"

ঘরে কেহ ঢুকিয়াছিল কি না জিজ্ঞাসা করিতেই তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "নেহি হুজুর, কিসিকো আনে নাহি দিয়া।"

তারিণীবাবু বলিলেন, "তা তো বুঝতে পারছি, কিন্তু ঘরে ঢোকবার কেউ চেষ্টা করেছিল কি না?"

তাহাদের মধ্যে একজন একটু ভাবিয়া বলিল, "হাঁ হুজুর, এ বাড়িকা বাবু আজ আট বাজে এ ঘরকা দরওয়াজা পর আয়াথা, লেকিন ঘরমে হম্‌কো দেখকে চলা গিয়া।"

তারিণীবাবু তাঁহার অভ্যাসমত লম্বা একটি 'হুঁ' দিয়া দারোগাবাবুকে বলিলেন, "ঘরটা একটু ভাল ক'রে তল্লাশি করতে হবে।"

দারোগাবাবু বলিলেন যে, তিনি খুব ভাল করিয়াই তল্লাশি করিয়াছেন এবং আর কিছু করবার আবশ্যক আছে মনে করেন না।

তারিণীবাবু বলিলেন, "তা তো নিশ্চয়ই করেছেন, কিন্তু আমার এটা একটা বদ অভ্যাস ব'লে মনে ক'রে নেবেন যে, আমি কোন কেস্ তদন্ত করতে গেলে প্রায়ই তল্লাশিটা একবার নিজে ক'রে নিই।" এই বলিয়া তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া মেঝেটি বেশ করিয়া

দেখিয়া লইলেন ; তারপর নগেনবাবুকে ঘরের ভিতর ডাকিয়া লইয়া কনস্টেবলদিগকে বলিলেন, “বাবা, এ আলমারিগুলো একটু সরাও তো ; তলাটা একবার দেখে নিই।”

ঘরের মধ্যে পাশাপাশি দুইটা আলমারি ছিল। একটা সবানো হইল, তাহার তলায় কিছু পাওয়া গেল না। কিন্তু অন্যটা সরাইতেই তাহার তলায় কি যেন একটা চক্‌চকে জিনিস আছে মনে হইল। তারিণীবাবু অতি মনোযোগের সহিত প্রত্যেক জায়গা দেখিতেছিলেন। ইহা দেখিয়াই সহর্ষে দারোগাবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, “দেখুন দেখি, ওটা কি?”

দারোগাবাবু ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন, “আলমারির নীচে আবার কি আবিষ্কার কবলেন?” কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মুখ অস্বাভাবিকরূপ গম্ভীর হইয়া উঠিল, কারণ ইতিমধ্যে কনস্টেবলরা আলমারিটাকে আর একটু সরাইল, তখন স্পষ্টই দেখা গেল যে সেটা একটা হীরে-বসানো আংটি।

তারিণীবাবু একবার দারোগাবাবুর দিকে চাহিলেন, তারপর আংটিটি উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, “যাক, আজ বদ অভ্যাসটায় বড় কাজ দিয়েছে মশাই। এর সঙ্গে একটা টিকিট লাগিয়ে নগেন ভায়ার ও একজন কনস্টেবলের সই করিয়ে নিন।”

নগেনবাবু বলিলেন, “কেন ভাই, আমাকে আবার জড়াও?”

তাবিণীবাবু বলিলেন, “ক্ষতি কি? বিনা ব্যয়ে আর একবার দেবদর্শন হয়ে যাবে হে।” তারপর দারোগাবাবুব দিকে চাহিয়া বলিলেন, “দেখুন, কনস্টেবলদের সাবধান ক’রে দিন যেন আংটির কথা কাউকে না বলে। এখন আমাদের তদন্ত এক রকম শেষ হয়ে গেল। আমি একবার গৃহস্বামীর কাছে বিদায় নিয়ে আসি। আপনি ততক্ষণ টিকিটটা লিখে ফেলুন।”

দারোগাবাবু বলিলেন, "আংটিটা একবার মহেন্দ্রবাবুকে দেখাবেন না? কার আংটি—তিনি কি বলেন।"

"তাড়াতাড়ি কি? দেখালেই হবে এর পর যখন হয় একবার।" বলিয়া তারিণীবাবু উঠিলেন।

দারোগাবাবু অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। ভাবিলেন, আচ্ছা তদন্ত হইতেছে যা হউক!

মহেন্দ্রবাবুর ঘরে গিয়া তারিণীবাবু আর একটি পান খাইলেন ও পূর্বের ন্যায় অর্থশূন্য দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "এখন চললুম মহেন্দ্রবাবু, আজ আর আপনাকে বিরক্ত করব না। দারোগাবাবুর সঙ্গে আর একটু পবামর্শ ক'রে যা হয় আপনাকে কাল বলব।"

"মোটেব ওপর কি বুঝলেন? আত্মহত্যা নয় কি? সেইটেই তো সম্ভব।"

"হ্যাঁ, আমারও কতকটা তাই মনে হয়। আর সেইটে হ'লেই আমি বেঁচে যাই। দেখুন না, এই কটি দিনের ছুটি নিয়ে এলুম কিনা মেয়েব বিয়ের যোগাড় করতে, আর আসতে না আসতেই এই ঝঞ্ঝাট!"

"কোথায় মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন?"

"পাত্রটি দেওঘরেই এসেছে; তাঁদের সঙ্গে সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, অগ্রহায়ণ মাসে বিয়ে হবে। তাই মনে করছিলুম, একবার কলকাতায় গিয়ে দু-এক জায়গা দেখে-শুনে গয়নার অর্ডার দিয়ে আসব। কিন্তু তা আর হয় না দেখছি।"

"কেন হবে না? তদন্ত তো এক রকম শেষই হয়ে গেল। কাল কি পরশু একবার চ'লে যান না।"

"হ্যাঁ, একবার গেলে হ'ত, কিন্তু কোন দোকানদারের সঙ্গে তো জানাশোনা নেই ; নতুন লোক দেখলে ঠকাবার চেষ্টা করবে।"

মহেন্দ্রবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ মশাই, আপনারা পুলিস, আপনাদের ঠকাবে! আচ্ছা, যদি কলকাতায় যান তা হ'লে একবার রাধাবাজারের বোস্ অ্যাণ্ড সন্সের দোকানটা দেখতে পারেন। তারা জিনিসটা খাঁটি দেয়, তবে দাম একটু বেশি নেয়।"

"আপনার সঙ্গে জানাশোনা আছে নাকি?"

"হ্যাঁ, তা আছে। তাদের কাছ থেকে আমিও জিনিসপত্র নিই।"

"বেশ, বেশ, তা হ'লে অনুগ্রহ ক'রে তাদের একটু লিখে দিন না যে, আমার যা জানবার দরকার হবে তাঁরা জানাবেন।" এই বলিয়া তিনি নিজের পকেট হইতে একটু কাগজ ও ফাউণ্টেন পেন বাহির করিয়া মহেন্দ্রবাবুকে দিলেন। মহেন্দ্রবাবু সেই রূপ লিখিয়া দিলেন। যখন তিনি লিখিতেছিলেন, তখন তারিণীবাবু স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার অঙ্গুলি দেখিয়া লইলেন। চিঠিখানি লইয়া পকেটে রাখিয়া বলিলেন, "বোধ হয় আপনার কাছ থেকে চিঠি নেওয়া পর্যন্তই শেষ। ছুটিটার যে রকম নমুনা দেখা যাচ্ছে, তাতে আর কিছু হবে ব'লে মনে হয় না।"

বাহিরে আসিয়া দারোগাবাবুর নিকট হইতে আংটিটা লইয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "এটা এখন আমার কাছে থাক্। যদি ইতিমধ্যে আর একবার ড্রাইভারের সঙ্গে দেখা করতে পারি, তা হ'লে তাকে দেখাব। এখন আর এ মকদ্দমায় আপনার কিছু করবার দরকার নেই। আমি কাল থানায় গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

তারপর নিজের বাসার নিকট আসিয়া নগেন্দ্রবাবুকে গাড়ি হইতে নামাইয়া দিয়া চুপি চুপি তাহাকে বলিলেন, "আজ আর বাসায় যেতে পারব না ;—কাউকে কিছু ব'লো না।"

"সে কি? এত বেলা হয়েছে, খেয়ে যাবে না?"

"না ভাই, আজ দেওঘরের অন্ন অদৃষ্টে নেই।" এই বলিয়া ট্যাক্সিতে কাছারির দিকে চলিয়া গেলেন।

সেদিন তারিণীবাবু নিরুদ্দেশ। নগেন্দ্রবাবু মনে করিয়াছিলেন যে, অন্তত রাত্রেও তিনি ফিরিবেন। কিন্তু অনেক রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তিনি হতাশভাবে শুইয়া পড়িলেন। পরদিন বৈকালে তারিণীবাবু দর্শন দিলেন। তখন তাঁহার মুখ শুষ্ক, চক্ষু লাল, দেখিলে মনে হয় খুব ক্লান্ত। সঙ্গে চাদরে বাঁধা একটা পোঁটলা। নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "যা হোক, শেষ পর্যন্ত ফিরলে এই ভাগ্যি। আচ্ছা চাকরি ভাই তোমার! আমি তো মোটেই পছন্দ করি না।"

তারিণীবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই, সে সম্বন্ধে দেশের চোর-ডাকাত তোমার সঙ্গে একমত।"

মহেন্দ্রবাবুর ব্যারামটা পূর্বদিন বৈকাল ও রাত্রি হইতে কিঞ্চিৎ ভাল ছিল, কিন্তু আজ সকাল হইতে আবার জাঁকাইয়াছে। সুতরাং যখন তারিণীবাবু ও দারোগাবাবু তাঁহার ঘরে গিয়া ঢুকিলেন, তখন তিনি পূর্বদিনের ন্যায় আপাদগলদেশ ঢাকা দিয়া শয্যাগত। শুইয়া শুইয়াই অভ্যাগতদিগকে সহাস্যে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু তারিণী-বাবুর দিকে তাকাইয়াই তাঁহার মৌখিক হাসি মুখে মিলাইয়া গেল। তারিণীবাবুর চক্ষুতে আর সে অর্থহীন আলস্যব্যঞ্জক দৃষ্টি নাই, মুখে সে বুদ্ধিহীনতার লক্ষণ নাই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সে শিথিলতা নাই; একেবারে সম্পূর্ণ রূপান্তর, যেন কোন বৈদ্যুতিক শক্তি তাঁহার সর্বাঙ্গ এক অমানুষিক তেজে ভরিয়া দিয়াছে। নয়নে অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য, বদনে গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তা, বাক্যে সংযম।

প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন, "আজ কেমন আছেন মহেন্দ্রবাবু?"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে মহেন্দ্রবাবু চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু তখনই সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "মোটেই ভাল বোধ হচ্ছে না, সর্দি সেই রকমই। গলার ব্যথাটা যেন বেড়েছে মনে হচ্ছে।" তারপর একটু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার তদন্তের আর কি হ'ল বলুন? বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে।"

"বোধ হয় নয়, নিশ্চয়।"

"তা হ'লে কি বুঝছেন? আত্মহত্যাই ঠিক?"

"না, আত্মহত্যা নয়;—ছুরি মেরে খুন।"

"অ্যাঁ! বলেন কি!" বলিয়া মহেন্দ্রবাবু একটু চমকিয়া উঠিলেন। দারোগাবাবুও চমকিয়া উঠিলেন, কারণ তিনি হঠাৎ এইরূপ মন্তব্য তারিণীবাবুর নিকট প্রত্যাশা করেন নাই।

"ঠিকই বলছি।"

মহেন্দ্রবাবু একটু আবেগ ভরে বলিলেন, "সর্বনাশ! আমার বাড়িতে ছোঁড়াটা খুন হয়ে গেল! যদি তাই হয় তারিণীবাবু, তা হ'লে যে খুন করেছে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতেই হবে।

দারোগাবাবু যেন আপনা হইতেই বলিয়া উঠিলেন, "তাকে তো ধরা হয়েছে।"

তারিণীবাবু সেইরূপ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না, এখনও হয় নি, তবে এখনই হবে।" এই বলিয়া তিনি মহেন্দ্রবাবুর উপর এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সে দৃষ্টির সম্মুখে মহেন্দ্রবাবুর হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি যথাসম্ভব আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, "কোথায় ধরা হবে?"

"এই বাড়ির মধ্যেই।" এই বলিয়া মহেন্দ্রবাবুকে আর কোন চিন্তার অবসর না দিয়াই তারিণীবাবু তৎক্ষণাৎ তাহার খাটের উপর

গিয়া বসিলেন ও পকেট হইতে সেই আংটি বাহির করিয়া বলিলেন, "এই আংটিটা কার বলতে পারেন ?"

মহেন্দ্রবাবু আংটি দেখিযাই শিহরিয়া উঠিলেন ; কিন্তু যথাসম্ভব সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন, "তা তো বলতে পারি না ।"

"মিথ্যে কথা বলবার চেষ্টা করবেন না মহেন্দ্রবাবু । ভাল ক'রে দেখুন দেখি, এ আপনার আংটি কি না !"

মহেন্দ্রবাবু আংটিটা একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া বলিলেন, "না. এ তো আমার আংটি নয ।"

"আপনাকে আর একবার সত্যি কথা বলবাব স্থযোগ দিচ্ছি । এখনও বলুন. এ আপনাব আংটি কি না !"

"কই, তা তো স্মবণ হচ্ছে না ।"

"আচ্ছা, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি । দেখুন দেখি, এ আংটি আপনি বো'স অ্যাণ্ড সন্সের দোকান থেকে ১৯৩২ সালে ১৪ই ফেব্রুযারি কিনেছিলেন কি না ?" এই বলিয়া তারিণীবাবু কন্‌স্টেব্‌লকে ডাকিলেন ও তাহাব হাত হইতে একটি কাপড়ে-জড়ানো প্যাকেট লইযা তাহাব মধ্য হইতে একটি খাতা বাহিব কবিয়া তাহাব একটি পাতা মহেন্দ্রবাবুকে দেখাইযা বলিলেন, "এখনও অস্বীকাব করতে চান ?"

মহেন্দ্রবাবুর' মুখ শুকাইয়া গেল, বুক দুরদুর কবিতে লাগিল. সর্দি-জ্বব অগ্রাহ্য করিয়া গা দিয়া ঘাম ছুটিল ।

"আর গোপন করার চেষ্টা বৃথা ; যা হযেছিল ব'লে ফেলুন । আপনি কেন রমেশকে ছুরি মারলেন ?

মহেন্দ্রবাবু প্রায় রুদ্ধশ্বাসেই বলিয়া উঠিলেন, "হা ভগবান !" তারপব ক্ষণমাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "আমি কিছুই জানি না তারিণীবাবু । কেন আপনি আমাকে এসব বলছেন ?"

"কিছুই জানেন না?"

"না, আমি কিছুই জানি না।"

"আচ্ছা, আপনাব গলার কম্ফর্টারটা খুলুন দেখি একবার।" এই বলিযা তারিণীবাবু নিজেই তাঁহার গলার কাপডটা সরাইয়া দিয়া কম্ফর্টাবটা খুলিয়া ফেলিলেন। তখন দেখা গেল যে, গলায় জখমের চিহ্ন ও খুব ফুলিয়া উঠিয়াছে। দাবোগাবাবু ইহা দেখিয়াই লাফাইয়া উঠিলেন ও আকস্মিক বিস্ময়ে একবার মহেন্দ্রবাবুর দিকে ও একবার তারিণীবাবুর দিকে চাহিলেন।

সেই সময় তারিণীবাবু বলিলেন, "আর গোপন ক'বে লাভ নেই মহেন্দ্রবাবু। কি হয়েছিল ব'লে ফেলুন। আর যদি আপনার বলতে ভয় হয়, তা হ'লে আমিই না হয় ব'লে যাচ্ছি; যেখানে আমার ভুল হবে, সংশোধন ক'বে দেবেন। ঐ দিন ড্রাইভার রমেশের সঙ্গে বকাবকি ক'রে আপনাব কাছে তার বিরুদ্ধে কিছু ব'লে যায়। আপনি রমেশের কথায় আপনাব অনিচ্ছা সত্ত্বেও ড্রাইভারকে জবাব দিয়েছিলেন, সেই জন্যে রমেশেব ওপব আপনি একটু বিবক্ত হয়েছিলেন। ড্রাইভারের কথা শুনে আপনি তার ওপর আরও বিরক্ত হন ও সে তার ঘবে ফিবে আসবামাত্র আপনি সেখানে গিয়ে তাকে কিছু বলেন। সেও বোধ হয রেগে যায় ও আপনার কথাব কোন কড়া উত্তর দেয়। এই থেকে বচসা হয়ে আপনি বোধ হয় তাকে অপমানসূচক কথা বলেন। তার উগ্র স্বভাব সেটা বরদাস্ত করতে পারে নি। সে আপনাকে আক্রমণ করে এবং আপনার গলা টিপে ধরে; আপনি তখন নিজেকে মুক্ত করবার আর কোন উপায় না পেয়ে তার টেবিল থেকে সেই ছুরিখানা নিয়ে তার হাত লক্ষ্য ক'রে ছুরি মারেন—সে আপনাকে ছেড়ে দেবে ব'লে। কিন্তু সাময়িক উত্তেজনায় আপনার হাতের ঠিক না

থাকায় সেই ছুরি তার হাতে না লেগে গলায় গিয়ে লাগে। কেমন, ঠিক কি না ?"

দারোগাবাবু একটু জোরের সহিত বলিলেন, "হাতে যে লক্ষ্য করেছিলেন তার প্রমাণ কি ? উনি তখন এমন কিছু বেঠিক হন নি যে হাতে মারতে গিয়ে গলায় মেরে বসলেন।"

তারিণীবাবু বলিলেন, "শুধু মানসিক উত্তেজনায় লক্ষ্য ঠিক রাখতে পারেন নি তা নয়, আরও এক কারণ ছিল ; উনি বাঁ হাতে ধ'রে ছুরি চালিয়েছিলেন।"

দারোগাবাবু আশ্চর্য হইয়া তারিণীবাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। তারিণীবাবু বলিলেন, "উনি ছুরিখানা বাঁ হাতের কাছে পেয়েছিলেন, তাই বাঁ হাত দিয়ে তুলে নিয়েই আঘাত করেছিলেন। সেই জন্যে মৃতের ডান গলায় জখম হয়েছিল ও আত্মহত্যা ব'লে মনে হবার কারণ হয়েছিল। রমেশ ওঁর ডান হাত চেপে ধরেছিল, সেই হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করার সময় আংটিটা প'ড়ে ছিট্‌কে যায়। এইবার বলুন মহেন্দ্রবাবু, আমি যা বললুম তা সমস্তই ঠিক কি না ?"

মহেন্দ্রবাবু হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন ও উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "তারিণীবাবু, আপনি কি অন্তর্যামী ? আর আমি কিছুই গোপন করব না। আমায় রক্ষা করুন।" এই বলিয়া তারিণীবাবুর হাত জড়াইয়া ধরিলেন।

তারিণীবাবু আস্তে আস্তে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, "দেখুন, রক্ষা করবার মালিক আর একজন,—তাঁকে ডাকুন। তবে আমি এই পর্যন্ত বলতে পারি যে, আপনি অকপটে সমস্ত স্বীকার করলে আপনার ভাল হবে।"

"তা করব। কিন্তু আপনি বলুন, আমায় বাঁচাবেন।"

"বাঁচাবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু যদি কেউ আপনাকে বাঁচাতে পারে সে আপনার ঐ গলার জখম, যেটাকে ঢেকে রাখতে আপনি এত চেষ্টা করছিলেন।" তারপর ঈষৎ হাসিয়া দারোগাবাবুকে বলিলেন, "এইবার আমায় নিষ্কৃতি দিন দারোগাবাবু, আর সেই সঙ্গে বেচারা ড্রাইভারটিরও নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করুন।"

মন্ত্রদান

শিকারপুর গ্রামের স্বরেন দাস উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ অঞ্চলের কায়েমী কবরেজ। বাপের বিদ্যাবুদ্ধিটা তেমন কিছু না পেলেও, পৈতৃক ওষুধ কটা নাড়াচাড়া ক'রে আর তার সঙ্গে একটা থার্মোমিটার ও একটা স্টেথিস্‌কোপের নূতনত্ব জুড়ে দিয়ে মোটামুটি বেশ চালিয়ে যাচ্ছে। পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যে আর ডাক্তার কবরেজ নেই, তাই প্রতিষ্ঠা অপ্রতিহত। সংসারও ছোট,—নিজে, পত্নী ও একটি দশ বছরের ছেলে। দুঃখ কিছুই নেই,—কেবল যা গৃহিণীটি কিঞ্চিৎ ভীষণা, অর্থাৎ যেমন কালো, তেমনি মোটা, তেমনি ভীমদর্শনা, তেমনি ঘোরবাবা,—যেন মহানির্বাণতন্ত্রের পাষাণময়ী মহাকালিকার গার্হস্থ্য সংস্করণ।

কোন কারণ বশত অনেকেই যখন গ্রাম ছেড়ে যেতে আরম্ভ করলে, তখন গৃহিণী একদিন বললে, "দেখ, সবাই তো চ'লে যাচ্ছে, যদি কোন বিপদ-আপদ হয় আমাদের রক্ষে করবে কে?"

কবরেজ হেসে বললে, "আমার বড়ি আর তোমার ভুঁড়ি,—কিচ্ছু ভেবো না।"

মানুষ হয়তো অনেক সময় নিজের অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকতে চায়, কিন্তু বিধাতা থাকতে দেন না। কবরেজেরও সেই দুর্দৈব হ'ল। একদিন হাটে গিয়ে কবরেজ দেখলে যে, একজন পাঞ্জাবী গণৎকার লোকের হাত দেখছে আর কিছু কিছু পয়সা নিচ্ছে। কবরেজকে দেখে গণৎকার তার হাত দেখতে চাইলে, কিন্তু কবরেজ রাজী নয়। অদৃষ্টে বিশ্বাস করাটা ডাক্তার-কবরেজদের চলে না, কারণ অদৃষ্টের

সঙ্গেই তো তাদের কম্পিটিশন। তখন গণৎকার তাকে কোন একটা ফুল মনে করতে বললে, এবং কবরেজ মনে করতেই তথখুনি বললে, "জবাফুল।" কবরেজ তো অবাক, ঠিকই তো বলেছে! তারপর তার হাত দেখে গণৎকার এ-কথা সে-কথার পরে বললে যে, সে শীগ্‌গিরই বড়লোক হবে।

বাড়ি ফেরবার সময় কবরেজ ভাবলে, গণৎকার তো বললে বড়লোক হব; কিন্তু কেমন ক'রে হব, সেটা তো তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল না। বড় ভুল হয়ে গেছে। যা হোক, বড়লোক হবার সাধারণ যে কটা পন্থা আছে সে সব মনে মনে আলোচনা ক'রে ঠিক করলে যে, পুঁজিপাটা যা কিছু আছে তাই দিয়ে সম্প্রতি পাটের ব্যবসা করা যাক। এ ছাড়া সোজা রাস্তা পাড়াগাঁয়ে আর কি আছে?

বাড়িতে এসে মহানন্দে গৃহিণীকে সুসংবাদ দান ও পাটের ব্যবসার প্রস্তাব উথাপন। কিন্তু মোটেই সুবিধা হ'ল না। গৃহিণী বললে, "নিজের ব্যবসাই ভাল ক'রে চালাতে পার না, তা আবার পরের ব্যবসা চালাবে! ও-সব হবে-টবে না। যদি সে গণৎকার মুখপোড়া সত্যি কথা ব'লে থাকে, তা হ'লে তোমার অদেষ্টই তোমাকে বড়লোক ক'রে দেবে। চুপ ক'রে ব'সে থাক।"

কবরেজ একটু আদিরসাত্মক হাসি হেসে বললে, "দেখ, অদেষ্ট থেকে বড়লোক হও তোমরা—মেয়েমানুষরা। তোমরা এক রাত্রেই বড়লোক। পুরুষদের বড়লোক হতে হ'লে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়।"

কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। কবরেজ-গিন্নী একেবারে উত্তপ্ত স্টীল ফ্রেম! কাজেই, ব্যবসা-বাণিজ্যের আশাটা সম্প্রতি কবরেজকে ছেড়ে দিতে হ'ল।

২

কিন্তু বিধাতা নাছোড়বান্দা। কয়েক দিন পরে এক প্রত্যুষে কবরেজ-গিন্নীর গর্জনে পাড়ার লোক ত্রস্ত হয়ে উঠে দেখলে যে, তার সঙ্গে একটা বৃহৎ বলদের টাগ-অফ-ওয়ার চলছে। রঙ্গস্থল—বাড়ির সংলগ্ন সব্‌জির ক্ষেত ; দর্শক—কবরেজ ও তার ছেলে। তখন গিন্নী অনধিকার-প্রবেশকারীর গলদেশ রজ্জুবদ্ধ করেছে, কিন্তু সব্‌জির আকর্ষণ থেকে তাকে টেনে আনতে পারছে না। কবরেজের দৈহিক শক্তির ওপর গিন্নীর আস্থা কম ; কিন্তু তা হ'লেও তার কাছে শক্রর পশ্চাদ্দেশ আক্রমণ করবার সাহায্য প্রার্থনা করবে কি না চিন্তা করতেই তাদের চাকর ঠিক সেই সময় এসে পড়ায় গিন্নীকে আর সে অপমান সহ্য করতে হ'ল না।

বলদকে টেনে আনতে আনতে চাকর বললে, "কর্তা, এ তো জয়নদ্দির গরু ব'লে মনে হচ্ছে। একে এখন কি করা যায় ?"

গিন্নীর ইচ্ছা খোয়াড়ে দেওয়া, কিন্তু কবরেজ রাজী নয়। কারণ অনেক। শেষে ঠিক হ'ল, গরু জয়নদ্দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে ; কিন্তু কবরেজ নিজে গিয়ে বেশ কড়া ক'রে তাকে দু চার কথা শুনিয়ে দিয়ে আসবে। . চাকরকে গিন্নীর হুকুম হ'ল, "গরুটাকে আচ্ছা ক'রে ঘা কতক পিটে দে,—যেন আর না আসে।"

জয়নদ্দির বাড়িতে গিয়ে কবরেজ দেখলে, একজন অপরিচিত লোক তার সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। কাজেই সুচিন্তিত কড়া কথাগুলো কবরেজের মুখ থেকে মিষ্টি মেখেই বেরুল। তারপর জয়নদ্দি লোকটির সঙ্গে কবরেজের পরিচয় করিয়ে দিলে, পাশের গ্রামের খবিরদ্দি ফকির, খুব ওস্তাদ লোক, অনেক মন্তর-তন্তর জানে, ইত্যাদি। ওর

শাগরেদি করতে পারলে টাকা-পয়সার কোনও অভাব থাকবে না, এটাও আভাসে জানিয়ে দিলে।

পরদিন কবরেজ ফকিরের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত। অনেক কথাবার্তার পর ফকির বললে যে, সে তাকে কয়েকটা ভালরকমই এলেম শিখিয়ে দিতে পারবে, তবে তার শাগরেদ হতে গেলে অগ্রিম কিছু সেলামি দেওয়া দরকার—বেশি না হোক, দশটা টাকা হ'লেই হবে।

৩

কবরেজের মনে লোভ ও ভয়ের ভীষণ ঠেলাঠেলি আরম্ভ হ'ল। টাকা তো সব গিন্নীর হেপাজতে,—তাকে বলতে সাহস হয় না; কিন্তু কিছু একটা না করলে ভবিষ্যদ্বাণীই যে বিফল হয়ে যায়। শেষে লোভেরই জয় হ'ল, কিন্তু ভয়ও স্থানচ্যুত হ'ল না। একটা মিটমাট ক'রে নিয়ে ঠিক করলে, গিন্নীকে এখন কিছু বলা হবে না। তবে কয়েক দিনের উপার্জিত টাকা থেকে কিছু কিছু কেটে রেখে দশ টাকা সংগ্রহ ক'রে ফকিরের সঙ্গে দেখা করবে।

টাকা নিয়ে ফকিরের বাড়ি যেতেই ফকির টাকাটি হস্তগত ক'রে বললে, "দেখ কবরেজ, আমি তোমাকে যা শেখাব, তা তুমি কারুর কাছে বলতে পাবে না। যদি বল, তা হ'লে এলেমে কাজ হবে না।" তারপর একটা চৌকোণা কাঠের ফ্রেম নিয়ে এসে বললে, "কি করি দেখ, —তোমার সামনেই সব হবে।" ফ্রেমের ভেতর একখানা সাদা কাগজ দিয়ে তার ওপর এক টাকার নোটের মাপে কাটা আর একখানা কাগজ (sensitized paper) রেখে বললে, "তোমার কাছে এক টাকার নোট একখানা আছে তো দাও,—না থাকে, আমিই দিচ্ছি।" কবরেজ

এক টাকার নোট একখানা দিলে। ফকির সেই নোট ও আব একখানা সাদা কাগজ ফ্রেমের মধ্যে যথাস্থানে ঢুকিয়ে দিয়ে ফ্রেমটা বন্ধ ক'রে বললে, "আচ্ছা, তুমি নিজেই এইটে নিয়ে গিয়ে রোদে একটু ধ'রে ব'সে থাক,—আমি ততক্ষণ এখান থেকেই মন্তর বলি।"

কিছুক্ষণ পবে ফকির ফ্রেমটা খুলে দেখিযে দিলে যে, ছোট কাগজটাতে ঠিক নোটের মতই ছাপ উঠেছে। কববেজ তো মন্তবেব জোব দেখেই অবাক। ফকির বললে, "আবও কিছু মশলাব দবকাব, তা হ'লেই ঠিক আসল নোটের মত হযে যাবে। কিন্তু সে সব মসলা কিনতে গেলে টাকা চাই।"

বিশেষ আগ্রহেব সহিত কববেজ জিজ্ঞাসা কবলে, "কত টাকা ?"

"তা, এক শো টাকার কমে তো হবে না।"*

"অত টাকা আমি দিতে পারব না ওস্তাদ। এ সব আমা থেকে হবে না বাপু। তুমি সোজাসুজি বকমের কিছু একটা শেখাও আমাকে।"

"তা হ'লে কি শিখবে বল ? দোনাখেল, না, টপ্কা ?"

"সে আবাব কি ?"

"দোনাখেল হচ্ছে টাকা গয়না-টয়না ডবল কবা। সে সব একটা হাঁড়িতে রেখে খব বন্ধ ক'রে মন্তর পড়লেই ডবল হযে যাবে। তবে সেটা নিজের বাড়িতে হবে না, আর কারুর বাড়িতে বিদ্যেটা চালাতে হবে। কথাটা বুঝতে পারছ তো ? না, আরও ভেঙে-ফুটে বলতে হবে ?"

---

* নোট জাল করা শেখানো উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য বিশ্বাস উৎপাদন। সেইজন্য এত টাকার প্রস্তাব, যাতে আর নোট জাল ব্যাপারে অগ্রসর হতে না হয়।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি তো। কিন্তু আজকাল তো অনেকেই ওসব ব্যাপার জানে।"

"দেখ, দুনিয়ায় অনেকেই অনেক ব্যাপার জানে, কিন্তু হচ্ছে তো সবই। একটু হাত-মুখ সাফাই ক'রে বুদ্ধি চালাতে পারলেই, জানুক আর নাই জানুক, একই কথা।"

"কিন্তু যার ওপর বুদ্ধি চালাবে, তারও তো বুদ্ধি আছে। চালাতে দেবে কেন?"

"ওইখানেই তো মন্তরের জোর! মন্তরের চোটে বুদ্ধি উড়ে যাবে।"

"দূর, তা বুঝি আবার হয়?"

কবরেজ বুঝতে পারছে না যে, মন্তর তারই ওপর তখন প্রয়োগ হচ্ছে। বললে, "দেখ, ওটা আমি করতে পারব না। ভয় করে। বাড়ির লোক যদি ধরতে পারে, মেরেই হাড় ভেঙে দেবে।"

"তা হ'লে টপ্‌কাটাই শেখো। গোটাকতক গিল্টির গয়না যোগাড় করতে পারলেই হ'ল। হাট থেকে দোকানদাররা যখন ফিরবে, তখন তাদের সামনের রাস্তার ওপর টুপ ক'রে ফেলে দিয়ে তারপর তারা দেখতে পায় এ রকম ভাবে তুলে নিয়ে তাদেরই কাছে বিক্রি। হাটে হাটে ঘুরে মাস ছয়েক এটা চালাতে পারলেই বড়লোক!"

"না না, ও-সব আমি পারব না। পুলিসে ধ'রে ফেললেই জেল।"

"জেল কি হে কবরেজ? তুমি যে হাসালে। এখন জেল হয় শুধু বোকাদের,—আগে হ'ত স্বদেশীদের। আজকাল চোররা হয়েছে বুদ্ধিমান, আর বুদ্ধিমানরা হয়েছে চোর। তাই বোকারাই পুলিসের হাতে ধরা পড়ে। আর কাউকে ধরবার তাদের সময় কোথা?"

কবরেজের একবার মনে হ'ল, এই সবই শিখে নেয়; কিন্তু সাহস

হ'ল না। বললে, "না ওস্তাদ, তুমি ও-সব বিদ্যের কথা ছেড়ে দাও। অন্য লোকের সঙ্গে এ রকম কারবার করতে আমার ভরসা হয় না। যদি নিজের বাড়িতে ব'সেই বড়লোক হবার বিদ্যে কিছু জান—"

"আরে! জানি না আবার! সেইটেই তো আমার বড় বিদ্যে, কিন্তু তাতে তো কিছু বড় রকমের খরচের কথা আছে কবরেজ।"

খরচের কথা শুনেই কবরেজের মনটা একটু দ'মে গেল। গোলমাল তো সেইখানেই। বললে, "আগে তোমার এলেমটাই শু'ন, তারপর দেখা যাবে।"

ফকির বললে, "তোমাকে 'জিন্-সাধন' শেখাব। মন্তরের জোরে জিন্ আনতে পাববে, আর তাদের যা বলবে তারা তাই করবে।"

"জিন্ কি?"

"পরী—পরী। পরীব রাজ্য শোন নি?"

"হ্যাঁ, শুনেছি। তা, তুমি ঠিক বলছ তো?"

"আমি কি আর মিথ্যে কথা বলছি কবরেজ? দেখবে, তিন মাসেই তোমার হালচাল ফিবে যাবে।"

কবরেজ একটু হেসে বললে, "তা হ'লে, তোমার চালে কেন খড নেই ওস্তাদ? জিন্‌রা তো তোমার দালান কোঠা তৈরি ক'রে দিতে পারত।"

"এই দেখ! এটাও তুমি জান না যে, ওস্তাদ কেবল মন্তর শেখাতে পারে, নিজের কাজে লাগাতে পারে না। সাপের ওঝাকে সাপে কামড়ালে সে কি নিজের বিষ ঝাড়তে পারে?"

"তবে আমিই বা কেমন ক'রে নিজের কাজে লাগাতে পারব?"

"তুমি তো আর অন্য লোককে মন্তর শেখাতে যাচ্ছ না। আমি তো আগেই বলেছি, আর কাউকে মন্তর বললে তুমি আর সে মন্তর

কেবল জিন্ আনা ছাড়া আর কোন কাজে লাগাতে পারবে না। যাক, সে সব ঠিক হবে। এখন তুমি মন্তর শিখবে কি না তাই বল।"

"খরচটা কি রকম লাগবে শুনি?"

"তোমাকে মন্তর দেবার হুকুম নেবার জন্যে জিন্-বাদশার কাছে দরখাস্ত করতে হবে। তার নজরের জন্যে পঁচিশ টাকা আর তার উজিরের জন্যে তিন টাকা দিতে হবে।"

"ও বাবা! এত টাকা?"

"এ টাকা তো তুমি ফেরত পাবে হে কবরেজ। রাজা-বাদশা কি নজরের টাকা নেয়?"

কবরেজ তাতেই রাজী হয়ে বাড়ি ফিরে এল।

৪

তিন দিন পরে ফকিরের শাগরেদ গোলাম শেখ কবরেজের বাড়িতে এসে আটাশ টাকা নিয়ে ব'লে গেল যে, জিন্-বাদশার কাছ থেকে দরখাস্তের হুকুম পেলেই সে আবার এসে খবর দিয়ে যাবে। কবরেজ তো বোকা নয়,—সে হরিশপুরের ধীরেন পাল আর জয়নদ্দির সামনে টাকাটা দিলে; কিন্তু কেন দিচ্ছে তা বললে না।

এর চার দিন পরে গোলাম শেখ এসে কবরেজকে খবর দিলে যে, জিন্-বাদশা তার দরখাস্ত মঞ্জুর করেছে, আর আগামী শনিবার সন্ধ্যার পর তাকে ওস্তাদের বাড়িতে যেতে বলেছে।

তদনুসারে কবরেজ শনিবার সন্ধ্যায় ফকিরের বাড়িতে উপস্থিত হ'ল। দেখলে, ফকির আর গোলাম শেখ একটা ঘরে ব'সে বিড়বিড় ক'রে মন্ত্র আওড়াচ্ছে।

ফকির একটু ঝঙ্কার দিয়ে বললে, "এতক্ষণে এলে কবরেজ ? মন্তরের জোরে আমি জিন্‌দের আনিয়েছি, কিন্তু তোমার আর একটু দেরি হ'লেই তারা চ'লে যেত। বাদশাব হাতে পায়ে ধ'রে অনেক ক'রে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এখনও আটকে রেখেছি। বাদশাই তোমাব সঙ্গে কথা বলবে।"

তারপর ফকির আবার মন্ত্র আওড়াতে আরম্ভ করলে। ঘবে একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলছিল, সেটা তখুনি আপনা হতেই নিবে গেল। পাশের ঘরের মাচার ওপর মড়মড শব্দ হতে লাগল। ঠিক সেই সময়েই বাইবের বসবার ঘরে ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নাচার শব্দ হতে লাগল। কবরেজ আশ্চর্য হয়ে গেল, তখন পাশের ঘরের মাচাব ওপব থেকে একজন নাকীসুবে বললে, "সুরেন—সুরেন, আমি জিন্‌-বাদশা। তোর ওপর মেহেরবান হয়েছি। তুই কি চাস বল্‌।"

কবরেজ বললে, "ফকির আমাকে মন্তব শেখাবে বলেছে। আমি সেই মন্তর শিখতে চাই।"

নাকীসুর আবার বললে, "তুই যা ইচ্ছে কবছিস, তা পাবি। তবে এখনও তোকে পবখ করা দরকার হবে।"

"আমি তো আপনাদের নজর ব'লে আটাশ টাকা দিয়েছি।'

"হ্যাঁ, আমবা তা পেয়েছি। তুই সে টাকা ফেরত পাবি।"

"কখন ফেরত পাব ?"

"যখনই তোর ফেরত নিতে ইচ্ছে হবে, তখনই পাবি।"

কবরেজ ভাবলে, সত্যি কি মিথ্যে এখনই দেখা যাক না। বললে. "মেহেরবানি ক'রে যদি দেন, তা হ'লে আমি এখনই টাকাটা ফেরত চাই।"

"আচ্ছা। বাইরের ঘরে গিয়ে আমার উজিরকে বল্‌।"

কবরেজ বাইরের ঘরে এসে উজিরকে উদ্দেশ ক'রে টাকা চাইতেই ওপর থেকে একটা পুঁটলি তার সামনে পড়ল। সেটা নিয়ে ফকিরের কাছে এসে খুলে দেখলে যে, তার মধ্যে আটাশ টাকাই আছে। তখন ফকিরের ওপর কবরেজেব প্রগাঢ় বিশ্বাস হ'ল।

পাশের ঘর থেকে নাকীসুর বললে, "এখন সুরেনকে মন্তর দে।"

ফকির দুখানা কাগজ কবরেজের হাতে দিয়ে বললে, "এখন এই মন্তরই দিচ্ছি। আবার তোমাব পরখ হবে, তারপর বাকি মন্তর দোব।"

তার একটু পরেই বাইরের ঘর থেকে নাকীসুরে "সুরেন—সুরেন" ব'লে তিনবার ডাক এল। কবরেজ সেই ঘরের কাছে যেতেই নাকীসুর বললে, "ঐখানেই দাঁড়া। ওস্তাদের কাছ থেকে মন্তর পেয়েছিস তো ?"

"হ্যাঁ, পেয়েছি ; কিন্তু সবটা পাই নি।"

"কেমন ক'রে পাবি বল্? তোর পরখ যে এখনও শেষ হয় নি। বাকি মন্তর পাবার জন্যে তুই তিন শো টাকা নজর দিবি।"

"অত টাকা আমি কোথা পাব ? আমি আর টাকা দিতে পারব না।"

"টাকা তো একেবারে দিয়ে দিতে হবে না। আচ্ছা, তুই দেড় শো টাকাই দিস।"

"তাও আমি দিতে পারব না।"

"টাকা তো তুই ফেরত পাবি রে। দিস—দিস, তোর ভাল হবে। যা, ওস্তাদের সঙ্গে ঠিক কর্‌গে যা। সে যা বলবে তাই দিস।"

"টাকা কোন্ জায়গায় ফেরত পাব ?"

"ঠিক তুই যেখানে দাঁড়িয়ে আছিস। শেষ মন্তর দেবার একুশ

দিনের মধ্যেই সব মন্তরগুলো শিখতে হবে। আর, একুশ দিনের সন্ধ্যাবেলায় এইখানে এসে মন্তর আউড়িয়ে টাকা চাইলেই টাকা পাবি। সেই দিন থেকেই মন্তব কাজে লাগাতে পাববি।"

ফকিরের ঘরে ফিরে গিয়ে কবরেজ সমস্তই ফকিরকে বললে, কিন্তু আব টাকা দিতে বাজী হ'ল না। ফকির অনেক বোঝালে, কিন্তু কবরেজ কিছুতেই অত টাকা যোগাড় করতে পারবে না বললে। তখন পাশের ঘর থেকে ফকিবের মা বেরিয়ে এসে বললে, "বাবা সুরেন, আমি তোমাকে বলছি তুমি ঠিক টাকা ফেরত পাবে,—আমি, এই দেখ, আমার ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলছি। আচ্ছা, যদি অত টাকা যোগাড করতে না পার, তা হ'লে পঞ্চাশ টাকাই এনো।"

অগত্যা কবরেজ তাতেই রাজী হয়ে চ'লে এল এবং পঞ্চাশ টাকা কোন রকমে ধারধোর ক'রে সংগ্রহ ক'রে পরের শনিবাবে গিযে বাকি মন্ত্রটা নিয়ে এল।

৫

বিকট উৎসাহে কয়েক দিন ধ'রে মন্ত্রগুলো মুখস্থ ক'রে কবরেজ একুশ দিনের সন্ধ্যাবেলায় ফকিরের বাড়ি গেল। দেখলে, ফকির অনুপস্থিত। তার মা বললে যে, সে অন্য গাঁয়ে গেছে, তার পরদিন সকালে ফিরবে। কবরেজ বাইরের ঘরের কাছে ঠিক সেই জায়গায় গিয়ে অতি ভক্তিভরে তিনবার মন্ত্র আওড়ালে। কিন্তু জিন্ আসার কোন লক্ষণই বুঝতে পারলে না। খুব কান খাড়া ক'রে শুনল, কিন্তু কোথাও কোনও শব্দের আভাস পর্যন্তও পেলে না। আবার তিনবার মন্ত্র পড়লে, কিছুই হ'ল না। মন্ত্র নিষ্ফল!

এইবার কবরেজের মোহ কাটতে আরম্ভ হ'ল, কিন্তু মন্দটা সিদ্ধান্ত করতে মানুষের সহজে প্রবৃত্তি হয় না। ভাবলে, কিছু একটা গড়বড় হয়েছে বোধ হয়। যাক, ফকির তো ফিরে আসুক, তারপর দেখা যাবে। বাড়ি ফেরবার উপক্রম করছে, তখন কে একজন সদর-দরজার কাছে নাকীসুরে ডাকলে, "মামু, বাড়ি-ত আছ?" কবরেজ চমকে উঠল। ভাবলে, এই তো জিন্‌-বাদশা এসেছে! কিন্তু তার চমক ভাঙল যখন আগন্তুক এগিয়ে আসতেই ফকিরের মা খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে তাকে বললে যে খবিরদ্দি বাড়িতে নেই, আর এক রকম ঠেলে-ঠুলেই তাকে বাড়ি থেকে বা'র করে দিলে। কবরেজ বুঝতে পারল যে, সেই লোকটাই মন্ত্রদানের রাত্রে জিন্‌-বাদশার পার্ট প্লে করেছিল। কবরেজের বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল,—শীতের রাত্রেও ঘাম ছুটল, চোখ জলে ভ'রে এল।

কোন রকমে বাড়ি পৌঁছে কবরেজ গিন্নীকে দেখেই কেঁদে উঠল, দুঃখে, কি ভয়ে, কি রাগে তা ঠিক বুঝতে পারলে না। সমস্ত শুনে গিন্নীর বদনমণ্ডল বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত ঘোরাল হয়ে উঠল, কিন্তু বর্ষণ হ'ল না—কেবল চোখে দু-একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। কবরেজ তো অবাক! বললে, "কই, তুমি তো আমাকে বকলে না?" আর গিন্নীর দয়া দেখে তার নয়নে আবার অশ্রু ছুটল। গিন্নী বললে, "বকব, কিন্তু এখন নয়,—আগে টাকাটা আদায় হোক। এখন যা বলি তাই কর, কাল সকালে থানায় গিয়ে নালিশ কর।"

কবরেজ কিন্তু এ নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করতে রাজী নয়, কি থেকে কি হয় তা বলা যায় না; কিন্তু গিন্নীর কাছে কোন যুক্তিই খাটল না। তবে, একটা মিটমাট হয়ে এই ঠিক হ'ল যে, একেবারে পুলিসে না

গিয়ে প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েতের কাছেই নালিশ করা হোক,—যদি তারাই টাকাটা আদায় ক'রে দিতে পারে।

৬

পরদিন সকালেই কবরেজ প্রেসিডেন্টের বাড়ি গেল। প্রেসিডেন্টের ছেলে বললে যে, সে পুকুরের দিকে গেছে। সেখানে গিয়ে কবরেজ প্রথমে প্রেসিডেণ্টকে দেখতে পেল না। তারপর দেখলে, সে খেজুর গাছ থেকে বসের হাঁড়ি নামাচ্ছে। কবরেজের কাছে সব শুনে বললে, "কি যে তুমি বল কবরেজ? এও কখনও হয়? ফকির কি কখনও এসব কবতে পারে? যা হোক, আমি তো আর একা কিছু করতে পারি না। আমাদের আইন জান তো? মেম্বরদের নিয়ে কাল সকালে মীটিং করব, তুমি কাল বেলা নটাব সময় এখানে এস।"

কবরেজ তার পবদিন প্রেসিডেন্টের বাড়িতে গিয়ে দেখলে যে দরবার ব'সে গেছে। প্রেসিডেণ্ট একটা মোড়ার ওপর বসেছে আর মেম্বরবা চাটাইয়ের ওপর। প্রেসিডেন্টের সামনে 'আদায়কারী' একটা চৌকির ওপর কয়েকটা খাতাপত্র আর দোয়াত কলম নিয়ে পেশকাবেব ভূমিকায় অধিষ্ঠিত।

তখন খুব তামাক চলছে। একজন মেম্বর বললে, "কি হে কবরেজ, পান এনেছ? ব'স ব'স।

কবরেজ বসবামাত্র প্রেসিডেণ্ট বললে, "তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমি মেম্বরদের সব বলেছি—"

প্রেসিডেণ্টকে বাধা দিয়ে একজন মেম্বর বললে, "কই, আমি তো কিছু শুনি নি। কবরেজ, তুমি বল কি হয়েছে?"

প্রেসিডেণ্ট বললে, "তুমি কোথেকে শুনবে হে? এত দেরি ক'রে এসে কি শোনা যায়? মকদ্দমা বইয়ে লেখা হয়ে গেছে। তোমার ইচ্ছে হয় তো বই দেখে নাও। কবরেজ এখন কিছু বলতে গেলে সব গড়বড় হয়ে যেতে পারে।"

মেম্বর বললে, "বই দেখতে যাব কেন? ফরেদীর এজাহার না শুনলে কি মকদ্দমার বিচার করা যায়? আদালতে কি হয় দেখ নি? বল হে কবরেজ, বল।"

আর একজন মেম্বর বললে, "না কবরেজ, তুমি বলতে পাবে না। আমরা সমস্ত দিন ধ'রে এই করি আর কি! এত বেলা হয়ে গেল, আমাকে মাঠে ধান তুলতে যেতে হবে। মকদ্দমার বিচার এখুনি হয় তো হোক, নয় তো আমি চললুম।"

তখন দুই মেম্বরে ভীষণ তর্ক আরম্ভ হ'ল। অন্য মেম্বরাও যোগ দিলে। শেষে হাতাহাতির উপক্রম। বেগতিক দেখে প্রেসিডেণ্ট চৌকির ওপর সজোরে চপেটাঘাত ক'রে বললে, "তোমরা গোলমাল ক'রো না,—ভোট নেওয়া হোক।"

অবশ্য, বিদ্রোহী মেম্বর ছাড়া আর সকলেই প্রেসিডেণ্টের পক্ষে ভোট দিলে। সে মেম্বর রাগে গরগর করতে করতে তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তখন প্রেসিডেণ্ট বললে, "কবরেজ, তুমি যে টাকা দিয়েছ, তার প্রমাণ কি? তোমার সাক্ষী কই?"

কবরেজ বললে, "সাক্ষী তো আমার নেই। এ রকম ব্যাপারে কি কেউ সাক্ষীর সামনে টাকা নেয়?"

প্রেসিডেণ্ট বললে, "তা তো বুঝলুম, কিন্তু সাক্ষী না পেলে কি কেউ মকদ্দমার বিচার করতে পারে? যাক, যখন তোমার সাক্ষী নেই, তখন আমরা আর কি করব?" তারপর বেশ খাড়া হয়ে ব'সে গম্ভীরভাবে মকদ্দমার ইতিহাস ও তদানুষঙ্গিক অনুমানাদি মেম্বরদের বুঝিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "মকদ্দমায় আর কিছু করা দরকার কি না?" সকলে একবাক্যে বললে, "না আর কিছু করবার নেই।" তখন প্রেসিডেণ্ট কবরেজকে বললে, "আমরা আর এ সম্বন্ধে কিছু করতে পারি না; তবে আমার রিপোর্ট হাকিমের কাছে যাবে। তুমি ইচ্ছে কর তো থানায় এজাহার করতে পার।"

কবরেজ বেরিয়ে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ভাবলে, গুরু রক্ষে করেছেন যে পঞ্চায়েতের দরবারে মকদ্দমা আর বেশি দূর গড়াল না।

৭

কবরেজের কাছ থেকে সব শুনে গিন্নী বললে, "আমি তো আগেই বলেছিলুম যে, ও মুখপোড়ারা কিছুই করবে না। যাও, তুমি থানায় যাও। আজ না পার, কাল সকালে যাবে।"

প্রতিবাদ অনর্থক। কবরেজ ভাবলে, থানায় তো যেতেই হবে, তবে তার আগে একবার ফকিরের সঙ্গে দেখা করতে দোষ কি?

সেই দিন বিকালে ফকিরের বাড়িতে দেখা হতেই কবরেজকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই ফকির মহাদুঃখে মুখখানাকে অন্ধকার ক'রে বললে, "কবরেজ, তুমি করেছ কি? একটা দিন সবুর করতে পারলে না? আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে দিতুম।"

কবরেজ মুখ-চোখ লাল ক'রে বললে, "নাও নাও, খুব হয়েছে। আর বোঝাতে হবে না,—আমি সব বুঝেছি।"

"এই দেখ! আসল ব্যাপাবটাই তুমি বুঝতে পার নি। ভুল হে ভুল, মস্ত ভুল হয়ে গেছে। বড়কর্তারই ভুল হয়েছে। জিন্‌রা এখন আসবে কেমন ক'বে? তাদের দেশে যে চাষ-আবাদ আবম্ভ হয়ে গেছে।"

কবরেজের আর এসবে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি নেই। তবু একটু ঔৎসুক্য হ'ল। বললে, "এই শীতকালে চাষ-আবাদ কি রকম?"

"তাও বুঝি জান না? জিন্‌দের দেশে বৃষ্টি হয় না। শীতকালে খুব শিশিব পড়ে, তাতেই তাদের চাষ-আবাদ হয়। তাই শীতের প্রথম থেকেই তারা আব কোথাও যায় না। তুমি মাস দুই সবুর কর।"

"আব চালাকি করতে হবে না। ধাপ্পায় আর আমি ভুলছি না,—আমাব টাকা দিয়ে দাও।"

"টাকা কি আমাব কাছে আছে কবরেজ, যে, তোমাকে দিয়ে দেব? বাদশাব লোক এসে টাকা নিয়ে গেছে।"

"ও-সব বাদশা-টাদশা আমি আর কিছু শুনতে চাই না। যদি কাল সকালেব মধ্যে টাকা না দাও, তা হ'লে আমি পুলিস কেস করব. তা বলে দিচ্ছি।" ব'লেই কবরেজ খুব রাগ দেখিয়ে চ'লে গেল।

ফকিব বাড়ির ভেতব গিয়ে মাকে বললে, "মা, কবরেজ তো পুলিসে নালিশ করতে চলল। কিছুই হবে না তা জানি,—কিন্তু আমি এখন মাস খানেকের মত বাইবে চললুম। তুমি খুব সাবধানে থেকো। আর, কবরেজের টাকাটা কোথাও ভাল ক'রে লুকিয়ে রেখে দাও।

যদি পুলিস খানাতল্লাশির সময় টাকাটা পায়, তা হ'লে মেরে নেবে।

৮

পরদিন বেলা তিনটার সময় কবরেজ থানাতে উপস্থিত। সামনেই চৌকিদারী শেড্, ফকিরের বাড়ির মতই চালে খড় নেই। ভাবলে, এরাও জিনের কারবার করে নাকি? তখন চৌকিদারী প্যারেড হচ্ছে। অনেকেরই ইউনিফরম্ নেই,—কাপড় কি লুঙ্গির ওপর কেবল বেল্ট বাঁধা। কারুর কারুর বেল্ট কাঁধে ঝুলছে। যাদের পোশাক আছে, তাদেরও কেউ কেউ পাগড়িটা কোমরে জড়িয়েছে। এক চৌকিদার নিজে না আসতে পেরে তার তেরো বছরের ছেলেকে নিজের পোশাক পরিয়ে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে,—সে এক অদ্ভুত ছবি! ছেলেটা আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে। অনেকেই জটলা পাকিয়ে গল্প জুড়েছে। এক সেপাই হাজ্‌রে লিখছে।

কবরেজ সাহসে ভর ক'রে থানা-ঘরেব বারান্দায় উঠল। উঠেই দেখে, দরজার কাছে সেপাইয়ের এক পাগড়ি ও এক বেল্ট,—অর্থাৎ তাবাই তখন সেপাইয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ 'পাহারা'র কাজ করছে। উপায় কি? ছয় জন সেপাই—এর মধ্যে এক জন অসুস্থ, তিন জন মফস্বলে ও এক জন চৌকিদারদের হাজ্‌রে লিখছে। পাহারার সেপাই তখন কুয়ো থেকে জল তুলছিল। কবরেজকে দেখে তার কাছে এসে বললে, "দারোগা-সাহেব মফস্বল থেকে এখুনি আসবেন, জমাদার-সাহেব দাগী দেখতে গেছেন, রাইটার-সাহেব অফিস-ঘরে আছেন,—আপনার বিশেষ দরকার থাকে তো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন।'

কবরেজ শঙ্কিতচিত্তে অফিস-ঘরে ঢুকে দেখল যে, তক্তপোশের ওপর অধিষ্ঠিত, ধুতি ও সরকারী সোয়েটার পরিহিত, খাতাপত্র-পরিবেষ্টিত রাইটার-সাহেব একটা সংবাদ লিপিবদ্ধ করবার তালে আছেন। সংবাদদাতারা সামনে থাকায় তিনি কবরেজকে দেখতে পেলেন না। কবরেজ আবার বাইরে এসে দাঁড়াল। তখন 'পাহারা' গিয়ে রাইটার-সাহেবকে খবর দিলে যে, চৌকিদাররা যাবার জন্য ছটফট করছে। ডাক বন্ধ ক'রে পোস্ট-অফিসে পাঠাবারও সময় হয়েছে। সংবাদদাতারা বেরিয়ে আসবার পর কবরেজ ঘরে ঢুকতেই রাইটার-সাহেব বেশ একটু ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বললেন, "আপনার আবার কি? আঃ! আর পারি না!" ব'লেই ডাইরি-বই খুলে ঘড়ির দিকে তাকালেন। কবরেজ তার অভিযোগের মুখবন্ধস্বরূপ খানিকটা গড়গড় ক'রে ব'লে যেতেই রাইটার-সাহেব কিঞ্চিৎ ঝঙ্কারের সঙ্গে বললেন "থামুন মশাই, আমি বুঝেছি আপনার কেসটা কি। আপনি মন্তর পাবার জন্যে ফকিরকে টাকা দিয়েছিলেন, আর সেও আপনাকে মন্তর দিয়েছে। শুধু মুখে মুখে নয়, কাগজে লিখে দিয়েছে। ব্যস্, চুকে গেল,—আবার কি?"

"কিন্তু মন্তর যে চালাতে পারছি না।"

"তাতে আর কি হয়েছে মশাই? আপনি যদি একটা ঘড়ি কিনে বাড়িতে এনে চালাতে না পারেন, তা হ'লে কি দোকানদারের জেল হবে? বড জোর, আপনি সে মন্তর ফেরত দিয়ে আর একটা মন্তর চাইতে পারেন। আমি তো আপনার কথা থেকে কেস করবার মত কোন আইনের ধারাই খুঁজে পাচ্ছি না। তবে যদি—"

বলতে বলতে দারোগা-সাহেব এসে ঘরে ঢুকলেন। রাইটার-সাহেব হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আইনের কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে তিনি

পাশের ঘরে গিয়ে সোৎসাহে এন্‌ভেলাপে কাগজ-পত্র ভরতে আরম্ভ ক'রে দিলেন।

দারোগা-সাহেব কবরেজকে একটা বেঞ্চে বসতে ব'লে বেশ ধীরভাবে তার সমস্ত কথা শুনে এজাহার লিখে নিয়ে বললেন, "আমি চিটিং কেস রুজু করলুম। কাল সকালে তদন্ত করতে যাব। সাক্ষী হাজির রাখবেন।"

কবরেজ উঠে আসবার সময় দারোগা-সাহেবের সামনে একটি টাকা রাখতেই তিনি বললেন, "এ আবার কি?"

"এজাহার লেখবার খরচ।"

"আপনাকে কে বললে যে, এজাহার লিখতে খরচা লাগে?"

"আমি শুনেছি, থানাতে এজাহার কি ডাইরি লেখাতে গেলে এক টাকা ক'রে নেয়।"

"হ্যাঁ, হয়তো নেয় কেউ কেউ। কিন্তু আপনারা দেন কেন? পুলিসের কাছে মামলা করতে গেলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থানাতে বা আদালতে একটা পয়সাও খরচ করবার দরকার হয় না। আপনি এটা সকলকে জানিয়ে দেবেন। আচ্ছা, আপনি এখন যান।"

৯

পরদিন দারোগা-সাহেব এসে আর এক দফা কবরেজের জবানবন্দি করলেন। গণৎকারের ব্যাপার থেকে বর্ণনা আরম্ভ ক'রে কবরেজ বললে, "জয়নদ্দির বলদই সব অনর্থের মূল। আর জয়নদ্দির কথাতেই আমি ফকিরকে বিশ্বাস করেছিলুম। ফকিরের শাগরেদকে আটাশ টাকা দেবার সময় জয়নদ্দি উপস্থিত ছিল।"

দারোগা-সাহেব জয়নদ্দিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতেই সে দুই চক্ষু কপালে তুলে বললে, "হুজুর! আমি টাকাকড়ি দেওয়ার কথা কিছুই জানি না, তবে আমার গরু কবরেজের ফসল খেয়েছিল সেটা ঠিক। সেই নিয়ে আমার সঙ্গে কবরেজের ঝগড়া হবার সময় ফকির আমার বাড়িতে ছিল, আর আমার হয়ে দু-চার কথা কবরেজকে শুনিয়ে দিয়েছিল। সেই আক্রোশে কবরেজ তার নামে এই মিথ্যে নালিশ করেছে।"

কবরেজ তো এই শুনেই অবাক! দারোগা-সাহেব বললেন, "হ্যাঁ হে জয়নদ্দি মিঞা, তা তো বুঝলুম, কিন্তু ঝগড়া হ'ল তোমার সঙ্গে, আর কবরেজ মকদ্দমা করলে ফকিরের নামে—এটা তো বেশ বুঝতে পারলুম না। আচ্ছা, তুমি এখন যাও, আবার তোমাকে ডাকব।"

ধীরেন পালকে জিজ্ঞাসা করতে সে বললে যে, কবরেজ একটা লোককে আটাশ টাকা তার আর জয়নদ্দির সামনে দিয়েছিল, কিন্তু কি জন্যে টাকা দিয়েছিল তা সে জানে না।

সাক্ষীরা চ'লে যাবার পর দারোগা-সাহেব বললেন, "কবরেজ মশাই, দেখলেন তো? আর এ পথে যাবেন না, বিপদে প'ড়ে যাবেন। আপনার সাক্ষী-সাবুদের যে রকম গতিক, হয়তো আর কারুর হাতে পড়লে আপনাকে মিথ্যে মকদ্দমার চার্জে ফেলত।"

কবরেজ কান্নার সুরে বললে, "আমার টাকাও গেল, আবার আমি মিথ্যে মকদ্দমার চার্জে পড়ব!"

"আমি সেটা বুঝেছি। আমি ফকিরকে চিনি। তবে কি জানেন? এ পুলিস কেস, শাঁখের করাত—দু দিকে কাটে। কথায় বলে—বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। আপনি নেহাৎ ভাল মানুষ, এর পর বুঝে-সুঝে চলবেন। যদি আপনার নসিবে বড়লোক হওয়া থাকে,

তা হ'লে আপনার বড়ি আর পাচন থেকেই হবে। যাক, আমি এখন চললুম। যাবার সময় একবার ফকিরের বাড়িটা দেখে যাব, যদি কিছু প্রমাণ পাই, কি আপনার টাকাটাই পাই। সে তো ফেরার। আপনার মকদ্দমার যা রিপোর্ট দোব আপনাকে জানাব।"

দারোগা-সাহেব চ'লে যাবার পর গিন্নী কবরেজকে বললে, "সব মুখপোড়াই সমান, কারুর থেকে কিছু হবে না। দারোগা আবার ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! আমি যদি দারোগা হতুম—"

"তুমি আবার দারোগা হও নি কোন্‌খানটায়?"

"থাম থাম, আর রসিকতা করতে হবে না। আমি যদি সত্যি সত্যিই দারোগা হতুম, তা হ'লে এতক্ষণ ফকিরের ঘাড় ধ'রে সব টাকা আদায় ক'রে দিতুম। যাক, তুমি তো কিছু করতে পারলে না, আমি এবার কি করি দেখ।"

১০

তার পরের শনিবার সন্ধ্যাবেলায় কবরেজ-গিন্নী বিয়ের সময়ে পাওয়া নীলাম্বরী শাড়িখানি প'রে, মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে সিঁদুরটা ঢেকে, আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে, চাকরকে সঙ্গে নিয়ে বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল।

কবরেজ তো দেখেই চমকে উঠল,—নির্বাক, নিস্পন্দ! এ অভিযানের কি যে মর্ম, তা তার মাথাতেই ঢুকল না।

গিন্নী বললে, "তোমার মন্তর ফেরত দিতে যাচ্ছি। পুলিস তো তাই বলেছে। দাও তোমার মন্তরের কাগজ।"

"কোথা যাচ্ছ? ফকিরের বাড়ি? সে তো বাড়িতে নেই।"

"তা আমি জানি। তার মা তো আছে। তা হ'লেই হবে।"

"না না, তুমি মেয়েমানুষ—সেখানে কোথা যাবে?"

"মেয়েমানুষ আমি, না, তুমি? যাও, বাড়ির ভেতর গিয়ে ছেলে আগলাওগে,—তোমা থেকে যা হবে।" ব'লেই গিন্নী বেরিয়ে পড়ল।

ফকিরের বাড়িতে গিয়ে, চাকরকে বাইরে রেখে, ভেতরে ঢুকে দেখল যে ফকিরের মা রান্নাঘরে রান্না করছে। একেবারে গিয়ে তার সামনে দাঁড়তেই সে সেই মূর্তি দেখে ভয়ে "কে?" ব'লে চেঁচিয়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ গিন্নী এগিয়ে গিয়ে তার গলাটি টিপে ধ'রে উনোনের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে নাকীসুরে বললে, "চেঁচালে গলা টিপে মেরে ফেলব। তোর ব্যাটা আমাকে চেনে, আর তুই চিনিস না?"

ফকিরের মা কিছু বলতে পারল না। ভয়ে কাঁপতে লাগল। তখন তার দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে।

গিন্নী বললে, "আমি জিন্-বাদশার নানী। তোর ব্যাটার কাছ থেকে মন্তর শিখে একজন রোজ রাত্রে জিন্‌দের ডাকছে। চাষ-আবাদের সময় ব'লে পুরুষরা আসতে পারছে না, তাই মেয়েদেরই আসতে হচ্ছে। আমাকে রোজ দুপুর-রাত থেকে সমস্ত রাত বাইরের ঘরে আটকে রাখে। আমি আর পেরে উঠছি না। লোকটাকে অনেক ব'লে-ক'য়ে, খোসামুদি ক'রে, তার মন্তরটা নিয়ে এসেছি। মন্তরটা ফেরত নিয়ে তুই তার টাকাটা দিয়ে দে।'

ফকিরের মা একটু সাহস সঞ্চয় ক'রে বললে, "আমার ব্যাটা তো বাড়িতে নেই। সে কোথায় টাকা রেখে গেছে তা তো আমি জানি না।

গিন্নী তার গলায় বেশ একটু টিপুনি দিয়ে বললে, "খুব জানিস। টাকা দে।"

"না, আমি তো জানি না।"

তখন তার সর্বাঙ্গে কিঞ্চিৎ সবল ঝাঁকুনি দিয়ে গিন্নী বললে, "আচ্ছা, তা হ'লে তোকে এইখানেই শেষ ক'রে তোরই উঠনে কবর দিয়ে চ'লে যাই। আর আমি দেরি করতে পারব না।" ব'লেই আর এক বজ্র টিপুনি।

অতঃপর, ফকিরের মার গলাটি টিপতে টিপতেই তাকে ধ'রে তুলে নিয়ে কবরেজ-গিন্নীর অন্য ঘরে প্রবেশ ও চল্লিশ টাকা আদায় করণ, এবং তার মুখে শক্ত ক'রে কাপড় জড়িয়ে (যেন চেঁচাতে না পারে) তাকে ঘরের খুঁটিতে বন্ধন ও প্রস্থান।

বাড়িতে ফিরে এসে কবরেজের সামনে চল্লিশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে গিন্নী বললে, "এই নাও তোমার টাকা। এ থেকে দশ টাকা বোকার আক্কেল সেলামি বাদ গেছে। আর যদি কখনও ও-পথে যাও তো তুমিই আছ কি আমিই আছি! যাও, বড়ি ঘোঁটগে।"

সাধু-বাবা

ধানবাদ অঞ্চলের এক জঙ্গলে প্রায় এক মাস যাবৎ মানভূমের পুলিস-সাহেবের তাঁবু পড়িয়াছে। তখন ঝরিয়াতে কয়লার খাদ হয় নাই, তবে হইবার উপক্রম হইতেছে, ও কয়েকটি সাহেব কোম্পানি স্থানে স্থানে 'বোরিং' করিয়া মাটির নীচে কয়লার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে। এইরূপ এক কোম্পানির ইঞ্জিনিয়র-সাহেব পুলিস-সাহেবের তাঁবুর পাশে নিজের তাঁবু উঠাইয়া কাজকর্ম করিতেছেন। জনরব যে এই সাহেবটি পুলিস-সাহেবের পুরাতন বন্ধু, তাই তিনি এই বিজন বনে বন্ধুর রক্ষণাবেক্ষণ ও সাহচর্যে ব্রতী।

জঙ্গলের মধ্যে প্রায় দশ-বারো বিঘা জমি পরিষ্কার করিয়া তাহার মধ্যস্থলে সাহেবদের তাঁবু পড়িয়াছে। তাহার চারিদিকে দারোগা, জমাদার, কন্‌স্টেবলদের পাল ও তাহার পশ্চাতে চৌকিদার, দিগ্‌ওয়ারদের পর্ণকুটীরের সারি। সরঞ্জামের ত্রুটি নাই, কিন্তু কাজের মধ্যে পুলিস-সাহেব শিকার করেন, দারোগাবাবু ঘুমান, হাওলদার রামায়ণ পড়েন, ও সিপাহীরা গল্প করে, খৈনি খায় এবং সন্ধ্যার সময় হাওলদারজীর জন্য সিদ্ধি ঘোঁটে। চৌকিদার দিগ্‌ওয়ারদের অবশ্য কিছু কাজ আছে, অর্থাৎ তাহারা নদী হইতে জল আনে, সিপাহীদের বর্তন মলে, দারোগাবাবুর ঘোড়ার ঘাস যোগায় এবং রাত্রে আগুন জ্বালিয়া তাঁবুর চারিদিকে পাহারা দেয়। পাঠক স্মরণ রাখিবেন আমি সেকালের কথা বলিতেছি; একালে এ সব বড একটা চলে না।

একদিন প্রভাতে এক সাধু পুলিস-ছাউনিতে উপস্থিত হইল। সাধুর সুন্দর আকৃতি, বলিষ্ঠ গঠন, গায়ে গেরুয়া ও মাথায় জটা, হাতে

চিম্‌টা। কোন রকমে চৌকিদারের গণ্ডী ভেদ করিয়া তাঁবুর দিকে অগ্রসর হইতেই একজন হিন্দুস্থানী সিপাহী আসিয়া তাহার পথ রোধ করিল ও কিঞ্চিৎ সম্ভ্রমের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, সে কি চায়? সাধু তাহার ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে জবাব দিল যে, সে পুলিস-সাহেবের সহিত দেখা করিতে চায়। তাহার হিন্দী শুনিয়া সিপাহী বুঝিল যে, সাধু হিন্দুস্থানী নহে, বাঙালী। তখন তাহার ভক্তি কমিয়া গেল, কারণ বাঙালী যে "সাধু" হইতে পারে ইহা সে বিশ্বাস করে না। তাহাকে সেখানে দাঁড়াইতে বলিযা সে গিয়া হাওলদারকে সংবাদ দিল এবং এই মন্তব্য প্রকাশ কবিল যে, সাধু বোধ হয় সাহেবের কাছে কিছু ভিক্ষা চায়, অতএব তাহাকে আর বেশিদূর অগ্রসব হইতে দেওয়া সঙ্গত নয়।

হাওলদার সাধুর নিকটে আসিলে আরও দুই-চারজন সিপাহী সেখানে উপস্থিত হইল ও তাহাকে নানারূপ প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, সে খাঁশির (কাশির) দাওয়াই জানে কি না? তখন আর একজন অন্য এক সিপাহীকে টানিযা আনিয়া তাহার হাত দেখাইয়া, সাধুকে জিজ্ঞাসা করিল তাহার কখন সাদী হইবে। সাধু বেশ মনোযোগের সহিত তাহার হাত দেখিয়া ও মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল, আগামী বৈশাখ মাসে। কথাটা ঠিক লাগিয়া গেল, কারণ সত্য সত্যই ঐ সময় তাহার বিবাহের কথা হইতেছিল।

তখন সকলেরই সাধুর উপর বিশ্বাস হইল ও তাহারা তাহাকে লইয়া গিয়া হাওলদারের তাঁবুতে বসাইল। সেখানে গিয়াই সাধু জটা হইতে একটি বিল্বপত্র বাহির করিয়া বলিল যে, সে বৈদ্যনাথজী হইয়া আসিয়াছে ও এটি 'বাবা'র মাথার বিল্বপত্র। এই বলিয়া সে

পাতাটি খণ্ড খণ্ড করিয়া সকলের হাতে দিল। তারপব হাওলদারজীর হাতটি টানিয়া লইয়া তাহাব হাত দেখিয়া বলিল যে, তাহার তিন মাসের মধ্যেই "তরক্কী" হইবে। এ কথাটাও খুব লাগিয়া গেল, কারণ সাহেব হাওলদারকে খুব ভাল বাসিতেন (নতুবা তাহাকে সঙ্গে আনিবেন কেন ?) ও তাহাকে শীঘ্রই সুবে .ব কবিয়া দিবেন তাহারও আভাস মধ্যে মধ্যে দিতেন।

অতঃপর সাধু হাওলদাবেব নিকট তাহার আরজি পুনরায় পেশ করিল ও বলিল, "সাহেব দেখা করুন আব নাই করুন, এই রুদ্রাক্ষটি তাঁহার নিকট পাঠাইযা দিলেই হইবে।" হাওলাদাব ভাবিল, ইহাতে আব দোষ কি ? সাহেব তো দেখা করিবেনই না, তবে সাধুর এ উপরোধটা রাখি না কেন।

একজন সিপাহী দ্বারা রুদ্রাক্ষটি সাহেবের নিকট পাঠাইতেই তিনি তৎক্ষণাৎ সাধুকে দেখা কবিবার হুকুম পাঠাইলেন এবং তাহার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া তাহাকে কয়েকটি টাকা বখশিশ দিয়া বিদায় দিলেন। ইহাতে হাওলদাব ও সিপাহীগণ বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইল ও বলাবলি কবিতে লাগিল যে সাধু নিশ্চয়ই সাহেবেব হাত দেখিয়া তাঁহাব একটা ভাল সাদির খবর দিয়া আসিয়াছে।

তাঁবু হইতে কিছুদূরে সাধুব চেলা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। চেলাটি হিন্দুস্থানী, দীর্ঘাকার, হৃষ্টপুষ্ট, কাঁধে ঝুলি ও হাতে একটি ভীষণ লাঠি। উভযে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিল।

২

সাহেবের তাঁবু হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ দক্ষিণে রামনগর গ্রাম। এই গ্রামের কেশব রায় জয়রামপুর-রাজসরকারে কাজ করিত। প্রায় তিন মাস পূর্বে এক রাত্রে কেশবের বাড়িতে ডাকাতি হইল। কেশব তখন বাড়িতে ছিল। ডাকাতগণ তাহাদের প্রচলিত প্রথামত মশাল জ্বালিয়া, ডাকহাঁক করিয়া, লাঠি ঘুরাইয়া, ইট-পাটকেল ছুঁড়িয়া ডাকাতি করিয়া চলিয়া গেল ও যাইবার সময় কেশবকে তাহাদের সঙ্গে বাঁধিয়া লইয়া গেল।

সেই অবধি কেশবের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কিছুদিন দেখিয়া গ্রামের লোক সিদ্ধান্ত করিল যে, কেশব জমিদারের চাকুরি করিতে গিয়া প্রজাপীড়ন করিয়াছিল, তাহার ফলে এই ডাকাতি ও তাহার অপমৃত্যু ; কারণ যখন এতদিনের মধ্যে সে ফিরিল না, তখন এ ছাড়া আর কি হইতে পারে? গ্রামের কয়েকজন প্রধান লোক, গ্রাম্য পুরোহিত ভটচাজ মশাইকে সঙ্গে লইয়া কেশবের বাড়িতে আসিল ও কেশবের স্ত্রীকে নানারূপ সান্ত্বনা দিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল যে, ডাকাতরা নিশ্চয়ই কেশবকে মারিয়া ফেলিয়াছে এবং শাস্ত্রের বিধান-মত তাহার বিধবার বেশ ও আচার গ্রহণ করা আবশ্যক ও সাধ্যানুযায়ী শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াও কর্তব্য। কেশবের স্ত্রী প্রৌঢ়া হইলেও গ্রাম্য প্রথামত বেশ লম্বা ঘোমটা দিয়া দরজার ফাঁকে বসিয়া ছিল। সে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া দুই-একবার চোখ মুছিল, দুই-একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল ও দুই-এক কথায় সমাগত প্রতিবেশীদের জানাইয়া দিল যে সে বৈধব্য স্বীকার করতে রাজী নহে। যাইবার সময় ভটচাজ মশাই তাহার সম্বন্ধে দুই-একটা শ্রুতিকঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া প্রবীণদিগকে বিধান

দিলেন যে, মেযেটার এই অনাচারের জন্য তাহাকে একঘ'রে করা আবশ্যক।

৩

সাহেবের তাঁবু হইতে বাহির হইযা সাধু বামনগব অভিমুখে চলিতে লাগিল ও সন্ধ্যাব কিছু পূর্বে কেশব বাযেব বাড়িতে সশিষ্য উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী দেখিয়া কেশবেব স্ত্রী প্রণাম করিল ও বসিতে আসন দিল। অল্পক্ষণ কথাবার্তাব পব সাধু বলিল, "মা, আমি অনেক কষ্টে এই জঙ্গলেব মধ্যে তোমাব ঘব খুঁজে বাব করেছি।"

কেশবের স্ত্রীব মুখে কিঞ্চিৎ ভয়ের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু সেটা সামলাইযা লইযা বেশ একটু সহজভাবেই জিজ্ঞাসা কবিল, "কেন বাবা, আমাব বাড়িতে তোমাব কি কাজ আছে?"

সাধু বলিল, "আমাব খুব জরুবী কাজ আছে মা। আমি দেবতাব আদেশে এখানে এসেছি।"

দেবতার কথা বলায কেশবেব স্ত্রী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল ও যথাসম্ভব সাহস সঞ্চাব কবিযা বলিল, "কি আদেশ বাবা, দেবতাব?"

"এ খুব গোপনীয কথা মা। আমি আব আমাব চেলা ছাড়া আব কেউ জানে না,—এবং তুমি ও তোমার স্বামী ছাড়া আব কেউ জানলে আমাব সমস্ত কাজ পণ্ড হযে যাবে।"

"তুমি স্বচ্ছন্দে বলতে পার বাবা। আমাব বাড়িতে কেউ আসে না। গ্রামেব লোক আমাকে একঘ'রে কবেছে। কেবল আমার চাকরাণী বাড়িতে থাকে, সে এখন নেই।"

সাধু একবার ইতস্তত চাহিয়া বলিল, "তবে শোন মা। আমি

একজন বাঙালী জমিদারের ছেলে ; কোন বিশেষ কারণ বশত আজ প্রায় বারো বৎসর সন্ন্যাস নিয়েছি। তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে এবার যথন অযোধ্যায় রঘুনাথজীর মন্দিরে গেলাম, তথন এক রাত্রে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হ'ল যে মানভূমের রামনগর গ্রামের কেশব রায়ের বাড়িতে গুপ্তধন আছে, তুমি গিয়ে তা উদ্ধার কর।"

কেশবের স্ত্রী বলিল, "আমরা তো কিছু জানি না বাবা।"

সাধু তাহার 'আমবা' কথাটার উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তোমরা কেমন ক'রে জানবে ! আমিই ঠিক তার স্থান এথনও জানি না, তবে তোমাদের বাস্তভিটার মধ্যে মাটির নীচে আছে এই পর্যন্ত জানি। তারপর যা কিছু সেটা আমি পূজো ধ্যান ক'বে বাব করব। একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, দেবতার আদেশ যে তুমি ও তোমার স্বামী একত্রে মাটি খুঁড়ে গুপ্তধন উদ্ধার করবে, আমরা অবশ্য সাহায্য করব।"

স্বামীর কথায় কেশবের স্ত্রী একটু চমকিয়া উঠিল ও বলিল, "বাবা, আমার স্বামী তো প্রায় তিন মাস নিরুদ্দেশ। লোকে বলে, তিনি বেঁচে নেই।"

সাধু গম্ভীরভাবে বলিল, "লোকে যা বলে বলুক, আমি বলছি সে বেঁচে আছে।" বলিয়াই তাহার মুখেব উপর এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং তাহার মুখের বিশেষ কোন ভাবান্তর হইল না ইহাও লক্ষ্য কবিল।

সন্ন্যাসীর কথাটা শুনিয়া কেশবের স্ত্রী যেন একটু গোলমালে পড়িল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সংযত হইয়া বলিল, "তাই বলুন বাবা, সে যেন ফিবে আসে।"

সাধু এইবার তাহার মুখের দিকে সম্পূর্ণভাবে চাহিয়া ধীব গম্ভীব

স্বরে বলিল, "মা, আমি সন্ন্যাসী, আমার কাছে মিথ্যা ব'লো না; তুমি ঠিক জান যে, তোমার স্বামী বেঁচে আছে, আর যদি আমার সাধনা সত্য হয় তা হ'লে তুমি এও জান যে সে এখন কোথায় আছে।"

এই বলিতে বলিতে সন্ন্যাসীর উজ্জ্বল চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল ও মৌনং সম্মতি লক্ষণং ঠিক করিয়া সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, তখন কেশবের স্ত্রী কিছু ইতস্তত করিয়া ও দুই-একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া কি বলিবে ঠিক করিতে না পারিয়া হঠাৎ কিঞ্চিৎ উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "না বাবা, আমি কিছুই জানি না।" তারপর দুই-একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, "তিনি বেঁচে আছেন কি না জানি না; আমার ছেলেপুলে নেই, আমি গুপ্তধন নিয়ে কি করব বাবা? আমার ওসব দরকার নেই।"

সন্ন্যাসী বলিল, "তোমার দরকার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার ওপর দেবতার আদেশ মা। আমাকে এ ধন উদ্ধার করতেই হবে। তোমরা না নাও, আমি দেবতার কাজে লাগাব। শোন মা, আজ মধ্যরাত্রে আমি তোমার এই ঘরে ব'সে পূজো করব, তা হ'লে আমি জানতে পারব বাড়ির কোন্‌খানে এই গুপ্তধন আছে। তারপর যা ব্যবস্থা করতে হয় আমিই করব। তুমি আমার পূজোর যোগাড় ক'রে রেখে দিও। আর কাউকে কিছু ব'লো না—বললে অনিষ্ট হবে। আমি এখন চললুম।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী ও চেলা বাহির হইয়া গেল।

কেশবের স্ত্রী কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একবার তাহার মনে হইল, প্রতিবাসীদিগকে জানায়; কিন্তু প্রথমত তাহারা সাহায্য করিবে কি না সন্দেহ, দ্বিতীয়ত সন্ন্যাসীর কোপে পড়িলে

অনিষ্ট হওয়া সম্ভব; তাহা ছাড়া গুপ্তধনের লোভও কিছু কিছু হইতেছিল। এই সব চিন্তা করিয়া অবশেষে সে সাধুর কথানুসারেই কাজ করা স্থির করিল এবং সন্ধ্যার পর ঘরের মধ্যে তাহার পূজার সমস্ত যোগাড় করিয়া রাখিয়া পাশের ঘরে দাসীকে লইয়া দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

সাধু যথাসময়ে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া পূজায় বসিল। চেলা দরজার সামনে পাহারায় থাকিল। অল্প কিছু পূজার পরেই সাধু ঘরের প্রত্যেক জিনিস নিবিষ্টচিত্তে দেখিয়া লইল ও নিজের কাপড়েব ভিতর হইতে এক গোছা চাবি বাহির করিয়া তাহার দ্বারা ঘরে যে কয়টি বাক্স ছিল তাহা একে একে খুলিল। একটি বাক্সে কিছু গহনা ও টাকা ছিল। ইহা দেখিয়া সাধু মনে মনে ঈষৎ হাসিল, কারণ যাহার বাড়িতে তিন মাস আগে এ রকম একটা ডাকাতি হইয়া গিয়াছে তাহার বাক্সে টাকা ও গহনা! যাহা হউক সে সে-সব কিছুই লইল না, কিন্তু বাক্সগুলির মধ্যে কাগজপত্র যাহা ছিল তাহা তন্নতন্ন কবিযা দেখিল, ও তাহার মধ্য হইতে দুই-তিনখানি কাগজ ও চিঠি সংগ্রহ করিয়া বাক্সের জিনিসপত্র যথাস্থানে রাখিয়া দিল।

অতি প্রত্যুষে সন্ন্যাসী ঘর হইতে বাহির হইতেই কেশবেব স্ত্রী আসিয়া প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী বলিল, "মা, আমার পূজা সিদ্ধ হইয়াছে; তোমার স্বামী বেঁচে আছে, দেবতার বাক্য মিথ্যা হয় না। সে কোথায় আছে বা থাকা সম্ভব যদি আমায় বলতে, তা হ'লে আমার কাজ খুব সহজ হয়ে যেত। যা হোক, আমি এক মাস পরে আবার আসব, এবং আশা করি তখন তোমার স্বামীর সঙ্গে এখানে আমার দেখা হবে। তাকে না পেলে আমার কাজ হবে না।" এই বলিয়া সাধু ও চেলা চলিয়া গেল।

৪

বামনগব হইতে প্রায তিন ক্রোশ দূবে চকডিহি গ্রাম। গ্রামটি বেশ বড ও কয়েকটি পল্লীতে বিভক্ত। তাহাব মধ্যে একটি পল্লীতে, গ্রামের জমিদারের বাস, ও তাঁহার কাছাবি-বাডি, আত্মীয-স্বজনের বাডি ও খামাব-বাড়ি, দেবালয ইত্যাদি লইযাই সেই পল্লী গঠিত। প্রায তিন মাস হইল জমিদাবেব বাডিতে আব কয়েকটি জমিদাব ও তাহাদেব কর্মচাবীবর্গ আসিযাছেন। উদ্দেশ্য, কযলাব খাদ সম্বন্ধে পবস্পবেব মধ্যে পবামর্শ কবিযা নিজেদেব দাবি দাওয়া ঠিক করা। জযবামপুবের বাজা উর্ধ্বতন জমিদাব, ও আইন অনুসাবে তাঁহাব জমিদাবিব মধ্যে কোথাও কয়লা থাকিলে তাঁহাবই তাহাতে অধিকাব, কিন্তু পত্তনিদাবগণ পুবাতন দলিল ইত্যাদি দেখাইয়া প্রমাণ কবিতেছেন যে, বাজাব পূর্বপুরুযেবা পত্তনি দিবাব সময নিম্নস্বত্ব পর্যন্ত দিয়া গিযাছেন। এই সমস্ত ব্যাপাব লইযা বাজাব সহিত তাঁহার পত্তনিদাবদেব মামলা-মকদ্দমা চলিতেছে ও চকডিহিব জমিদার শঙ্কববাবু তাঁহাদেব নেতৃত্ব গ্রহণ কবিয়াছেন। তাঁহাব কাছাবিতে ও জমিদাবপাডাব অন্যান্য স্থানে প্রায় প্রত্যহ গোপনীয বৈঠক বসিতেছে, ও যাহাতে বাহিবেব লোক কোন কিছু জানিতে না পাবে তাহাব জন্য কড়া পাহাবাব বন্দোবস্ত হইযাছে।

একদিন প্রত্যুষে পূর্বোক্ত সাধু চকডিহিতে সশিষ্য উপস্থিত হইল ও জমিদাবপাড়াব দুই-চাবি ঘর ঘুবিয়া ক্রমশ প্রকাশ করিল যে, সে বদবিকাশ্রম হইতে আসিতেছে এবং বীবভূম জেলায বক্রেশ্ববেব শিবালয ও উষ্ণপ্রস্রবণ দেখিতে যাইবে। সাধুর কথাবর্তা ও ব্যবহাবে সকলেই

সন্তুষ্ট হইল। জমিদারপাড়ার এক দেবালয়ে তাহার থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইল।

সাধু মুষ্টিভিক্ষা ছাড়া আর কোনও দান গ্রহণ করে না, সুতরাং স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও সে কাহারও নিকট অন্য কোন দ্রব্য লইতে স্বীকৃত হইল না। সাধু প্রত্যহ ভিক্ষা করে ও চেলা জঙ্গল হইতে কাঠ ইত্যাদি আনিয়া পাকের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। অল্পদিনের মধ্যে সকলেই জানিতে পারিল যে, সাধু বাঙালী ও সে অতি সুন্দর গান গাহিতে পারে। অতএব শীঘ্রই "সাধু-বাবা" সকলের প্রিয় হইয়া উঠিল। ক্রমশ গান শুনাইবার জন্য সে অনেক বাড়ির ভিতরেও যাইতে আরম্ভ করিল এবং বিশেষ অনুরোধ করিলে দুই-একজনেব হাতও দেখিলে লাগিল। সকলেই বলিতে লাগিল, সাধু-বাবা খুব ভাল লোক,—তান্ত্রিক যোগী।

৫

এইরূপে প্রায় এক মাস গত হইল। একদিন দ্বিপ্রহরে সাধু-বাবা ভিক্ষা শেষ করিয়া গ্রামের প্রান্তে এক গাছতলায বসিয়া আছে ও তাহার চেলা কিছুদূরে জঙ্গল হইতে সংগৃহীত কাঠেব বোঝা বাঁধিতেছে। সাধুর মুখে ক্লান্তির লক্ষণ,—যেন গত রাত্রে নিদ্রা হয় নাই, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকাইতেছে। এই অবস্থায় যেন অজ্ঞাতসারে তাহার হস্তদ্বয় যুক্ত হইয়া আকাশের দিকে প্রসারিত হইল, নয়নদ্বয় নিমীলিত হইল, ও মুখে ভগবদ্ভক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল। সাধু আপন মনে বলিয়া উঠিল, "ভগবান, তবে কি আমার যাত্রা নিষ্ফল হ'ল!" চেলা তখন নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু সাধুকে ডাকিতে

সাহস করিতেছে না। সাধু চক্ষু খুলিতেই চেলা বলিল, "বাবা, অনেক বেলা হযেছে, চলুন।" তখন সাধু উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইল যে জঙ্গলের ভিতর দিয়া একটি গরুব গাড়ি আসিতেছে। গাড়ি আব কিছু নিকটে আসিতেই দেখা গেল যে, উহাতে পুরাতন পচা খড বোঝাই আছে। ইহা দেখিয়া নিমেষ মাত্র সাধু কি ভাবিল, তারপব তাহাব চক্ষুদ্বয় এক অসাধাবণ জ্যোতিতে ভবিয়া উঠিল ও মুখে আনন্দেব প্রবাহ খেলিয়া গেল। অত্যন্ত নিবিষ্টমনে গাড়িটি আব একবাব দেখিয়া সাধু চেলাকে চুপিচুপি কি বলিল ও আপনাব আবাসস্থান অভিমুখে চলিয়া গেল।

চেলা তাহাব কাঠেব বোঝাটি মাথায় লইযা একটু ঘুবিযা ফিবিযা আসিযা গাড়িব নিকটবর্তী হইল ও গাড়োয়ানেব সহিত কথা কহিতে কহিতে চলিতে লাগিল। গাড়ি গিযা জঙ্গলেব প্রান্তস্থিত একটি প্রাচীববেষ্টিত বাড়িতে ঢুকিল। ইহাব কিছু পূর্বে চেলাব মাথা হইতে কাঠেব বোঝাটি অকস্মাৎ পড়িয়া গিয়াছিল, ও সে তাহা পুনবায বাঁধিতে ব্যস্ত হইল কিন্তু এই ব্যস্ততাব মধ্যেই গাড়িটিব গন্তব্যস্থান দেখিযা লইল।

৬

বাত্রি দ্বিপ্রহব। ঘোব অন্ধকাব। যে বাড়িতে গাড়ি ঢুকিযাছিল, তাহাব সম্মুখের দবজাব সামনেব বাবান্দায় দুইজন লোক পাহারায় নিযুক্ত,—একজন বসিয়া আছে ও আর একজন ঘুমাইতেছে।

কিছু দূবে আপাদমস্তক কম্বল ঢাকা দিযা একটি লোক হামাগুড়ি দিযা দেওয়ালের দিকে অগ্রসব হইতেছিল। একটু খসখস শব্দ হইতেই

প্রহরী অর্ধজড়িত স্বরে বলিয়া উঠিল, "কে?" কিন্তু তাহার তখন তন্দ্রার আবেশ হইতেছিল ও শীতে গায়ের ঢাকা খুলিয়া উঠিবার বিশেষ প্রবৃত্তি ছিল না। তাই সে কোনক্রমে একবার মাত্র আপনাব কর্তব্য পালন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

ইত্যবসরে লোকটি দেওয়ালের নিকট আসিয়া যেখানে দেওয়ালের গায়ে ছোট ছোট গাছের ঝোপেব মত ছিল তাহার মধ্যে ঢুকিয়া খুব ধীরে ধীরে দেওয়ালের নীচে একটি সিঁধ কাটিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিল। ঐ দেওয়ালটাই মাটির এবং অন্য তিন দিকে দালান ঘব। বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া লোকটি বুঝিতে পারিল যে, একটি ঘরে আলো জ্বলিতেছে ও জানালার ফাঁক দিয়া ঈষৎ আলো বাহিব হইতেছে। অতি ধীরে ও প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করিয়া সে সেই জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল যে, ঘরের ভিতর একটা লোক অতি নিবিষ্ট মনে কি লিখিতেছে। ইহা দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ সরিয়া আসিল ও পূর্ববৎ সাবধানতাব সহিত সিঁধের ভিতব দিয়া বাহির হইয়া মাটি দিয়া সিঁধটি বন্ধ কবিযা নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

পরদিন রাত্রে উল্লিখিত প্রহরীদেব মধ্যে একজন দরজার সম্মুখে বসিয়া তামাক খাইবাব ব্যবস্থা করিতেছিল। তাহাব জুড়িদার তখনও আসে নাই। সে দেখিতে পাইল যে, দুইটি লোক বাড়ির দিকে আসিতেছে। শীতকালে সন্ধ্যার পব পাড়াগাঁয়ে সাধারণত কেহ বাটিব বাহির হয় না। সেইজন্য লোক দুইটিকে দেখিয়া সে একটু চমকিত হইল ও "কে?" বলিয়া হাঁক দিল।

আগন্তুকদের মধ্যে একজন বলিল, "বাবা, আমি সাধুজী।" এই বলিয়া উভয়ে প্রহরীর নিকট আসিল।

সাধু-বাবা ও তাহার চেলাকে দেখিয়া প্রহরী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল,

কারণ তাহাদের দ্বারা কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। সাধু বলিল, "বাবা, জমিদার-বাড়ির মেয়েরা আমার গান শুনবেন ব'লে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাই এসেছি।"

দরোয়ান বলিল, "সাধুজী, আপনি ভুল করছেন; এ বাড়ি নয়। আপনি ফিরে খানিক দূর গিয়ে ডান দিকে ্য রাস্তা পাবেন সেই রাস্তায় গেলেই জমিদারবাবুব বাড়ির সামনে উঠবেন।"

সাধু বলিল, "তাই যাচ্ছি বাবা।"

এই শুনিয়া প্রহরী যেমন পুনরায় তামাকে মনঃসংযোগ করিল, অমনি সাধুব চেলা লাফাইয়া গিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল ও মুখ চাপিয়া ধরিল। সাধু তৎক্ষণাৎ ঝুলি হইতে দুই খণ্ড কাপড় বাহির করিয়া প্রহরীব মুখ ও হাত বাঁধিয়া ফেলিল। তাবপব তাহাকে পিস্তল দেখাইয়া বলিল, "আমাদের সঙ্গে এস।"

সকলে বাড়ির ভিতর ঢুকিল ও যে ঘরে চেলা পূর্ব রাত্রে আলো জ্বলিতে দেখিয়াছিল তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। ইঙ্গিত মাত্রে চেলা লাথি মাবিযা দরজা ভাঙিয়া ফেলিল ও সাধু তাহাব হাতে প্রহবীকে দিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল যে, একটা লোক জানালা ভাঙিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতেছে। সাধু লাফাইয়া গিয়া বজ্রমুষ্টিতে তাহার হাত ধরিতেই সে চীৎকার কবিয়া উঠিল, "অ্যাঁঃ, সাধু-বাবা!" সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, সাধু তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "চীৎকার ক'রো না কেশব রায়। আমি সাধু-বাবা কি তোমার যম তা দেখো" এই বলিয়া ঝুলির মধ্য হইতে পুলিস ইন্সপেক্টরের টুপি বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইল।

ইতিমধ্যে প্রহরী লোকটির সাহায্যার্থ যাহা হউক কিছু করিবার

জন্য চেলার সঙ্গে ধস্তাধস্তি আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু সাধু পুনরায় ঝুলি হইতে পিস্তল বাহির করিয়া তাহার দিকে উঠাইয়া বলিল, "সাবধান, আমি পুলিস। যদি আমাদের কাজে বাধা দেবার চেষ্টা কর, তা হ'লে গুলি করব।" প্রহরী নিরস্ত হইল। তাহার জুড়িদার আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু দূর হইতে ব্যাপার কিঞ্চিৎ গুরুতর অনুমান করিয়া আর বেশিদূর অগ্রসর হওয়া সঙ্গত নয় বিবেচনা করিয়া জমিদার-বাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই জমিদার ও তাহার কর্মচারীগণ, দরোয়ান, পাইক ইত্যাদি সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সাধু কেশব রায়ের হাতে হাতকড়া লাগাইয়া তাহাকে লইয়া বারান্দায় বসিয়া আছে, এবং চেলা ঘরের ভিতর কাগজপত্র, লিখিবার সরঞ্জাম, জয়রামপুর-রাজ-সরকারের পুরাতন শীলমোহর ইত্যাদি একত্র করিয়া একটি কাপড়ে বাঁধিতেছে।

শঙ্করবাবু ও তাহার লোকজনকে দেখিয়া কেশব রায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখন তাহাদের মধ্যে কেহ বলিল, "শালা ভণ্ড সাধুকে মেরে তাড়িয়ে দাও।" কেহ বলিল, "তাড়িয়ে দেবার দরকার কি? এত রাত্রে বেচারা কোথা যাবে? তার চেয়ে একেবারে শেষ ক'রে জঙ্গলে ফেলে দাও, আর চেলা ব্যাটাকে গর্তে পুঁতে ফেল।"

সাধু যখন দেখিল যে সত্য সত্যই তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার উপক্রম হইতেছে, তখন সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া পিস্তল দেখাইয়া জলদগম্ভীর স্বরে বলিল, "দেখুন, আপনারা গোলমাল করবেন না। আমি সন্ন্যাসী নই,—ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর শ্রীরামবাবু। বোধ হয় আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ আমার নাম শুনে থাকবেন। আমি যখন এই সব দলিল

জালের সন্ধান পেয়েছি ও অপরাধীকে ধরেছি, তখন সহজে ছাড়ব না। কেউ যদি এক পা আমার দিকে এগোয়, আমি গুলি করব, ও আমার সিপাহীও গুলি চালাবে। কেন কতকগুলো খুন-জখমের দায়ী হবেন?"

ইহা শুনিয়া সকলে থমকিয়া দাঁড়াইল ও দরোয়ানের আস্ফালন বন্ধ হইল। তখন সাধু আবার বলিল, "অনর্থক গোলমাল করবেন না। আমি যখন এতদিন এখানে আছি তখন এটা বেশ বুঝতে পারছেন যে, এ গ্রামে গোপন ভাবে আরও অনেক পুলিস আছে (এটা অবশ্য সত্য নহে)। যা হোক, এই রাত্রে আমরা যেমন ভাবে আছি তেমনই থাকি। কি করা উচিত সেটা কাল সকালে পরামর্শ ক'রে ঠিক করব।"

তখন শঙ্করবাবু অগ্রসর হইয়া বলিল, "আপনি যদি পুলিস কর্মচারী, আপনাকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। তবে আপনি সত্যি সত্যি কে ও কেন একে ধরেছেন ইত্যাদি যখন আমরা কিছুই জানি না, তখন আজ রাত্রের জন্য এই ব্যবস্থা থাক্ যে, আপনি আজ ওকে কোথাও নিয়ে যেতে পারবেন না। কাল সকালে আমরা সমস্ত দেখে শুনে যা করা উচিত বিবেচনা করি তা করব এবং এই বাড়ির চারদিকে দরোয়ানেরা পাহারা দেবে।" সাধু তাহাতে স্বীকৃত হইলে জমিদারবাবুরা দরোয়ানদের সেখানে রাখিয়া অন্য সকলকে লইয়া চলিয়া গেল।

কিছু রাত্রে চেলা সাধুকে বলিল, "দেখুন, গতিক ভাল বোধ হচ্ছে না। চলুন, লোকটাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি; দরোয়ানগুলোকে পিস্তল দেখিয়েই ভাগানো যাবে।"

সাধু বলিল, "তার দরকার নেই লছমী। তাদের কথা দিয়েছি। তবে তুমি একটু হুঁশিয়ার থেকো।"

৭

পরদিন প্রাতে জমিদারের লোক নিজেদের গ্রামে ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিল যে, প্রকাশ্য কিংবা গুপ্তভাবে সেখানে আর কোন পুলিস নাই। তারপর তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, কেশব রায়কে কিছুতেই ধরিয়া লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। তবে গ্রামের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে পুলিসের উপর বল প্রয়োগ না করিয়া, যখন তাহারা তাহাকে লইয়া যাইবে তখন জঙ্গলের মধ্যে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া কাজ শেষ করিতে হইবে।

ইহার অল্পক্ষণ পরেই শঙ্করবাবু ও অন্যান্য দুই-একজন জমিদার ও তাহাদের কর্মচারীরা সাধুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। শঙ্করবাবু একটু হাসিয়া বলিল, "সাধু-বাবা, আপনি আপনার আসামীকে নিয়ে যেতে পারেন; আমাদের কোন আপত্তি নেই।"

কথাটা শুনিয়া সাধু একটু চমকিত হইল, কারণ এত সহজে অপর-পক্ষ এ কথাটা স্বীকার করিবে তাহা সে প্রত্যাশা করে নাই। তৎক্ষণাৎ আপনাকে সংযত করিয়া সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শঙ্করবাবু ও তাহার সঙ্গীদের মুখের দিকে একবার চাহিয়া লইল ও ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ধন্যবাদ শঙ্করবাবু, এটাই সুযুক্তি। আপনাদের আশ্রয়ে এতদিন বড় আনন্দে ছিলাম; শেষটায় কোন গোলমাল হ'লে আমার মনে বড় কষ্ট হ'ত। যা হোক যখন এতটা অনুগ্রহই করলেন, তখন আপনি ও আপনার বন্ধুরা দয়া ক'রে আমার এই খানাতল্লাশিটায় সাক্ষী হ'লে বড় বাধিত হব।" এই বলিয়া সকলকে প্রাচীরের দিকে লইয়া গিয়া সাধু কয়েকটি খড়ের

গাদার মধ্যে একটি পুরাতন খড়ের গাদার নিকট গিয়া খড়গুলি টানিয়া সরাইতে লাগিল। শঙ্করবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল।

সাধু সেই পচা খড়ের মধ্য হইতে তিন-চারখানি দলিল টানিয়া বাহির করিয়া বলিল, "বাঃ! এ যে দেখছি জয়রামপুর এস্টেট থেকে বহুকাল পূর্বে প্রদত্ত নিম্নস্বত্বের দলিল! কিন্তু এমন সব মূল্যবান দলিল আপনাদের লোহার সিন্দুকে না থেকে খড়ের গাদার মধ্যে আছে কেন বলতে পারেন?" কেহ কোনও উত্তর দিল না। তখন সাধু শঙ্করবাবুর দিকে এক মর্মঘাতী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "শঙ্করবাবু, আপনি ও আপনার সহযোগী জমিদারগণ এই বাড়িতে কেশব রায়ের দ্বারা এই সব দলিল জাল করাচ্ছেন, ও দলিলের কাগজ ও কালি পুরাতন দেখাবার জন্য পচা খড়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। আপনাদের অপরাধের আর কোন প্রমাণ চাই কি?"

শঙ্করবাবু কি বলিবে ঠিক করিতে পারিল না; তাহার মুখে ভয় ও উদ্বেগের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিল।

সাধু দলিলগুলি সাবধানে রাখিয়া শঙ্করবাবুকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, "দেখুন শঙ্করবাবু, এত সব গোলমালে আবশ্যক কি? ফৌজদারী মকদ্দমার কথা বলা যায় না। যে রকম দেখছি, আপনারা সকলেই এতে জড়িয়ে পড়বেন। তার চেয়ে একটা কিছু মিটমাট ক'রে ফেলুন না;—কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না, আর আপনাদের কাজ যেমন চলছে সেই রকমই চলবে।"

কথাটা শঙ্করবাবুর খুবই মনঃপূত হইল। বলিলেন, "সে তো খুব ভাল কথা, তবে আমাকে অন্যান্য সকলের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে, কিছু সময় চাই।"

সাধু বলিল, "আজ বৈকালের মধ্যে, কারণ আসামীকে চব্বিশ

ঘণ্টার বেশি রাখবার আমার ক্ষমতা নেই। তবে এ যে রকম গুরুতর মকদ্দমা ও এত টাকার ব্যাপার এতে জড়িত যে আমি পঞ্চাশ হাজার টাকার কমে কিছুতেই পারব না। আমি জানি আপনারা প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ জন পত্তনিদার এর মধ্যে আছেন, কাজেই এটা আপনাদের পক্ষে শক্ত নয়।"

জমিদারের পক্ষ পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, টাকা দিয়া মুক্তিলাভ করাই যুক্তিসঙ্গত। মধ্যাহ্নে শঙ্করবাবু আসিয়া সাধুকে জানাইল যে, তাহারা ত্রিশ হাজার টাকা দিবে এবং তাহার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা সেইদিনই ও বাকি টাকা পনরো দিনের মধ্যে দিবে।

ইহাতে স্বীকৃত হইয়া হাসিতে হাসিতে সাধু বলিল, "শঙ্করবাবু, আব আমি 'সাধু-বাবা' নই,—পুরোদস্তুর ইন্সপেক্টরবাবু। অতএব আর গেরুয়ার দরকার নেই! আমাকে আপনার বাড়িতে কিছুক্ষণ পরে অন্য বেশে দেখতে পাবেন। যখন আমাদের বন্ধুত্ব হ'ল, তখন একটু আমোদ-প্রমোদই করা যাক। আজ সন্ধ্যাবেলায় আপনাব ওখানে গান-বাজনা করা যাবে, আপনি কিছু ভাল বকম খাওয়া-দাওযাব যোগাড করুনগে। আজ দেড় মাস বেগুন-পোড়া আর ভাত চলেছে। আর একটা কথা, যখন আসামীই ফসকে গেল তখন তো আর যাবাব তাড়াতাড়ি নেই, তবে আমাদের সকল বিষয় মিটমাট না হওয়া পর্যন্ত আসামীটি আমার চেলার নজরবন্দীতে এই ঘরেই থাকবে।"

বৈকাল হইতে জমিদার-বাড়িতে গান-বাজনা ও খাওয়া-দাওয়ার খুব আয়োজন হইতে লাগিল। সাধু বাঙালীবাবুর বেশে মজলিশ জমাইয়া বসিয়া গান গাহিয়া সকলের মনোরঞ্জন কবিল।

সন্ধ্যার কিছু পরে সাধু শঙ্করবাবুকে বলিল, "দেখুন, এই সময় আমার স্নান করা অভ্যাস, আমি কাছের পুকুর থেকে স্নান ক'রে আসি।"

এই বলিয়া সে পুকুরের দিকে চলিয়া গেল। তখন আর তাহার উপর নজর রাখিবার আবশ্যকতা কাহারও মনে হইল না।

পুকুরের দিকে কিছুদুর গিয়া সাধু অন্য এক পথ ধরিয়া যে বাড়িতে কেশব রায় আছে সেখানে উপস্থিত হইল। লছমীকে ডাকিয়া তাহাকে চুপি চুপি কি বলিয়া উভয়ে কেশবের ঘরে ঢুকিল ও তৎক্ষণাৎ কেশবের মুখ ও হাত বাঁধিয়া ফেলিয়া বলিল, "দেখ কেশব রায়, তুমি নিঃশব্দে আমাদের সঙ্গে চল। যদি আপত্তি কর কিংবা পালাবার চেষ্টা কর, তা হ'লে এক গুলিতে তোমার মাথা গুঁড়িয়ে দেব।" তারপর লছমী সমস্ত জিনিসপত্র একত্র করিয়া বাঁধিয়া লইল ও তিনজনে বাটির বাহির হইল।

অতি দ্রুতপদে তাহারা জঙ্গলে গিয়া ঢুকিল ও প্রায় তিন-চার মাইল একরকম ছুটিয়াই চলিল। অন্ধকারে জঙ্গলের পথে এরূপে চলা যে কিরূপ বিপদজনক তাহা বলাই বাহুল্য, কিন্তু তাহারা অমিতসাহসে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, প্রায় পনরো মাইল হাঁটিয়া শেষ রাত্রে পুলিস-সাহেবের তাঁবুতে কেশব রায়কে লইয়া উপস্থিত হইল।

ভূগর্ভস্থ কয়লার স্বত্বাধিকার লইয়া জয়রামপুরের রাজা ও পত্তনিদারদের মধ্যে যে সব মকদ্দমা চলিতেছিল তাহাতে পত্তনি-দাররা জাল দলিল ব্যবহার করিতেছিল তাহা সকলেই বুঝিয়াছিল; কিন্তু কোথায় কি ভাবে জাল হইতেছে তাহা ধরিবার জন্য পুলিস-সাহেব প্রায় তিন মাস ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। শ্রীরামবাবুর নিকট সমস্ত শুনিয়া তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে দায়রার বিচারে কেশবের ও তাহাব সাহায্যকারী কয়েকজন পত্তনিদারের জেল হইল।

আর-জন্মের মা

প্রথম চিত্র

"মা, আমায় রক্ষা কর।"—এই বলিয়া এক সুন্দরকান্তি সুবেশধারী যুবক শক্তিগড়ের মোক্ষদা গোয়ালিনীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। মোক্ষদা সেই মাত্র ভাত খাইয়া ভুক্তাবশেষ কুকুরকে দিবার জন্য সদর-দরজাটি খুলিয়া বাহির হইয়াছে, অমনি এই ঘটনা। সে চমকিয়া উঠিয়া পিছাইয়া গেল ও আকস্মিক বিস্ময়ে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। যুবক কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া গড়াইতে গড়াইতে গিয়া তাহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল ও যন্ত্রণাসূচক আর্তনাদ করিতে করিতে আবার বলিল, "মা, আমায় রক্ষা কর।"

মোক্ষদার সংসারে সে আর তাহার পিসী রাইমণি। উভয়েই বিধবা, সুতরাং নিশ্চিন্ত। মোক্ষদার পিতা যাদব ঘোষ শক্তিগড়ের গোয়ালা-সমাজের একজন প্রধান লোক ছিল ও পৈতৃক জমি-জায়গা ছাড়া কিছু নগদ টাকাও রাখিয়া গিয়াছিল বলিয়া সকলের বিশ্বাস। যাদব ঘোষের মৃত্যুর পর রাইমণি আসিয়া বালবিধবা মোক্ষদার ইহকাল-পরকালের ভার লইল, ও পাকা মাঝির ন্যায় শক্ত করিয়া হাল ধরিয়া তাহাকে জীবনের 'কালবৈশাখী'টা পার করিয়া দিল। এখন সুশৃঙ্খলে উভয়ের দিন কাটিতেছে। জমির ধানেই খরচপত্র সব চলিয়া যায়, এবং দুধ ও ঘুঁটে বিক্রির টাকাটা জমে; তা ছাড়া তেজারতিও কিছু কিছু আছে। সম্প্রতি মোক্ষদা ঝোঁক ধরিয়াছে যে, তীর্থ দর্শন করিতে যাইবে; কিন্তু উপযুক্ত সঙ্গীর অভাবে যাওয়া হইয়া উঠিতেছে না।

রাইমণি হাত-মুখ ধুইয়া হামানদিস্তায় পান ছেঁচিতেছিল ও গত রাত্রে গোঁসাই-বাড়িতে কথক ঠাকুর যে বৈরাগ্যবাদ বুঝাইয়াছিলেন মনে মনে তাহার আলোচনা করিতেছিল। অতএব যুবকের আর্তনাদ প্রথমটা তাহার কানে ঢুকিল না; কিন্তু সে যখন পুনরায় 'মা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল তখন তাহার ধ্যান ভাঙিল ও "আরে ম'ল, এই দুপুরবেলাতেও আবার ভিখেরী" ইত্যাদি বলিতে বলিতে মোক্ষদাকে ভিক্ষুকের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইল।

পিসীকে আসিতে দেখিয়া মোক্ষদার হৃদ্‌পিণ্ড কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল, কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। রাইমণির অগাধ সাহস, কেননা ভয় ও ভালবাসা এই দুইটা জিনিস সে ছত্রিশ বৎসর পূর্বে স্বামীর চিতায় জ্বালাইয়া দিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া তাহারও হৃদয় ক্ষণকালের জন্য কম্পিত হইল। এ তো ভিখারী নয়! তবে এ কে? কোন দেবতা কি অপদেবতা নয়তো? এ দৃশ্য তাহার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বাহিরে, সুতরাং কিছুই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিল না। অপদেবতার চিন্তাটা উঠিবামাত্র বুকটা একটু ঢিপঢিপ করিয়া উঠিল, কিন্তু সে ক্ষণিকমাত্র। মনে মনে তিনবার রামনাম জপ করিয়া সে আরও একটু অগ্রসর হইল ও যুবকের আপাদমস্তক স্থিরদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, "কে গা তুমি? অজানা অচেনা লোক এই ভর্তি দুপুরবেলায় ভদ্রলোকের বাড়ির দরজায় এসে মেয়েছেলের পা ধ'রে টানাটানি করছ?"

যুবক তাহার কোন উত্তর না দিয়া পুনরায় মোক্ষদার মুখের পানে কাতর নয়নে চাহিয়া বলিল, "মা, আমায় রক্ষা কর।" মাতৃসম্বোধনের প্রবল আকর্ষণী শক্তি সন্তানহীনা মোক্ষদার হৃদয় স্পর্শ করিল।

সস্নেহনয়নে যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "ওঠো বাবা, ওঠো। কি হয়েছে তোমার বল।"

রাইমণির কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। সে মোক্ষদাকে অল্প একটু ধমক দিয়া বলিল, "থাম্ তুই মোক্ষ, আমি একবার ও-বাড়ির রামধনদাদাকে ডাকি।"

সেই সময় যুবক আবার মোক্ষদার মুখের পানে সজল নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া যুক্তহস্তে তেমনি যন্ত্রণাসূচক স্বরে বলিল, "মা, আমায় রক্ষা কর।"

মোক্ষদা জীবনে কখনও পিসীর অবাধ্য হয় নাই, কিন্তু আজ তাহার মন বিদ্রোহী হইল। একবার যুবকের দিকে ও পরক্ষণেই পিসীর দিকে চাহিয়া সে বলিল, "কি তুমি বলছ পিসী? ভদ্রলোকের ছেলেটি এই দুপুর-রোদে মাটিতে প'ড়ে ছটফট করছে, আর এই সময় তুমি লোক ডাকতে যাবে? না বাবা, তুমি উঠে বাড়ির ভেতর গিয়ে বসবে চল, আমি এক্ষুণি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি। যাও পিসী, তুমি ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও।"

তখন যুবক মোক্ষদার পা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল ও সজলনয়নে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "মা, তুমি হাত ধুয়ে এলে তো আমার কোন কাজ হবে না। আমি যে আশায় এসেছি সবই তো বিফল হবে।"

কথাটা মোক্ষদা ভাল বুঝিতে পারিল না। সে অবাক হইয়া যুবকের মুখের দিকে চাহিল। রাইমণিও দেখিল যে রহস্য ক্রমে জটিল হইয়া উঠিতেছে। তখন তাহার মনে হইল, আচ্ছা, দেখাই যাক, আসল কথাটা কি! বাঘ-ভালুক তো নয় যে খেয়ে ফেলবে? এই ভাবিয়া সে বলিল, "চল বাপু, তাই বাড়ির ভেতরেই চল; তোমার ব্যাপারটা কি সব ভেঙে-চুরে বলবে চল।"

বাড়ির ভিতর গিয়া মোক্ষদা যুবককে বসিবার জন্য আসন পাতিয়া দিল, কিন্তু সে তাহাতে না বসিয়া মাটিতেই বসিয়া পড়িল ও মোক্ষদার পদধূলি লইয়া মাথায় দিয়াই বলিল, "মা, তোমার চরণ স্পর্শ ক'রেই আমার রোগ অর্ধেক সেরে গেছে।"

মোক্ষদা বলিল. "কি রোগ বাবা তোমার ?"

যুবক বলিল, "তবে শুনুন মা, আমার নাম হরেন্দ্র নাথ মুখুজ্জে। আমি নারায়ণপুরেব জমিদার কানাই মুখুজ্জেব ছেলে।"

রাইমণি বিকট নয়নে যুবকের প্রতি বিরক্তিব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিয়া বলিল, "অ্যাঁ! তুমি বামুনের ছেলে! এই বোশেথ মাসে আমার মোকুব পায়েব ধুলো নিয়ে তাব অকল্যাণ করলে!"

যুবক কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল, "আগে আমার কথাটা সব শুনুন। তাবপর ভাল করেছি কি মন্দ করেছি, তার বিচার করবেন।"

মোক্ষদা বলিল, "বল বাবা, বল।"

"আজ সাত বৎসব আমাব অম্বলশূলের ব্যারাম হয়েছে। যখন ব্যথা ওঠে তখন আর দিগ্বিদিক্‌জ্ঞান থাকে না; মনে হয় যেন আত্মহত্যা করি। আমাব পয়সার অভাব নেই, ডাক্তার কবরেজ হোমিওপ্যাথি কিছুই বাকি রাখি নি। হাজার হাজার টাকা খরচ করেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। রোগের যন্ত্রণায় ডাক্তারকে এমন পর্যন্ত বলেছি যে, ডাক্তারবাবু, আপনাকে আমি দশ হাজার টাকা দোব, আপনি ওষুধের সঙ্গে একটু বিষ মিশিয়ে দিন।"

শুনিতে শুনিতে রাইমণির চিরকঠোর বদনমণ্ডল ক্রমশ কোমল হইয়া আসিতে লাগিল। বলিল, "বালাই, ষাট! তা কি করতে আছে? আত্মহত্যা মহাপাপ।"

যুবক বলিল, "দিদিমা, কি আর বলব আপনাকে! যে রোগের যন্ত্রণা তাতে আর পাপপুণ্য কিছুই জ্ঞান থাকে না। শুনুন তারপর। যখন ওষুধপত্রে কিছুই হ'ল না, তখন আমার স্ত্রী আমাকে না জানিয়ে আমাদের গুরুঠাকুরকে আনালে। তিনি বেশ কুষ্ঠি দেখতে পারেন। আমার কুষ্ঠি দেখে তিনি বললেন যে, রাহুর অন্তর্দশা চলছে, এর পর রোগের শান্তি হবে; কিন্তু চিকিৎসাপত্রে কোন ফল হবে না, দৈব করতে হবে। সেই শুনে আমার স্ত্রী বললে যে, চল, তারকেশ্বর গিয়ে বাবার কাছে হত্যে দেওয়া যাক।"

রাইমণি তৎক্ষণাৎ যুক্তকর মস্তকে ঠেকাইয়া বলিল, "বাবা তারকেশ্বর, সাক্ষাৎ জাগ্রত দেবতা।"

যুবক বলিল, "শুনুন তারপর। আমি তারকেশ্বরে গিয়ে সাত দিন সাত রাত বাবার স্থানে হত্যে দিয়ে প'ড়ে রইলুম। এই সাত দিন শুধু একটু গঙ্গাজল খেয়ে থাকতুম, কিন্তু ক্ষিদে-তেষ্টা কিছুই ছিল না।"

রাইমণি পুনরায় বাবা তাবকেশ্বরকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিল, "বাবার মাহিত্যি।"

যুবক বলিল, "সাত দিনের শেষরাত্রে স্বপ্ন হ'ল। মনে হ'ল একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন—'তুই মহাপাপী, তাই তোর এই কঠিন রোগ হয়েছে। আর-জন্মে তুই রাগের ঝোঁকে তোর মার মাথায় লাঠি মেরে মাতৃহত্যা করেছিস। এ জন্মে তোর সেই মহাপাপের ফলভোগ হচ্ছে।' আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল,—এই দেখুন,—বলতে বলতে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। আমি জোড় হাত ক'রে বললুম—'বাবা, আমি মহাপাপী, আমার গতি কি হবে?' ব্রাহ্মণ বললেন—'আর-জন্মে তোর কিছু সুকৃতিত্ব ছিল, তাই তুই এ জন্মে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মেছিস, আর তোর রোগ থেকে মুক্তিও হবে।'

আমি বললুম—'কেমন ক'রে হবে বাবা?' ব্রাহ্মণ বললেন—'তোর মা শক্তিগড়ে যাদব ঘোষের বাড়িতে তার কন্যারূপে আবার জন্ম নিয়েছে; তুই গিয়ে তাব পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে এই সমস্ত কথা ব'লে তার উচ্ছিষ্ট অন্ন খেলেই তোব রোগ সেরে যাবে।'"

রাইমণি অবাক হইয়া শুনিতেছিল ও তাহার মন ক্রমশ যুবকের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্ষণেব কথা বলিতেই সে একেবারে গর্জিয়া উঠিল, বলিল, "বলছ কি তুমি বাপু! এই বোশেখ মাসেব দিনে বামুনকে এঁটো ভাত খাওয়ালে যে আমাদের সাত পুরুষ নরকে যাবে। ও কিছুতেই হতে পারে না। একে তো পায়ের ধুলো নিয়ে অকল্যাণ করেছ, তার ওপব আবাব এ এঁটো খাওয়া! আমি কিছুতেই মোক্ষদাকে তা করতে দোব না।"

যুবক ধীব প্রশান্ত নয়নে রাইমণির দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি ভুল কবছেন দিদিমা। উনি যে আমার মা। আমাদের ঠাকুর মশাই বলেন যে, মা ও ছেলের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা জন্ম-জন্মান্তবেও থাকে।"

রাইমণি কিন্তু সহজে রাজী হইবাব পাত্রী নয়। বলিল, "তা তো সব বুঝি বাপু। আব-জন্মে যে কে কি ছিল তা তো আর দেখতে পাচ্ছি না,—এখন এ জন্মে চোখের সামনে সব দেখে-শুনে কেমন ক'রে ভর্তি বোশেখ মাসে মহাপাপ করা যায়?"

যুবক বলিল, "এতে কিছুই পাপ নেই দিদিমা। বাবা তারকেশ্বরের আদেশ। বরং দেবতার আদেশ লঙ্ঘন করলে মহাপাপ।"

রাইমণি ভাবিল, তাও তো বটে; কিন্তু এত বড় একটা সমস্যা মীমাংসার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে নিজের ঘাড়ে না লইয়া পুনরায় রামধন-দাদাকে ডাকিবার প্রস্তাব করিল। তখন মোক্ষদা বলিল, "থাক্ পিসী,

আর লোক ডাকাডাকিতে কাজ নেই। ও যখন আমাকে 'মা' ব'লে ডেকেছে, তখন ওর জন্যে আমি সবই করব। যদি আমার এঁটো ভাত খেলে ওর ব্যারাম ভাল হয়, আর তার জন্যে যদি আমাকে সাত জন্ম নরকে পচতে হয় আমি তাতেও রাজী।" এই বলিয়া সে গিন্নীর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া যুবককে বলিল "বাবা, তুমি ঐ ঘটির জলে হাত-মুখ ধুয়ে নাও, আমি তোমাকে ভাত দিচ্ছি।"

যুবক মোক্ষদার উচ্ছিষ্ট অন্ন অতি ভক্তিভরে মাথায় ঠেকাইয়া ও উদ্দেশে বাবা তারকেশ্বরকে প্রণাম করিয়া মুখে ফেলিয়া দিল ও খাইতে খাইতে বলিল, "মা, এ তোমার প্রসাদ খাচ্ছি কি অমৃত খাচ্ছি, তা বলতে পারি না। আমার সমস্ত দেহ যেন জুড়িয়ে গেল। ওঃ, দেবতার কি দয়া! আমার মনে হচ্ছে যে, কখনও যেন রোগ ছিল না।"

রাইমণির শরীরে তখন রোমাঞ্চ হইতেছে। সে বলিল, "বাবা তারকেশ্বরের মাহিতি।" এই বলিয়া তিন জনই ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই পাড়ায় প্রচার হইল যে, কোথা হইতে এক রাজপুত্র আসিয়া মোক্ষদাকে 'মা' ডাকিয়াছে। ক্রমশ আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী অনেকেই রাজপুত্রকে দেখিতে আসিল ও তাহার ব্যবহারে ও সদালাপে সন্তুষ্ট হইয়া "মোক্ষদার ভাগ্যি ভাল, নইলে এমন রাজার ছেলে জোটে" ইত্যাদি আলোচনা করিতে করিতে ফিরিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর যুবক রাইমণি ও মোক্ষদাকে বিস্তারিতভাবে আপনার পরিচয়াদি দিল। "আমাদের সাত পুরুষের জমিদারি, তা ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রায় একখানা গ্রাম জুড়ে বাড়ি, কাছারি, ঠাকুর-বাড়ি, অতিথিশালা, ডাক্তারখানা ইত্যাদি। বাপ-পিতামহের আমল থেকে

এত টাকা জমেছে যে টাকায় ছাতা ধ'রে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে বার ক'রে রোদে দিতে হয়।"

এই সব গল্প শুনিতে শুনিতে পিসী ভাইঝি অবাক হইয়া গেল। যুবক বলিল, "মা, তোমাকে এই ভাঙা ঘরে এত কষ্টে আমি আর থাকতে দোব না। তোমরা দুজনে আমার বাড়িতে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে গৌরগোপালের মন্দিরে ব'সে হরিনাম করবে, আর আমার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আমোদ করবে। আসছে শীতে তোমাদের সব তীর্থস্থান দেখিয়ে নিয়ে আসব।"

তীর্থদর্শনের কথায় উভয়েই বড় প্রীত হইল। যুবক বলিল, "তোমাদের কোন কষ্ট হবে না। প্রায় সমস্ত বড় বড় তীর্থস্থানেই আমাদের বাড়ি আছে।"

পরদিন প্রাতঃকালে যুবক মোক্ষদাকে বলিল, "মা, তোমার বউকে আমি তারকেশ্বরে রেখে এসেছি। তার কাছে চাকর-বাকর ছাড়া পুরুষ মানুষ আর কেউ নেই। আমাকে আজই যেতে হবে।"

মোক্ষদা প্রথমে খুবই আপত্তি করিল। বলিল, "এত কষ্ট ক'রে এসেছ বাবা, দুদিন এখানে থাক।"

কিন্তু যুবক কিছুতেই সম্মত হইল না। বলিল, "মা, তুমি আমার প্রাণদান করেছ, তাই তোমাকে ছেড়ে যেতে বড়ই কষ্ট হবে। কিন্তু উপায় নেই মা। মা-বেটায় এখন কিছুদিনের জন্যে ছাড়াছাড়ি হবেই। তবে যদি তোমার কোন কষ্ট না হয়, তা হ'লে আমার সঙ্গে তারকেশ্বর পর্যন্ত যেতে পার। সেখানে ঠাকুর দেখিয়ে, হয় তোমাকে আমিই আবার এসে এখানে রেখে যাব, না হয় আমার কোন লোকের সঙ্গে পাঠিয়ে দেব।"

মোক্ষদা কখনও তারকেশ্বর যায় নাই, তাই এ লোভ সংবরণ করিতে

পারিল না। বলিল, "বেশ তো বাবা, যদি তোমার কল্যাণে বাবার স্থানে একবার যেতে পারি তো মন্দ কি?"

যুবক বলিল, "আমার বড় ভাগ্য মা, যে, আর দুদিন তোমার পায়ের ধূলা নিতে পারব। তোমার বউও আমাকে অনেক ক'রে ব'লে দিয়েছে—'যদি মার দেখা পাও, আর তোমার ব্যারাম সেরে যায়, তা হ'লে তাঁকে সঙ্গে ক'রে বাবার স্থানে নিয়ে আসবে। আমরা একসঙ্গে বাবার পুজো দেব।' তাবপর মাতাপুত্রে পরামর্শ কবিয়া সেই দিনই বৈকালের গাড়িতে রওনা হইতে হইবে—এই স্থির হইল।

রান্নাঘরে গিয়া মোক্ষদা বাইমণির কাছে কথাটা তুলিল; কিন্তু সে কিছুতেই সম্মতি দিল না। বলিল, "মা-ই বলুক আর মাসীই বলুক, যতক্ষণ আমার চোখের সামনে আছ ততক্ষণ যা করবে তাতে কিছুই বলব না। কিন্তু তোমাকে আমি চোখের আড়ালে যেতে দোব না।"

মোক্ষদা অনেক করিয়া বুঝাইল, কিন্তু রাইমণির সেই এক কথা। মোক্ষদা তাহাকেও যাইতে বলিল, কিন্তু দুইজনে গেলে ঘর দোর, গরু বাছুর, দেখে কে? শেষে অনেক অনুনয়-বিনয়েব পব রাইমণি এই শর্তে রাজী হইল যে, মোক্ষদা সেই দিন বৈকালেব গাড়িতে গিয়া পরদিন প্রাতঃকালে দেবতা দর্শন করিয়া সন্ধ্যার মধ্যেই ফিবিয়া আসিবে ও তাহার জ্ঞাতি-সম্পর্কে ভাই তাবাচবণ তাহার সঙ্গে যাইবে।

বৈকালবেলায় যুবক তারাচরণকে গিয়া বলিল, "মামা, কিছু তাড়াতাড়ি ক'রো না। এখনও তো ট্রেনের ঢের দেরি!" তারপর সে মোক্ষদার বাড়িতে আসিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া স্টেশনের দিকে রওনা হইল। রাইমণির ইচ্ছা যে তাহাদের বাড়ি হইতেই তারাচরণ মোক্ষদার সঙ্গে যায়, এবং সেই জন্য একটু আপত্তি করিবাব চেষ্টা

করিল। কিন্তু যুবক বলিল, "মামা কাপড় পরছে। বললে, 'যাচ্ছি, তোমরা এগিয়ে চল, আমি রাস্তায় তোমাদের ধরব।'"

স্টেশনে আসিবামাত্র গাড়ি আসিয়া পড়িল। তখনও পর্যন্ত তারাচরণ আসিয়া পৌছে নাই। কিন্তু তাহাকে সঙ্গে লইতে হইলে সে দিন আর যাওয়া হয় না।

যুবক ম্লান মুখে বলিল, "মা, কি করা যাবে?"

মোক্ষদা বলিল, "যখন যাত্রা ক'রে বেরিয়েছি তখন আর ফিরব না। চল বাবা, তোমার সঙ্গেই যাই। তারাচরণ নাই বা গেল।"

একটা খালি ইণ্টারমিডিয়েট গাড়িতে মাতা ও পুত্র উঠিল। যুবকের সাগ্রহ যত্নে ও মধুর বাক্যালাপে মোক্ষদা বড়ই প্রীত হইল ও তাহার মনে হইতে লাগিল যে, তাহার ছেলে থাকিলে সেও বুঝি এমন যত্ন কবিয়া তাহাকে লইয়া যাইতে পারিত না।

যাইতে যাইতে যুবক কি যেন একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "মা, বাড়ি থেকে বেরুবার আগে একটা বড় ভুল হয়ে গেছে।"

মোক্ষদা বলিল, "কি বাবা?"

যুবক বলিল, "তুমি যদি কিছু মনে না কর, তা হ'লে তোমায় সেটা বলি।"

"না, না, বল না, মনে আবাব কি করব?"

তারপর হাসিয়া বলিল, "তোমার মত ছেলের কথায় মা কি কিছু মনে করতে পারে?"

যুবক বলিল, "তারকেশ্বরে তোমার বউ ও আমাদের বাড়ির আরও দু-চার জন স্ত্রীলোক আছে। তুমি তো জান ব্রাহ্মণের বিধবারা কোন গয়না পরে না। তোমার গায়ে এই তাগা আর হার দেখলে আমার আত্মীয়েরা কোন অপ্রিয় কথা বলতে পারে। তোমার কিংবা

আমার সামনে কিছু বলুক আর না বলুক, অন্তত অসাক্ষাতেও বলতে পারে। তুমি আমার মা, তাই সে রকম কিছু একটা কথা উঠলে আমার ও তোমাব বউয়ের মনে কষ্ট হবে।”

মোক্ষদা বলিল, “তাই তো বাবা! এটা তো আমার মনে হয় নি। আগে বললে এগুলো খুলে বেখে আসতুম।”

“তাই বলছিলুম মা, আমাবও আগে মনে হয় নি।”

“তা হ’লে এখন কি করা যায়?”

“যদি তোমার আপত্তি না থাকে তা হ’লে ওগুলো খুলে তোমার কাছে বেখে দাও, তারপর যাবার সময় আবার প’বে নেবে।”

“আচ্ছা বাবা, তাই খুলছি; কিন্তু আমার কাছে আর কোথায় রাখব? তুমি রেখে দাও।”

এই বলিযা মোক্ষদা হার খুলিযা যুবককে দিল। তাগা জোড়াটা সহজে খুলিতে পারিল না, কাবণ সম্প্রতি মোক্ষদা নিজেব অজ্ঞাতসাবে একটু মোটা হইতে আরম্ভ কবিয়াছিল। তখন যুবক নিজের পকেট হইতে একখানা সাবান বাহির করিয়া মোক্ষদাকে দিল ও বলিল, “ঐ ঘটির জল দিয়ে সাবান লাগালেই খুলে আসবে।”

সেইরূপ করিতেই তাগা খোলা গেল। যুবক হার ও তাগা অতি যত্নের সহিত নিজের রুমালে বাঁধিয়া বুক-পকেটে রাখিল ও অন্য পকেট হইতে একটি সেফ্‌টিপিন বাহির করিয়া তাহা দিয়া বুক-পকেটের মুখ বন্ধ করিল। যুবকের সাবধানতা দেখিয়া মোক্ষদা বড়ই সন্তুষ্ট হইল। ভাবিল, বড়লোকের ছেলে; অনেক টাকা-পয়সা সোনা-দানা নাড়া-চাড়া করে, তাই এত হুঁশিয়ার।”

গাড়ি পাওয়ায় আসিয়া পৌছিলে যুবক বলিল, “মা, ঐ দেখ

পেঁড়োর মসজিদ। এত বড় মসজিদ বাংলা দেশে আর নেই। কত কালের গাঁথনি, কিন্তু এখন পর্যন্ত কেমন শক্ত আছে।”

মোক্ষদা একদৃষ্টে মসজিদ দেখিতে লাগিল। এই অবসরে যুবক বলিল, “ঘটির জল সব ফুরিয়ে গেছে দেখছি। এখানে গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়ায়,—জল নিয়ে আসি।”

এই বলিয়া সে ঘটি লইয়া গাড়ি হইতে নামিয়া প্ল্যাটফরমের প্রান্তের দিকে চলিয়া গেল। মোক্ষদা মসজিদের পানে একমনে চাহিয়া আছে, অতএব যুবকের ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে ইহা তাহার মনে হইল না। যখন গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা হইল তখন তাহার চমক ভাঙিল ও গাড়ির জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া প্ল্যাটফরমের যত দূর দেখা যায় দেখিল, কিন্তু তাহার মধ্যে যুবককে দেখিতে পাইল না। সেই সময় গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

ভয়ে মোক্ষদার মুখ শুকাইয়া গেল, ও একবার তাহার মনে হইল যে গাড়ি হইতে নামিয়া পড়ে; কিন্তু কি করিবে তাহা ঠিক করিতে না করিতেই গাড়ি বেশ জোরে চলিতে আরম্ভ করিল। যতক্ষণ প্ল্যাটফরমের পাশ দিয়া চলিল, ততক্ষণ সে উদগ্রীব হইয়া প্ল্যাটফরমের দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু যুবকের কোন নিদর্শন পাইল না।

ভয়ে ও ভাবনায় মোক্ষদার চোখে জল আসিল। একবার তাহার সন্দেহ হইল যে বোধ হয় যুবক তাহার গহনাগুলি লইয়া চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু পরক্ষণেই যুবকের আকৃতি, পরিচ্ছদ, ব্যবহার, বাক্যালাপ ইত্যাদি মনে করিয়া সে ভাবিল যে তাহা অসম্ভব। ভদ্রসন্তান, বড়লোকের ছেলে, তাহাকে ‘মা’ বলিয়াছে,—সে কি কখনও এমন কাজ করিতে পারে? বোধ হয় স্টেশনের মধ্যে জল পায় নাই, তাই বাহিরে সে জল আনিতে গিয়াছিল, ইতিমধ্যে গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে,

তাই এ পর্যন্ত আসিয়া পৌছিতে পারে নাই ; নিশ্চয় অন্য কোন গাড়িতে উঠিয়া পড়িয়াছে—এই ভাবিয়া সে কতকটা আশ্বস্ত হইল।

মগরা স্টেশনে মোক্ষদা গাড়ি হইতে নামিল, কারণ সে জানিত যে মগরাতে গাড়ি বদল করিতে হইবে। অনেক আশা করিয়া সে প্ল্যাটফরমের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অনুসন্ধান করিল ; কিন্তু যুবকের কোনও উদ্দেশ পাইল না।

কয়েকটি ভদ্রলোক মোক্ষদার গতিবিধি ও মুখেব ভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহাবা বুঝিতে পারিলেন যে, সে কোন বিপদে পড়িয়াছে। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেই সে কাঁদিয়া ফেলিল ও যাহা ঘটিয়াছে সংক্ষেপে বলিল। তাঁহাবা তাহাকে স্টেশন-মাস্টারের নিকট লইযা গিয়া সমস্ত বলিলেন। প্রকৃত ব্যাপার কি তাহা বুঝিতে কাহাবও বিলম্ব হইল না।

তাঁহাদেব মধ্যে একজন মোক্ষদাকে বলিলেন, "মা, তুমি একজন অজানা লোকের সঙ্গে এসে ভাল কাজ কর নেই। সে তোমার গয়নাগুলি নিয়ে পালিয়েছে। তুমি বাড়ি ফিরে যাও।"

প্রথমে মোক্ষদার ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না ; কিন্তু যখন সকলেই সেই সিদ্ধান্ত করিল ও স্টেশন-মাস্টারবাবু বলিলেন যে, তিনি এরূপ ঘটনা আরও দু-একটা শুনিয়াছেন, তখন মোক্ষদাব মুখ শুকাইয়া গেল ও ক্রমশ সে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিল।

তবে কি সত্য সত্যই আমার গহনাগুলি গেল ?—এই ভাবিয়া তাহার নয়নে অশ্রুধারা ছুটিল ও সেই সঙ্গে পিসীব রণরঙ্গিণী মূর্তি তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল।

স্টেশন-মাস্টারবাবু পুলিসে খবর দিলেন।

* * *

প্রায় এক সপ্তাহ পবে মগবার দাবোগাবাবু কয়েকখানি ফোটোগ্রাফ লইযা মোক্ষদার বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। ফোটোগ্রাফগুলি দেখিতে দেখিতে মোক্ষদা একখানিব দিকে চাহিয়াই চমকিয়া উঠিল ও "এই সে" ইহা বলিবাব সময় অজ্ঞাতসাবে তাহার মুখে একটা বেদনার বেথা ফুটিযা উঠিল ; কাবণ সে তাহাকে 'মা' বলিযাছিল। বাইমণি ফোটো দেখিযাই গর্জিযা উঠিল। বলিল, "ভদ্রলোকেব ছেলের এই কাজ !"

আর-জন্মের মা

দ্বিতীয় চিত্র*

আশ্বিন মাস। বিশাল পদ্মা 'দেবী চৌধুরাণী'র ত্রিস্রোতার মত বর্ষাব জলপ্লাবনে কূলে কূলে পুবিয়াছে। নবমীর চাঁদ সেই বিস্তৃত নদীবক্ষে রজতধারা ঢালিয়া এখন পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছে। সব নিস্তব্ধ,—কেবল ধীরসমীরপ্রতিহত তরঙ্গের মৃদু কুলুকুলু রব, আর মধ্যে মধ্যে কোন এক কান্তাবিরহ-চিন্তাক্লিষ্ট তন্দ্রালস হিন্দুস্থানী মাল্লাব রাধা-কিষণজীঘটিত প্রেমগীতির প্রথম চরণ আবৃত্তির ঈষৎ উদ্যম।

তারপাশা স্টেশনের অনতিদূরে এক ঘাটে দুইখানি বজবা বাঁধা। কলিকাতা হইতে এক বায়োস্কোপ কোম্পানিব 'বড়বাবু' অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ সহ 'দেবী চৌধুরাণী'র নদীবক্ষের ঘটনাবলীর চিত্র লইবাব জন্য আসিয়াছেন। একখানি বজরায় পুরুষরা ও অন্যটিতে স্ত্রীলোকবা আছেন। সকলেই গভীর নিদ্রামগ্ন, কেবল বডবাবু এখনও পর্যন্ত ছাদেব উপর বসিয়া যেন দূরে কি লক্ষ্য করিতেছেন। শরতের নির্মল আকাশতলে সেই ক্ষীণ জ্যোৎস্নাবিধৌত শান্ত প্রকৃতির অর্ধস্ফুট শোভা নীরন্ধ্র নিশীথে বড়ই সুন্দর; কিন্তু তিনি সেরূপ সৌন্দর্য অনেক দেখিয়াছেন, সুতরাং তাহার জন্য রাত্রিজাগরণ তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক। মুখে বিশেষ উদ্বেগের চিহ্ন ও মধ্যে মধ্যে উৎকণ্ঠাব্যঞ্জক অঙ্গসঞ্চালন।

সেই নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া অকস্মাৎ নদীবক্ষে এক অত্যুচ্চ

---

* এই গল্পে বর্ণিত 'বড়বাবু' আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু। তাঁহারই নিকট আমি এই ঘটনার কথা শুনিয়াছিলাম—লেখক।

হরিধ্বনি উঠিল। মনে হইল, যেন শতকণ্ঠের এককালীন নিনাদ। বড়-বাবুর ঈষৎ তন্দ্রার আবেশ হইতেছিল; সেই শব্দে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইয়া উঠিল ও অতি ব্যস্তভাবে ছাদের প্রান্তে গিয়া তিনি শব্দের স্থান লক্ষ্য করিলেন। চাঁদের কিরণ ম্লান হইয়া আসিযাছে, দূরেব জিনিস ভাল দেখা যায় না; কিন্তু যতটুকু দেখা যায় তাহাতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, একখানা লম্বা নৌকা আসিতেছে।

দেখিতে দেখিতে নৌকা ক্রমশ নিকটবর্তী হইতে লাগিল, এবং অল্পক্ষণ পরেই বেশ বুঝিতে পারা গেল যে সেটা একখানা বড় ছিপ-নৌকা। আজ সমস্ত দিন ধরিয়া বড়বাবু ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কারণ রঙ্গবাজের ছিপের ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য মাদারীপুব হইতে এই ছিপের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল ও তাহাদের পূর্বরাত্রে আসিয়া পৌঁছিবাব কথা ছিল। যখন আজ অপবাহ্ণেও আসিয়া পৌঁছিল না, তখন তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন ও আশঙ্কা কবিতেছিলেন যে বোধ হয় পথে কোন দুর্ঘটনা হইয়াছে। দায়িত্ব তাঁহার, অতএব উৎকণ্ঠাও তাঁহার। অন্য সকলে দৈনিক বেতনে আসিয়াছে, সুতরাং যত দিন যাইবে ততই তাহাদের লাভ।

দেখিতে দেখিতে নৌকা আবও অগ্রসর হইল। তখন বড়বাবু নির্দিষ্ট সঙ্কেতরূপে তাঁহার বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়া নৌকার দিকে ধরিলেন। সেই আলো লক্ষ্য করিযাই নৌকারোহীগণ আর একবার হরিধ্বনি করিয়া উঠিল ও অবিলম্বে ঘাটে আসিয়া নৌকা লাগাইল।

প্রকাণ্ড ছিপ, প্রায় সত্তর হাত লম্বা; তাহার মধ্যে শতাধিক বলিষ্ঠগঠন লোক দুই সারি হইয়া বসিয়াছে। প্রায় সকলেরই হাতে এক-একখানি ছোট বোটে ও মাঝে মাঝে দুই-একজনের নিকট সড়কি

ও বেতের ঢাল কিংবা বাদ্যযন্ত্র। প্রধান মাঝি রাধানাথ হালদার তাহার শালপ্রাংশু বপু লইয়া মহাভুজে সেই দীর্ঘ তরণীর বৃহৎ হাল ধরিয়া দণ্ডায়মান। বড়বাবু পশ্চিম-বঙ্গের লোক; এরূপ দৃশ্য জীবনে কখনও দেখেন নাই, কেবল 'দেবী চৌধুরাণী'তে পড়িয়া কতক কতক অনুমান করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন ও গৌরবে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

ছিপের নঙ্গর ফেলিয়া ও রশি দিয়া খুঁটার সঙ্গে শক্ত করিয়া বাঁধিবার বন্দোবস্ত করিয়া রাধানাথ বড়বাবুর নৌকায় আসিল। সে জানিত, বড়বাবু ব্রাহ্মণ; তাই অতি ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। এত দেরি হওয়ায় বড়বাবু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ও মাঝিকে শক্ত শক্ত দুই-চার কথা শুনাইয়া দিবেন মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু রাধানাথ তাহার সুযোগ দিল না। নিজেই জোড়হাত করিয়া অতি বিনীতভাবে বলিল, "বাবু আমাদের দেরি দেখে আপনি বোধ হয় খুবই রাগ করেছেন!"

তাহার সেই তেজস্বী দেহের বিনয় বড়বাবুর হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি বলিলেন, "না, রাগ এমন কিছু নয়; তবে তোমাদের গত রাত্রে এসে পৌঁছবার কথা ছিল; এত দেরি দেখে আমি বড্ডই উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম আর ভাবছিলাম যে তোমরা বোধ হয় আসবে না।"

রাধানাথ হাত জোড় করিয়াই বলিল, "বাবু, যখন বায়না নিয়েছি তখন প্রাণ গেলেও কথার খেলাপ করব না। কিন্তু দোষ সমস্তই আমার, আর এই দেরির জন্যে আমিই দায়ী।"

"কেন? কি হয়েছিল বল দেখি।"

"আপনি তো মাদারীপুরের দারোগাবাবুর কাছ থেকে পাস নিয়ে

আমায় দিযে এলেন, কিন্তু তাডাতাডিতে সেটা বাডিতে ফেলে এসেছিলাম। তাই পালং থানায় পাস দেখাতে পাবলাম না, আব সেইখানেই পুলিস আমাদেব আটকে ফেললে। তাবপব স্টীমাবে একজনকে পাঠিয়ে আমাব বাড়ি থেকে পাসটা নিযে এসে তবে ছাড়ান পেলাম।"

বডবাবু বলিলেন, "ওঃ, তাই নাকি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাবই দোষ, আমায মাপ করুন।"

মাঝিব সবলতা দেখিষা বডবাবু বিস্মিত হইলেন এবং ভাবিলেন যে, এ কথা স্বীকাব না কবিষা সে অতি অনায়াসে জোযাব, ভাটা, বাতাস, নদীব ঢেউ ইত্যাদি যে কোন একটা ওজব কবিয়া বিলম্বের কাবণ নির্দেশ করিতে পাবিত, কিন্তু সে তাহার কিছুমাত্র চেষ্টা কবিল না। অতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে বাধানাথেব কাতব নযনেব দিকে তাকাইষা তিনি বলিলেন, "যাক, তাব জন্যে আব কি হযেছে—একদিন দেবি হযেছে তো, ও বকম হয়েই থাকে। তুমি ওব জন্যে মনে কিছু ক'বো না ; যাও এখন বিশ্রাম কবগে।"

বাধানাথ পুনবায জোডহাত কবিয়া বলিল, "বাবু, আমাব একটি নিবেদন আছে। অনেক বাত হযেছে তাই আপনাকে আর বিবক্ত কবতে সাহস হচ্ছে না, কিন্তু না ব'লেও থাকতে পাবছি না।"

"না না, বিবক্ত আব কি। বল না তুমি কি বলবে।"

"বাবু, এই নৌকোতে আমাব মা আছেন।"

বডবাবু কথাটা ঠিক বুঝিতে পাবিলেন না ; ভাবিলেন যে, বাধানাথ হয়তো মনে কবিয়াছে যে নৌকাব মধ্যে তাঁহাব স্ত্রী আছেন সেইজন্য 'মা' বলিযা তাঁহাকে সম্মানসূচক অভিবাদন কবিতেছে। তাঁহাব

মনে হইল, ইহা বুঝি এ দেশের পল্লীগ্রামের প্রথা। বলিলেন, "তোমার ভুল হয়েছে রাধানাথ ; এ নৌকোয় তো কোন স্ত্রীলোক নেই।"

"তবে কি আপনাদের আর কোন নৌকো আছে ?"

"হ্যাঁ, ঐ তো দেখতে পাচ্ছ আর একখানা বজরা, ওতে স্ত্রীলোকরা আছে।"

"ওঃ! তবে ঐ নৌকোতেই আমার মা আছেন ; আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করব।"

বড়বাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, লোকটা বলে কি ? মাথার গোলমাল আছে নাকি ? তিনি অবাক হইয়া রাধানাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু সে মুখে অস্বাভাবিক কিছুই দেখিতে পাইলেন না। রাধানাথ বুঝিল যে বড়বাবু তাহার কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না। তখন সে পুনরায় হাতজোড় করিয়া বলিল, "বাবু, এই জন্যেই কয়েছিলাম যে আপনি হয়তো বিরক্ত হবেন। আমার কথাটা সব বুঝিয়ে বলতে গেলে একটু সময় লাগবে।"

বড়বাবুর কৌতূহল বাড়িয়া উঠিতেছিল ; বলিলেন, "না না, বিরক্ত হব কেন ? তবে কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমার যা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে তা অবাধে বলতে পার।"

রাধানাথ বলিল "শুনুন তবে, বাবু। আমার বয়স যখন পঁচিশ বছর, তখন আমার মা মারা যান। সব ছেলেদের চেয়ে আমায় তিনি বেশি ভালবাসতেন, তাই তাঁর শোকটা আমাকে খুব লেগেছিল। আজ পর্যন্ত রোজই ঘুমোবার আগে আমি তাঁকে ভাবি, আর উদ্দেশে তাঁকে প্রণাম ক'রে তবে ঘুমুই।"

বড়বাবু বলিলেন, "বেশ বেশ, রাধানাথ, তোমার এ রকম মাতৃভক্তি শুনে আমি বড় সুখী হলুম।"

রাধানাথ বলিল, "শুনুন বাবু, তারপর। গতরাত্রে পালংএর ঘাটে আমাদের নৌকো ছিল। ওই তো দেখতে পাচ্ছেন—ওই নৌকো, ওতে শোবারও সুবিধা নেই, আর পাস ফেলে আসার জন্যে মনটাও খারাপ ছিল, তাই প্রায় সমস্ত রাত ঘুমুতে পারি নি। ভোরবেলায় যেমন একটু ঘুম এসেছে, অমনি স্বপ্নে দেখলাম একটি বিশ-বাইশ বছরের মেয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'কে তুমি?' সে বললে—'বাবা রাধু, আমি তোর মা।' শুনেই আমার বুক ঢিপঢিপ ক'রে উঠল। এই দেখুন বাবু, কথাটা বলতে বলতে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে!"

"তা তো হবেই। তারপর?"

"আমি তার দিকে বেশ ক'রে তাকিয়ে দেখে বললাম—মা, আমি তো তোমায় চিনতে পারছি না, তোমার ওরকম চেহারা তো আমি কখনও দেখি নি।' সে আর একটু এগিয়ে এসে আমার মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে বললে—'বাবা রাধু, আমি আর-জন্মে তোর মা ছিলুম। এখন যা দেখছিস সে আমার এ জন্মের চেহারা।' আমি বললাম—'মা, তুমি যদি এসেছ, আমায় ছেড়ে যেও না।' এই ব'লে আমি যেমন তার পায়ের ধুলো নিতে গেলাম অমনি সে অন্তর্ধান হয়ে গেল, আর যাবার সময় ব'লে গেল—'তুই যে বাবুর কাছে যাচ্ছিস, সেই বাবুর নৌকোতেই আমার দেখা পাবি।' আমি বিহ্বল হয়ে 'মা, একটু দাঁড়াও' এই ব'লে সত্যি সত্যিই চেঁচিয়ে উঠলাম। সেই শব্দে নৌকোর লোকেদের ঘুম ভেঙে গেল ও সকলে 'কি হয়েছে হালদার?' বলতে বলতে আমাকে টেনে তুলে বসালে। আমি তখন আর কিছু বলতে পারলাম না, কারণ তখনও আমার মনটা তোলপাড় করছিল; যেন মাথার ঠিক ছিল না। তখন নৌকোর লোক নিজেদের মধ্যে বলাবলি ক'রে ঠিক

করলে যে আমি বোধ হয ভূত দেখেছি। এই ব'লে আমাব মাথায তেলজল দিয়ে ও তাদেবই মধ্যে একজন একটু ঝাড়ফুঁক ক'বে আমায় আবাব ঘুম পাডিয়ে দিলে।”

বড়বাবু একটু মনে মনে হাসিলেন ও ভাবিলেন যে, পাডাগেঁযে লোক, সময়-অসমষ জ্ঞান অল্প, তাই সামান্য এই কথাটা বলিবাব জন্য তাঁহাকে এতক্ষণ জাগাইয়া বাখিল। বলিলেন, “খুব আশ্চর্য স্বপ্ন বটে রাধানাথ, তবে ওবকম মাঝে মাঝে দেখা যায়। আচ্ছা বাধানাথ, বাত হয়েছে, যাও ঘুমোওগে।”

বাধানাথেব সে কথাটা বড মনঃপূত হইল না। বলিল, “বাবু আমাব মাব সঙ্গে দেখা না হ'লে আমি সোযাস্তি পাব না। আমাকে তার কাছে একবাব নিযে চলুন।”

বড়বাবু বলিলেন, “তার জন্যে তাডাতাডি কেন? কাল সকালেই দেখা হবে।”

“না বাবু, আপনি দয ক'বে আমাব এ উপবোধটি রাখুন। এখন একবার মাকে না দেখলে আমি আজও ঘুমুতে পাবব না।”

বড়বাবু আর কি কবেন! বলিলেন, “আচ্ছা বাধানাথ, তোমাকে ও-নৌকায় নিযে যাচ্ছি, কিন্তু সেখানে তিন-চাবটি স্ত্রীলোক আছে, তাব মধ্যে কোন্‌টি তোমাব মা, কেমন ক'বে বুঝব বল?”

“আজ্ঞে, আমি তাঁকে গতবাত্রে স্বপ্নে দেখেছি, দেখলেই চিনতে পাবব।”

বড়বাবু পুনরায় মনে মনে হাসিলেন ও ভাবিলেন, লোকটার বোধ হয় সত্য সত্যই মাথা খাবাপ। বলিলেন, “আচ্ছা তোমাব মাব চেহাবাটি কেমন বল দেখি? দেখি যদি আমাদেব মেয়েদেব কারুব সঙ্গে মেলে।”

রাধানাথ তখন চেহারার বর্ণনা আরম্ভ করিল ও যতই বলিতে লাগিল, বড়বাবুর হাস্যমধুর মুখমণ্ডল ততই গম্ভীর হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি আর বিস্ময় চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। বলিলেন, "বড়ই আশ্চর্য রাধানাথ! তুমি যা বললে, তা তো সমস্তই আমাদের সুশীলার সঙ্গে মিলে যায়। ওঃ! কি আশ্চর্য স্বপ্ন!"

"বাবু, আমি কি আর মিথ্যে বলছি? আমার প্রাণের ভেতরটায় যা হচ্ছে তা আর কি বলব। আজ আমার লোকগুলোকে নাইতে খেতে পর্যন্ত সময় না দিয়ে ইষ্টিমারের মত জোরে ছিপ চালিয়ে নিয়ে এসেছি। নইলে যে রকম জলের টান আর সমস্ত পথই উজান পেয়েছি, আরও অনেক দেরি হয়ে যেত। মাকে দেখবার জন্যে আমার মন বড়ই ছটফট করছে।'

"চল, তবে দেখবে চল।' এই বলিয়া বড়বাবু রাধানাথকে সঙ্গে লইয়া অন্য নৌকাতে গেলেন।

ইতিমধ্যে সেই নৌকার অধিবাসিনীরা সকলেই জাগিয়া উঠিয়াছিল ও বাহিরে আসিয়া ছিপ দেখিতেছিল। নৌকায় উঠিয়া রাধানাথ ক্ষণেকের জন্য একবার স্ত্রীলোকদের মুখের পানে তাকাইল। চাঁদের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু সেই অস্পষ্ট আলোকেই সে সুশীলার দিকে চাহিয়াই "মা, আমায় দয়া কর বলিয়া তাহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

সুশীলা ও তাহার সঙ্গিনীরা একেবারে অবাক। তাহারা ভাবিল, ছিপ আসিয়া পৌঁছানোর জন্য বড়বাবুর খুব আনন্দ হইয়াছে ও তিনি এই রকম একটা রঙ্গের অবতারণা করিয়া আর সকলের সঙ্গে সেই আনন্দ উপভোগের চেষ্টায় আছেন।

"এ আবার কি বড়বাবু?" এই বলিয়া সুশীলা উচ্চহাস্য করিয়া

উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, কারণ রাধানাথের উষ্ণ নয়নজল তখন তাহার পদপ্রান্তে অজস্রধারে বর্ষিত হইতেছে।

এ দৃশ্য সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিল। বড়বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "সুশীলা, তুমি বোধ হয় খুবই আশ্চর্য হয়েছ। আর সেটা হবারই কথা, কারণ তোমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত এই রাধানাথের এই রকম ব্যবহার বিস্ময়কর তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু তোমার চেয়ে আমি বেশি বিস্মিত হয়েছি।"

রাধানাথ ঠিক এক ভাবেই সুশীলার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া করুণস্বরে বলিল, "মা, আমি তোমার সন্তান।"

বড়বাবু বলিলেন, "সুশীলা, ও তোমার সন্তানই বটে। আর-জন্মে তুমি ওর মা ছিলে। গত রাত্রে ও তোমাকে স্বপ্নে দেখেছে, আর সে সম্বন্ধে কোনই ভুল নেই, কারণ এই নৌকোয় আসবার আগে তোমার চেহারা এমন ভাবে আমার কাছে বর্ণনা করলে যে আমি শুনেই বুঝলুম, সে তোমাকে দেখেছে। তাই ও যখন এখানে এসে কিছুমাত্র ইতস্তত না ক'রে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল, তখন আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলুম।"

রাধানাথ আরও আবেগভরে সুশীলার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া পায়ের উপর মাথা রাখিয়া বলিল, "মা, আমি তোমার অধম সন্তান; আমায় বঞ্চিত ক'রো না।"

মুহূর্তে যেন সুশীলার সর্বাঙ্গে এক বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছুটিয়া গেল। তাহার মনে হইল, সে যেন আর কলিকাতার প্রথিতনাম্নী অভিনেত্রী নয়। যেন কোন্ সুদূর অতীতের অস্ফুট স্মৃতি অজ্ঞাতসারে তাহার বর্তমানের উপর একটা ঘন আবরণ টানিয়া দিয়া,—কলিকাতা নগরী,

বিলাস, বৈচিত্র্য, সুখ, সম্পদ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, নাট্যশালা, রঙ্গমঞ্চ, অভিনয়, চলচ্চিত্র, দেবী চৌধুরাণীতে নিশির ভূমিকা, দেবী রাণীর বজরা, রঙ্গরাজের ছিপ ইত্যাদি সমস্তই যেন পদ্মার অতলজলে ডুবাইয়া দিয়া, তাহাকে এক নিভৃত পল্লীগ্রামের বৃক্ষচ্ছায়শীতল শান্ত পর্ণকুটিরে টানিয়া লইয়া গিয়াছে ও মাতৃত্বের প্রবল বন্যায় তা'র শূন্য তৃষিত রমণীহৃদয় কূলে কূলে ভরিয়া দিয়াছে। জীবনে সে অনেকবার এই ভাবের অভিনয় করিয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক অনুভব করিল আজ প্রথম, এবং বুঝিল যে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যে কত প্রভেদ। রঙ্গমঞ্চে ইচ্ছা করিলেই সে নয়নে অশ্রুপ্রবাহ আনিতে ও তাহা রোধ করিতে পারিত, কিন্তু আজ যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে তাহার সে ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াছে। তাই শত চেষ্টাতেও সে অশ্রু রোধ করিতে পারিল না। অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া পদতলে লুণ্ঠিত সেই বীরবপু দুই হাতে ধরিয়া বলিল, "ওঠ বাবা রাধানাথ, আমি তোমার মা।" রাধানাথ উঠিয়া বসিল ও করুণা-ভিখারীর ন্যায় কাতর নয়নে আবার তাহার মুখের দিকে চাহিল। সুশীলা তাহার বিপর্যস্ত দীর্ঘ কেশ কপাল হইতে সরাইয়া দিতে দিতে বলিল, "বড়বাবু, আমার ছেলের কেমন চেহারা দেখুন দেখি এমন ছেলের মা হওয়া কি গৌরবের কথা নয়?"

"নিশ্চয়ই।" এই বলিয়া বড়বাবু আর কিছু বলিতে পারিলেন না, কারণ এই দৃশ্য তাঁহার ভাবপ্রবণ হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল। তারপর মাতা-পুত্রে অল্প কিছু কথাবার্তা হইল, ও রাধানাথ পুনর্বার সুশীলাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ও আর একবার বড়বাবুর পায়ের ধূলা লইয়া বিশ্রাম করিতে গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে পদ্মাবক্ষে 'রঙ্গরাজের ছিপ' সজ্জিত হইল ও দুই-একটা ফোটোগ্রাফ লওয়া হইলে পর 'নিশি ঠাকুরাণী'কে তাহাতে

উঠাইয়া ফোটো লইবার সময় আসিল। সকলে প্রস্তুত, কিন্তু সুশীলা তখনও পর্যন্ত নৌকার বাহিরে আসে নাই। এ সংবাদ বড়বাবুর কাছে গেল। প্রথমে তিনি ইহার কারণ কিছু বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে একটা সন্দেহ ও সেই সঙ্গে উৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ মেয়েদের নৌকায় গিয়া সুশীলাকে ডাকিতেই সে বাহির হইয়া আসিল ও ম্লান হাস্যের সহিত বলিল, "সুপ্রভাত, বড়বাবু! আজ নিশি সুপ্রভাত, ও সেই সঙ্গে তার অবসান।"

বড়বাবু কতকটা ইহাই অনুমান করিয়াছিলেন। বলিলেন, "ব্যাপার কি সুশীলা? তুমি এখনও পর্যন্ত প্রস্তুত হও নি?"

"মাপ করুন বড়বাবু, আর প্রস্তুত হতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না। নিশির ভূমিকাটা আর একজনকে দিন।"

"কেন? হ'ল কি?"

"আমি আমার ছেলের সামনে অভিনয় করতে পারব না।"

বড়বাবু বড়ই গোলযোগে পড়িলেন, কারণ ঠিক আবশ্যকমত অভিনেত্রী লইয়া আসা হইয়াছিল, ও 'নিশি ঠাকুরাণী'র ভূমিকা লইবার উপযুক্ত আর কেহ ছিল না। তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সুশীলাকে কিছুতেই রাজী করাইতে পারিলেন না। তখন তিনি ভাবিলেন, এ ব্যাপারে রাধানাথের সাহায্য ভিন্ন কাজ হইবে না। তিনি গিয়া রাধানাথকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিলেন ও তাহাকে সুশীলার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

রাধানাথ আসিবামাত্র নিপুণা অভিনেত্রী আপনার মনের ভাব গোপন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাবা রাধানাথ, আজ যে রকম পদ্মায় ঢেউ উঠছে, আমি তোমার নৌকোয় চ'ড়ে পদ্মার মধ্যে যেতে পারব না বাবা। ঢেউ দেখেই আমার বুক দুরদুর করছে।"

রাধানাথের কিন্তু আসল কারণটা জানা ছিল, তাই সে এই ওজরের উত্তরে কেবলমাত্র বলিল, "কিছু ভয় নেই মা। তোমার ছেলের হাতে যতক্ষণ হালের হাতল থাকবে ততক্ষণ তুমি মনে করতে পার যে, ডাঙার ওপরে আছি।" এই বলিয়া সুশীলাকে আর কোন প্রতিবাদের অবসব না দিয়াই বলিল, "চল মা চল, সবাই তোমার অপেক্ষায় ব'সে আছে।"

সুশীলা আব কোন আপত্তি করিতে পাবিল না। অবিলম্বে বেশ পবিবর্তন কবিয়া সে যন্ত্রচালিতের মত রাধানাথের সঙ্গে গিয়া ছিপে উঠিল ও হালেব নিকট তাহাব বসিবার জন্য যে মঞ্চ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাতে বসিল। তখন রাধানাথ সেই শতাধিক লোককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ভাই, আজ আমাদের পরম ভাগ্য। আমাব মা নৌকোয় এসেছেন, তোমবা সকলে মাকে প্রণাম কর।" সঙ্গে সঙ্গে শত মস্তক যুগপৎ প্রণত হইল ও শতকণ্ঠে উচ্চারিত "জয় মায়ের জয়" শব্দে গগন প্রতিধ্বনিত হইল। গৌববে সুশীলাব বুক ভবিয়া গেল ও তাহাব মনে হইল সে গৌবব তাহার পূর্বার্জিত গৌরবের কত উচ্চে। তখন সকলে হরিধ্বনি কবিযা ছিপ ছাড়িয়া দিল।

নদীব মধ্যে কিছুদূর আসিয়া বাধানাথ বলিল, "মা, আজ তোমাকে এই নাযে বসিয়ে বহুদিনের একটি কথা আমার মনে পড়ছে।"

"কি কথা বাবা?"

"যখন আর-জন্মে তুমি আমাব ঘবে ছিলে তখন একবার তোমাকে এই নায়ে ঠিক ঐ জায়গাতেই বসিয়ে রাজোরে দশহরাব ভাসান দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম।" এই কথা বলিতে বলিতে তাহার তেজস্বী নয়ন অশ্রুতে ভরিয়া আসিল।

সুশীলারও চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তাহার মনে হইল, সে যেন

তাহার ছেলের সঙ্গে সত্য সত্যই দশহরার মেলা দেখিতে যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে গিয়ে আমি কি করেছিলুম বাবা ?"

"তুমি আমাকে কাপড় আর মুড়কি কিনে দিয়েছিলে।"

দেখিতে দেখিতে ছিপ আরও দূরে গিয়া পড়িল, ও জলের ভীষণ টান তুচ্ছ করিয়া শতাধিক 'বোটে'র জোরে তীরবেগে উজানে ছুটিতে লাগিল। ছিপের বাদ্যযন্ত্র সব বাজিয়া উঠিল, কয়েকজন লাল পতাকা সঞ্চালন করিতে লাগিল, ও গলুয়ের মাথায় একজন বাজনার তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করিযা দিল। সেই সময় রাধানাথ সুশীলাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মা, তুমি একবার হাল ধর।" এ কথা আর দ্বিতীয়বার বলিতে হইল না। সাময়িক আবেগে সুশীলার হৃদয়ে তখন অগাধ সাহসের সঞ্চার হইয়াছে। সে রাধানাথের নিকট দাঁড়াইয়া হালের হাতল ধরিল। প্রভাত-সূর্যের রক্তকিরণচ্ছটা তাহার সুন্দর বদনমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে এক অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত করিয়া দিল, ও বোধ হইতে লাগিল যেন পদ্মার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বারুণীর প্রভাতে নদীবক্ষে অবতীর্ণা। ঠিক সেই সময় ছিপের ফোটোগ্রাফ লওয়া হইল।

তীরে নামিয়া সুশীলা কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাধানাথকে সঙ্গে লইয়া বাজারের দিকে গেল ও কাপড়ের দোকান হইতে রাধানাথ ও তাহার ছেলেমেয়েদের জন্য ভাল ভাল কাপড় কিনিল। রাধানাথ ইহাতে আপত্তি করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সুশীলা তাহাকে এক কথায় থামাইয়া দিল। বলিল, "বাবা রাধানাথ, আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করলুম, আর তুমি আমার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখবে ?" তারপর মুড়কির দোকানে মুড়কি কিনিয়া উভয়ে নদীতীরে ফিরিল।

অপরাহ্নে বিদায়ের পালা। তখন পশ্চিম-গগনে মেঘরাশি জমাট

বাঁধিয়া সেই বিশাল পদ্মার বুকে যেন একটা কালিমার ধারা ঢালিয়া দিয়াছে। বায়ুর বেগ মন্দীভূত হওয়ায় নদীতে আর সে তরঙ্গ নাই, তীরে তার সশব্দ উচ্ছ্বাস নাই। সেই অফুরন্ত জলস্রোত যেন প্রাণের বেদনা চাপিয়া কান্নার সুরে কুলুকুলু রবে বহিয়া চলিয়াছে। সুশীলার অন্তরেও যেন আজ এই স্তব্ধ প্রকৃতির করুণ প্রতিবিম্ব।

রাধানাথ ও তাহার দলের লোকের পারিশ্রমিকস্বরূপ বড়বাবু তাহাকে পাঁচ শত টাকা দিলেন। সেই টাকা হইতে যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে দিয়া রাধানাথ বাকি দুই শত টাকা লইয়া সুশীলার নিকট আসিল ও তাহার পদপ্রান্তে সেই টাকা রাখিয়া তাহার পদধূলি লইল। সুশীলা বলিল, "এ কি বাবা রাধানাথ?"

রাধানাথ বলিল "এ তোমার ছেলের রোজগার মা। তাই তোমার চরণে দিতে এসেছি।"

সুশীলার চক্ষু আবার জলে ভরিয়া উঠিল। বলিল, "না বাবা, ও তোমার কাছেই রাখ। তোমার কল্যাণে তোমার মার তো কোন অভাব নেই বাবা।"

"তা নাই থাকুক মা, ছেলের রোজগার তোমারই পাওনা। আমাকে সে সুখ থেকে বঞ্চিত ক'রো না।"

অনেক বুঝাইবার পর রাধানাথ আর পীড়াপীড়ি করিল না। বলিল, "আচ্ছা মা, ও টাকা এখন আমার কাছেই থাক্। কিন্তু এতদিন পরে আমি যখন আমার মাকে পেয়েছি তখন আর ছাড়ব না। তুমি আমার সঙ্গে তোমার নিজের বাড়িতে চল মা। সেখানে বউ, বেটা, নাতি, নাতনী নিয়ে আবার আমার ঘর আলো ক'রে থাকবে।"

সুশীলার মুখ আবার গম্ভীর হইয়া উঠিল। আজ সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার মন যেন অতীতের স্মৃতি মুছিয়া এক অভিনব ভবিষ্যতের

দিকে ছুটিয়া যাইবার জন্য সংগ্রাম করিতেছিল। এই প্রস্তাবে তাহার বোধ হইল, যেন রাধানাথ তাহার অন্তরের গুপ্তকথা টানিয়া বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিয়াছে। একবার তাহার মনে হইল, যেন তাহাতেই স্বীকৃত হয়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "তা হয় না বাবা রাধানাথ।"

"কেন মা? পাড়াগাঁয়ে তোমার কষ্ট হবে মনে করছ? কিছু কষ্ট হবে না মা। তোমার আশীর্বাদে আমার জমির ধান, গরুর দুধ, বিলের মাছ, কিছুরই অভাব নেই। আমার মনে হয় তুমি খুব শান্তিতে থাকবে।"

"আমি শান্তিতে থাকব সেটা ঠিক বাবা; কিন্তু একটু ভেবে দেখ, তুমি শান্তি পাবে না।"

একটু চিন্তা করিতেই রাধানাথের চমক ভাঙিল। তখন সে বুঝিল যে, সে যাহা আশা করিয়াছে তাহা অসম্ভব, কারণ তাহার সর্বাঙ্গ সমাজশৃঙ্খলে বদ্ধ। মুহূর্তে রাধানাথের উজ্জ্বল নয়ন ম্লান হইয়া গেল। সে আর কিছুই বলিতে পারিল না,—কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস অনেক কষ্টে চাপিয়া কাতর নয়নে সুশীলার দিকে চাহিল।

সুশীলা তাহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল, "তার জন্যে কিছু দুঃখ ক'রো না বাবা। আমার মনে হয়, আমি তোমার মত ছেলের মা হবার উপযুক্ত হয়েছি। যেখানেই থাকি আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হবে, আর তোমার কল্যাণ-চিন্তা এক মুহূর্তের জন্যে আমার মন থেকে যাবে না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি সুখে থাক।" এই বলিয়া সে রাধানাথের মুখ আপনার বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার শিরশ্চুম্বন করিল। উভয়ের নয়নে প্রবল অশ্রুধারা ছুটিল।

ঠিক সেই সময় নিকটবর্তী এক জেলে-ডিঙির মাঝি গাহিতেছিল—

"বেদাগমে এই বটে
মা বিবাজে সর্বঘটে—"

———

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬	১৫	তদন্ত	তদন্ত
২১	২১	তাঁবা	তাঁবা
৫৩	২	ও-টাকাটা	ও টাকাটা
৬০	৬	চালিযেছেন	চালিযেছিলেন
১৩৮	১৭	পিস্তলেব	পিস্তলেব
১৪২	৪	অমাবস্যাব	শনিবাব
২০৩	৪	আলগাইতে	আগলাইতে